GIFT

বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে নারী : একটি সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
কল্যাণী নন্দী
পিএইচ.ডি শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০, রেজি:নং-১৪৩
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Library
465942
465942

গবেষণা তত্ত্বাবধানে:
প্রফেসর ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
আগস্ট-২০১২

বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে নারী : একটি সমীক্ষা

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগে

উপস্থাপন করা হলো ।

465942

কল্যাণী নন্দী
পিএইচ.ডি শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০ রেজি:নং-১৪৩
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

কল্যাণী নন্দী, পিএইচ.ডি শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০ রেজি:নং-১৪৩, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আমার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সফলতার সাথে 'বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে নারী:একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেছেন। পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য কল্যাণী নন্দীকে তার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার অনুমতি দেয়া হলো ।

465942

প্রফেসর ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দায়বদ্ধতা স্বীকার/ কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণা করার সুযোগ দানে বাধিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অত্র গবেষক খুবই কৃতজ্ঞ। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণের অকৃত্রিম সহযোগিতা, মূল্যবান উপদেশ ব্যতীত এই অভিসন্দর্ভ বাস্তবায়িত হতে পারত না। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়াও বহুবার তার বাসস্থানে গিয়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম করা হয়েছে। তখন একদিকে যেমন তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় এই গবেষককে জ্ঞাণ বিতরণে অনীহা প্রকাশ করেন নাই অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের সহধর্মিনী কখনো আপ্যায়ন করতে বিরক্তবোধ করেন নাই। তাই এই গবেষক অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। উনার মতো গুরুর শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাওয়া সত্যিই বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম(চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),জনাব সাবের আহমেদ চৌধুরি (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক, বাংলা একাডেমী, মোঃ বাশার, সহকারী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি কিশোরগঞ্জ কলেজ, মোঃ জিল্লুর, সহকারী অধ্যাপক, সরকারি কিশোরগঞ্জ কলেজ প্রমূখ আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট সেমিনারে উপস্থিত থেকে গবেষণা বিষয়ে ব্যাপক পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করেছেন। তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশের কারণে গবেষণা কর্মটি বহুলাংশে পুষ্ট হয়েছে বিধায় তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

জনাব দীপ্রমান সরকার, মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ ফরিদপুর জজ কোর্ট, ফরিদপুর, জনাব মোহাম্মদ মাহিদুজ্জামান, মাননীয় যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, নড়াইল জজ কোর্ট, নড়াইল, জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, মাননীয় এ্যাডিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জজ কোর্ট, খুলনা প্রমূখ 'পুলিশ হেফাজত' সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে এ গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার মা-বাবার আর্শীবাদ এই গবেষণার শক্তি যুগিয়েছে। আমার একমাত্র পিতৃহীন শিশুপুত্র শাশ্বত দাঁ আমার গবেষণাকালীন সময়ে কখনো শিশুসুলভ আচরণ বা আবদার দ্বারা গবেষণা সংশ্লিষ্ট অধ্যয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তার প্রতি আমার অসীম স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশ করছি। জনাব জুয়েল রায়, প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা সরকারি কলেজ, জনাব আশরাফা আক্তার সিলভী, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা, জনাব নুরুল হক সিকদার, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ, জনাব ভবেন্দ্র নাথ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মাউশি, ঢাকা, জনাব সালমা বেগম মুক্তা, সহকারী অধ্যাপক, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা প্রমূখ আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে আমাকে মানসিকভাবে শক্তি যুগিয়েছে এবং যাদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হতো না তাদের প্রতি আমি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মোহাম্মদ ফেরদাউস আলম অতি সযত্নে গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করে আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করায় আমি তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার অকালপ্রয়াত সুযোগ্য স্বামী বিচারক সুব্রত কুমার দাঁ (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, ফরিদপুর জজকোর্ট, ফরিদপুর, মৃত্যু ০৮.০৮.২০০৯) আমার পড়ালেখায় আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন এবং বিভিন্ন সুযোগ দান করেছিলেন বলে এই গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি শুধু স্বামী হিসেবে নয়, আমার বন্ধু এবং বেশী করে দায়িত্বশীল অভিভাবক রূপে আমার পড়ালেখার বিষয়ে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন সত্যিকারের পাঠক ও নিষ্ঠাবান বিচারক। তিনি তাঁর বিচারিক প্রজ্ঞা ও পেশাগত অবস্থান দ্বারা সহযোগিতা না করলে আমার পক্ষে থানায় গিয়ে নারী হাজতিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সহ 'বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে নারী ' এর ন্যায় এমন একটি কঠিন ও জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা করার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না।

কল্যাণী নন্দী
পিএইচ.ডি শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০ রেজি:নং-১৪৩
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি	১-৩৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	পুলিশ হেফাজতে নারী : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৩৮-১১৩
তৃতীয় অধ্যায়	পুলিশ হেফাজতে নারী বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান	১১৪-১৭৫
চতুর্থ অধ্যায়	৯০ এর দশক এবং পুলিশ হেফাজতে নারী	১৭৬-২৩৩
পঞ্চম অধ্যায়	পুলিশ কর্তৃক আইনের প্রয়োগ এবং পুলিশ হেফাজতে নারী ধর্ষণ ও মানবাধিকার লংঘন	২৩৪-৩১৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	পুলিশ হেফাজত বনাম নিরাপদ হেফাজত, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৩১৬-৩৮২
সপ্তম অধ্যায়	পুলিশ হেফাজতে নারীর নির্যাতন বন্ধসহ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশমালা	৩৮৩-৪১৯
অষ্টম অধ্যায়	উপসংহার	৪২০-৪৩২
	পরিশিষ্ট	৪৩৩-৪৯১
	গ্রন্থপঞ্জী	৪৯২-৫০৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১।	বাংলাদেশ পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা ও জনবল	৪৮
২।	পুলিশ স্টাফ অফিসার, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স	৪৯
৩।	পুলিশ একাডেমী, সারদা	৫০
৪।	সাংগঠনিক কাঠামো- ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	৫১
৫।	জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ (বাংলাদেশ পুলিশ)	৫২
৬।	রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ২০০৯-২০১০	২২৪
৭ ও ৮।	১৯৯৫-২০০২ পর্যন্ত সময়ে পুলিশের কাছে নিবন্ধিত ধর্ষণের তালিকা	২৩৯
৯।	পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের তালিকা	২৪০-২৪২
১০।	নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা	২৪৫
১১।	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মৃত্যু ২০০৭	২৪৬
১২।	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হত্যা ২০০৮	২৪৭
১৩।	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মৃত্যু ২০০৯	২৪৮
১৪।	নারী নির্যাতন চিত্র জানুয়ারী- ডিসেম্বর ২০০৫	২৫৮
১৫।	শিশু নির্যাতন চিত্র জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৫	২৫৯
১৬।	নারী নির্যাতন ২০০৪	২৬২
১৭।	ছয়টি জেলায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু	২৭১
১৮।	২০০২ সালে পুলিশ ও কারা হেফাজতে মৃত্যু	২৭২
১৯।	মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের তুলণামূলক আলোচনা	২৮৪-২৯৪
২০।	বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে বন্দিদের অবস্থা (২০০২)	৩১২
২১।	কারাগারে অতিরিক্ত বন্দি (জানুয়ারী ২০০১-জানুয়ারী ২০০৮)	৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ - পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানব সভ্যতার উষালগ্ন হতেই সামাজিক জীবনে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যেকটি নাগরিকের আচার-আচরণের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছে। এই সংস্থা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থাকে পুলিশ বাহিনী নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৬১ সনের ৫নং আইন অনুসারে এদেশে পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে আইনের সঠিক ও সময়োপযোগী প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা তথা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই পুলিশ বাহিনীর প্রধান কর্তব্য (মিয়া, নভেম্বর-২০০০)।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের হুকুমকেই আইন বলা হয়। এই আইন বৃহত্তর জনগণের ইচ্ছায় তাদের কল্যাণে তাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির সমষ্টি যা সরকার কর্তৃক পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়ে থাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণেরই একটি অংশ পুলিশ বাহিনী। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর উন্নতি ও অবনতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা, পুলিশের পবিত্র দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য। সেবাই পুলিশের ধর্ম। এই কথা সকল পুলিশ সদস্যকেই মনে রাখতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হলে কোন সরকারের পক্ষেই

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়।

সামাজিক জীবনে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের আচার-আচরণের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা পুলিশ বাহিনীর অন্যতম কর্তব্য। পৃথিবীতে একদিকে যেমন- বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, অপরদিকে সমাজে সমস্যাবলী ও অপরাধ প্রবণতাও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই সকল সমস্যার মোকাবেলা করে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর উপর ন্যস্ত। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি কাজ নিয়ম মাফিকভাবে আইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সে কারণে পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনার্থে আইনের প্রতি নজর রাখতে হয়। এই জন্য তাদের প্রত্যেককে দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সম্পৃক্ত থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য। অথচ পত্র পত্রিকা খুললেই নারীর নিরাপত্তা প্রসঙ্গটি চোখে পড়ে। রাস্তাঘাটে চলাফেরা থেকে শুরু করে পুলিশী হেফাজতে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশের সবখানেই চলছে হয় ফতোয়াবাজী নয়তো পুলিশী নির্যাতন। দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণের ঘটনার পর ঘটেছে পুলিশ কর্তৃক আরো নারী ধর্ষণের ঘটনা। ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, খাগড়াছড়ি, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী প্রায় সব খানেই। এ সব কিছুই এক অপরের সাথে যুক্ত। নারী ধর্ষণকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মনে হয়, পুলিশের "অধিকার" আকারেই দেখেন। ধর্ষণকারী পুলিশের প্রতি সহানুভূতিই আমরা লক্ষ্য করি প্রশাসনের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করা হচ্ছে তারা গরিব মেয়ে। পথে ঘাটে সুযোগ পেলেই তাদের ধর্ষণ করে এক শ্রেণীর পুলিশ। বর্তমানের

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে অনেক পুলিশেরই স্পর্ধা গগনচুম্বী। গায়ে একখানা ইউনিফর্ম চাপিয়ে রাস্তায় এদের কেউ কেউ নিজেকে আইন কানুনের রাজা মনে করেন। একদিকে বেইজিং নারী সম্মেলন নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার ও সমতার কথা বলা হচ্ছে যখন, তখন অন্যদিকে এই বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রতিভূ পুলিশ জোর করে রাস্তা ঘাটে এমনকি পুলিশি হেফাজতে অথবা থানা হাজতে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, তাদেরকে ধর্ষণ করছে। এই সব কাজে তারা এতোদিনে এতোখানিই সাহসী ও নিশ্চিত যে, তাদের কর্মকান্ডের কোনো সাক্ষী সাবুদ থাকাটাকেও তারা আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

বিশ্বের নানা দেশের নারীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার। পরিবার থেকে শুরু করে রাজনীতি কিংবা সংসদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীরা উপেক্ষিত । কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও শিক্ষা বা প্রযুক্তির দিক থেকে, আবার কোথাও বা রাজনৈতিক ভাবে নারীর মানবাধিকারকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। নারীর মানবাধিকারের সম অধিকার এবং বাক-স্বাধীনতার জন্য আজও দেশে দেশে নারীরা লড়াই করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি এখনো খুব নাজুক। যে রাষ্ট্র জনগনের নিরাপত্তা দেয় সে রাষ্ট্র যদি ভয়ঙ্কর ভূমিকা পালন করে তাহলে সেখানে নারীর নিরাপত্তা কোথায় ? রাষ্ট্র তথা দেশের পুলিশ বাহিনীর কাজ হল জনগণের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে রয়েছে নারী নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ। সাধারণ মানুষ বিপদে-আপদে একটু সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটে যায় পুলিশের কাছে। কারণ অত্যাচার নিপীড়ন থেকে জনগণকে রক্ষার দায়িত্বটি তাদেরই হাতে। কিন্তু দেখা যায় সেই রক্ষকের ভূমিকায় থেকেও পুলিশ দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ এবং হত্যা পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতনের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সাধারণত পুলিশ কর্তৃক যে সমস্ত নির্যাতন সংঘটিত হয় তা হলো ঃ পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ বা গণধর্ষণ, ধর্ষণ মামলা না নেওয়া, নারীর চরিত্র সম্পর্কে পুলিশের বাজে মন্তব্য, গ্রেফতার করতে গিয়ে সম্ভ্রমহানি, মানসিক নির্যাতন, কুযুক্তি ও কুদৃষ্টি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একাদশ জাতীয় সম্মেলন ২০০৮-এ দেওয়া তথ্যানুযায়ী ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশে ধর্ষণ, যৌতুক, হত্যা, ফতোয়া, পুলিশি নির্যাতনসহ মোট ৩৪ হাজার ৫০৬ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আর পুলিশের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭ এর তথ্যানুযায়ী ২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারীরা মামলা রুজু করেছে ১১ হাজার ৬৮টি। অর্থ্যাৎ নির্যাতিত সব নারী আইনি সহায়তা নিচ্ছেনা। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেনা। ২৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রে ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। ২৮(৩) বলেছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না"। ২৮ (৪)

Dhaka University Institutional Repository

ধারায় আরো বলা হয়েছে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকাসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংবিধানে নারীর সম-অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রয়োগ খুব একটা দেখা যায়না।

বাংলাদেশ মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে পরপর কয়েক বছরের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, পুলিশের অদক্ষতা বা দূর্নীতি এবং গ্রেফতার-আটকাদেশ সংক্রান্ত আইনের ইচ্ছেমাফিক অপব্যবহার প্রায় মহামারি আকার ধারণ করেছে এবং অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। আটক ব্যক্তিদের ওপর চালানো অকথ্য নির্যাতন নিপীড়নের বিবরন থেকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। নির্যাতিতরা রাজনৈতিক কারণে বা সাধারণ অপরাধ সংঘটনের কারণে কিংবা মানবাধিকার রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ কর্মী হওয়ার কারণে গ্রেফতার হোন না কেন, বিচার চলাকালে তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে অথবা স্বজনদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মিডিয়া সেসব নির্যাতন নিপীড়নের তথ্য প্রচার করে। অথচ স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে দেশে সংবিধানসহ একাধিক প্রতিরোধমূলক আইন রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো আমলে নেয়া হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা বলতে সাধারণতঃ মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন করাকে বোঝায়। উৎকৃষ্ট জ্ঞানের জন্য গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতন সম্পর্কে এ গবেষণার কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো-

সাধারণ উদ্দেশ্য

মানবাধিকার খর্ব, বৈষম্য, দমন, অসহায়তা ইত্যাদি বাংলাদেশের নারীদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। আমরা সবাই লক্ষ্য করছি সম্প্রতি পুলিশ হেফাজতে বা পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতন খুব উচ্চ হারে বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে যে সব নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ থাকে তাতে আমরা আশংকিত যে আমরা আবারও মধ্য যুগে ফিরে যাচ্ছি কিনা ! সামাজিক এবং মানবাধিকার গবেষকগণ নারী নির্যাতন বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করছেন এবং জানাতে চাচ্ছেন নারীর জীবন কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের খবরের কাগজে প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনাসমূহ সংকলন এবং বিশ্লেষণ করে, নারীর জীবন কতটা বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্যাতন বন্ধ করার জন্য আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা চালাতে হবে যাতে আমাদেরই মা বোনেরা স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবন আশা করতে পারে।

গবেষণা শিরোনামের স্বার্থেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নাগরিক অধিকার সংরক্ষন ও বঞ্চিতের অধিকার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি জন গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী তাদের দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পালনের ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছে তা যথাযথ নিরূপণ করা এই গবেষণার একটি উদ্দেশ্য। এছাড়াও ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট পুলিশ বাহিনীর ও পুলিশ আইনের সংস্কারে বিভিন্ন সরকার যে অজুহাত ও অপকৌশল অবলম্বন করে দীর্ঘ সময় ক্ষেপন করেছে সেগুলো চিহ্নিত করাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

বিশেষ উদ্দেশ্য

এই গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ-

১. পুলিশী হেফাজতে নারী নির্যাতনের সঠিক বিচার কেন সম্ভব হচ্ছে না ?

২. বিভিন্ন রকমের আইন-কানুন পাস হবার পরেও কেন পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলেছে ?

৩. অভিযুক্ত ও নারী নির্যাতনকারী পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত পুলিশকে দিয়েই করানো উচিত কিনা ?

৪. পুলিশী নির্যাতনের প্রকৃতি, স্থান ও কারণের স্বরূপ জানা এবং সকলকে বিশেষ করে নারী সমাজ এবং সচেতন সভ্য সমাজকে এ ব্যাপারে মানবিক ভাবে সচেতন করা এবং নির্মূলে বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ এবং

৫. পুলিশ বাহিনীর বেতন কাঠামো, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান সেগুলো যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে কর্মরত সকল মানবাধিকার সংগঠন এবং সচেতন মানুষের জন্য দেশের সাম্প্রতিক পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সংখ্যাগত দিক দিয়ে নির্যাতনের ঘটনার হার যেমন বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত, তেমনিই যেন এই নির্যাতনের ধরনও ক্রমশ ধারণ করছে এক জটিল রূপ। কম সময়ে নারী নির্যাতনের সর্বকালীন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিবাদ, প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও যেন কার্যকরভাবে এ সমস্ত অপরাধ দমন করা যাচ্ছে না। নারী নির্যাতন সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণা হলেও এখনো পর্যন্ত 'পুলিশ হেফাজতে নারী' প্রসঙ্গে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। অথচ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব, বিশেষ করে অধস্তন আদালতগুলোর স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ করে রাজনৈতিক সরকারগুলো কি উদ্দেশ্যে ও প্রক্রিয়ায় পুলিশকে নিয়ন্ত্রন করে এবং কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা পুলিশের মাঝে বিরাজমান এবং সমাজে নারীদেরকেও রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় বাহিনী আইনের চোখে দেখে কিনা, সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা সম সাময়িককালের একটি অন্যতম দাবি হিসেবে অনুভূত হয়ে আসছে এবং এই অনুভূতির বাস্তব রূপদানে সহায়তার জন্য বর্তমান গবেষণা কর্মটি গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা কর্মে যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছি তা হলো –

প্রথমত: যেখানে আপামর মানুষ বর্তমানের প্রেক্ষাপটে পুলিশের নাম শুনলে আর্তকে ওঠে সেখানে পুলিশের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ যেমন- ধর্ষণ,মৃত্যু,যৌন- হয়রানি অর্থ্যাৎ , পুলিশ হেফাজতে যেসব নারীরা বিগত বছরগুলোতে ছিল তাদের সম্পর্কে থানায় গিয়ে diary বা case register নিয়ে victim দের সাথে কথা বলতে অনেক কষ্ট হয়েছে । কারণ একটি ক্ষমতা প্রয়োগকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশ কখনই তাদের অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি ।

দ্বিতীয়ত: যেসব নারীরা থানা হেফাজতে ছিল তাদের বেশির ভাগই পুলিশের ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে চায়নি এক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে ।

তৃতীয়ত: ধর্ষণের শিকার নারীর প্রতি সমাজের বিরুপ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাই গোপন করে যাওয়া হয় । ফলে থানায় ধর্ষনের অভিযোগ খুব কমই আসে। আইনি প্রক্রিয়াটিও নারীর জন্য খুব সহায়ক নয় । ফলে পুলিশ কর্তৃক অনেক নারী নির্যাতনের ঘটনা নির্যাতিত নারী ও তার পরিবার সহজে প্রকাশ করতে চায় না ।

চতুর্থত: অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতিতা বা যারা পুলিশ হেফাজতে ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার নিতে কয়েকবার যেতে হয়েছে কারণ তারা সময় দিয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিত থাকেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত: ক্ষমতা প্রয়োগকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশের নেতিবাচক ইমেজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। পুলিশের অপরাধ পুলিশ কর্তৃক স্বীকার করা তো দূরে থাক, বরং বিভিন্ন সময়ে পুলিশ হেফাজতে যেসব নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ সেগুলোকে অন্যভাবে ব্যাখা করার চেষ্ঠা করেছে । যেমন- পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুবরণকারী দিনাজপুরের ইয়াসমিন ও চট্টগ্রামের সীমা চৌধুরী কে পুলিশ কর্তৃক পতিতা বানানের চেষ্টা করা হয়েছিল । এমতাবস্থায় ঢাকা ও খুলনা বিভগের দুটি থানায় গিয়ে থানা হেফাজতে থাকা নারীদের সম্পর্কে জানার জন্য থানা রেজিষ্টার সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা হয়েছে সেগুলো হলো- রেজিষ্টার দিতে গড়িমসি করা, অযথা বসিয়ে রাখা ইত্যাদি ।

অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে নারীদের অধঃস্তন অবস্থান, অভিযুক্ত ও নির্যাতনকারী পুলিশ সদস্যদের উপযুক্ত বিচার ও শাস্তি না হওয়ার কারণে পুলিশ হেফাজতসহ সর্বত্র নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। এমতাবস্থায় ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন ও বিধিসমুহ সহ নারী নির্যাতন বিষয়ক আইন ও বিধিসমুহের যুগোপযোগী সংশোধন, নির্যাতিত নারীদের যথার্থ আইনী সাহায্য প্রদান ; পুলিশ বাহিনীতে অধিকহারে নারীদের অংশগ্রহণ ; পুলিশ ও আইন প্রণয়ন সংস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের লিঙ্গ-সমতা বিষয়ক আইন সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারী ও মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের কেসের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হলে পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি

গবেষণার পরিধির মধ্যে রয়েছে পুলিশ বাহিনীর জন্ম, বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, পুলিশ হেফাজত এর অর্থসহ পুলিশ আইনের বিভিন্ন দিক যেমন পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্তব্য-অপরাধ,পুলিশী গ্রেফতার ও আটক, মহিলাদের প্রতি পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী, পুলিশ কর্তৃক মহিলাদের দেহতল্লাশি প্রভৃতি বিষয় । এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে কয়েকটি ধাপে যেমন-" বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে নারী" হচ্ছে এই গবেষণার মূল প্রত্যয়-এটিকে সামনে রেখে বৃটিশ ও পাকিস্তান পিরিয়ডে নারীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় বাহিনী তথা পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী,পুলিশ হেফাজতে তৎকালীন নারীদের নিরাপত্তা-নির্যাতন, এবং সার্বিক অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে । অত:পর বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ৯০ এর দশক থেকে শুরু করে ২০১০ সাল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে,পুলিশ হেফাজত বলতে যে ২৪ ঘন্টা বোঝান হয় অত্র গবেষণায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে,পুলিশ হেফাজতে অধিকাংশ নারী নির্যাতন,মৃত্যু ,সহিংসতা বা যৌন- হয়রানির ঘটনা উক্ত ২৪ ঘন্টার বাইরেই ঘটেছে । তাই অত্র গবেষণায় পুলিশ হেফাজত বলতে ব্যাপক অর্থে ইউনিফর্ম পরিহিত, ডিউটিরত পুলিশ এবং তাদের সকল কার্যক্রম ও অবস্থানকে বোঝান হয়েছে । পুলিশ হেফাজত যেহেতু একধরনের নিরাপত্তা হেফাজত সেহেতু এর বিভিন্ন দিক, সুবিধা ও অসুবিধার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ কর্তৃক আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এবং তাদেরকে মানবাধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের বিষয়গুলিও আলোচনা করা হয়েছে । কেন পুলিশ হেফাজতে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, কোন শ্রেণীর পুলিশ এর সাথে জড়িত ইত্যাদি বিষয়সহ পুলিশের নানাবিধ সমস্যার কথাও অত্র গবেষণার পরিধির মধ্যে রাখা হয়েছে । রাষ্ট্র ও জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সহ পুলিশ হেফাজতে নারীর নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার নিমিত্তে বিভিন্ন সুপারিশমালা ও অত্র গবেষণার পরিধিভূক্ত।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি নির্ভর করে গবেষণার বিষয়বস্তুর ও প্রকৃতির উপর। এ পদ্ধতি হচ্ছে কোন বিষয়ের তত্ত্বীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আনুষঙ্গিক প্রশ্নাবলি ও অনুমিত বিষয়ের আলোকে কোন সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রক্রিয়া। পুলিশ কাষ্টডিতে নারী নির্যাতন একটি সময়োচিত গবেষণা যার সাফল্য নির্ভর করে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপর। এই গবেষণা কর্মটি দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

এই গবেষণা কর্মটি মূলতঃ বিষয়বস্তু গুণধর্মী গবেষণা। তাই এই গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও বিশ্লেষণে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস যুগপৎভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) প্রাথমিক উৎস হিসেবে পুলিশ বিভাগে কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তা, পুলিশ কনষ্টেবল, থানা অফিসার ইনচার্জ, কয়েকজন বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে গবেষণা সংশ্লিষ্ট অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া গবেষণার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, গোল টেবিলে বৈঠক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নারী যারা পুলিশ হেফাজতে নির্যাতিত হয়েছেন তাদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া পুরুষদের মনোভাব যাচাইয়ের জন্য তাদের সাক্ষৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সঠিক ফলাফল বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(খ) মাধ্যমিক উৎস বিশেষতঃ দেশে-বিদেশে প্রকাশিত পুস্তক, জার্নাল, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দলিল, সংবিধান, ওয়েবসাইট ও দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত পুলিশ হেফাজতে নারী বা পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়বস্তু অধ্যয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । পুলিশ হেফাজতে নারী ধর্ষন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় ও আদেশ অধ্যয়ন করে তা থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

উইমেন ফর উইমেন, অধিকার, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্লাষ্ট, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারী পক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

লিটারেচার রিভিউ/ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা

পুলিশ হেফাজত কিংবা নিরাপদ হেফাজতে নারীদের নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ধরনের গবেষণা হয়নি যা হয়েছে সেটা হলো নারী নির্যাতন সম্পর্কে প্রকাশিত গবেষণায় সামান্য পরিধিতে পুলিশী কর্তৃক নারী নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন কেস স্টাডি। এছাড়া নারী অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যেমন- উইমেন ফর উইমেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), অধিকার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ব্লাস্ট (BLAST) কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পুলিশী হেফাজতে নারী বা পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে যে সকল গ্রন্থগুলো প্রনিধানযোগ্য বিবেচিত হয়েছে সেগুলো নিম্নে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হলোঃ-

সেলিনা হোসেন কর্তৃক ***"বাংলাদেশের মেয়ে শিশু"*** (প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ১৯৯০, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ২০০২) গ্রন্থটিতে পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতনের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন কেস স্টাডিতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পুলিশী হেফাজতে তথা থানা হাজতে পুলিশ কর্তৃক নারী ধর্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ধর্ষনের বিচার চাইতে গিয়ে কিভাবে নারীকে থানা হাজতে বন্দী করা হয়। "বাংলাদেশের মেয়ে-শিশু" নামক বইটিতে লেখক দেখিয়েছেন, আইনে নেই, জেলকোডেও নেই, অথচ নিরাপত্তা এখন একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। নানা অজুহাতেই নারীদের-মেয়েদের নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে মেয়েরা কতটা নিরাপদে থাকে সেটা এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। কারা প্রশাসন সূত্র জানায়, নিরাপদ হেফাজতে রাখা মেয়েদের অধিকাংশই বিতর্কিত বিবাহ বা বিবাহে সৃষ্ট বিরোধজনিত সমস্যা, পাচার হয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের কাছে ধরা পড়া কিংবা কোনো মামলার বাদি হওয়ায় আসামির হুমকির কারণে এ অবস্থায় এসেছেন। কারা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলোর কারাগারে নিরাপদ হেফাজতে আশ্রয়াধীন মহিলা ও শিশুদের অধিকাংশই পাচার হয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ তাদেরকে আদালতে নিয়ে গেলে আদালত তাদের অভিভাবক না পাওয়া পর্যন্ত নিরাপদ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

"কত বছর বয়স পর্যন্ত একজন মেয়েকে শিশু বলে গণ্য করা যাবে, সে বিষয়ে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেই। জাতিসংঘের ১৯৮৯ সালের Convention on the Rights of the Child এর Article 1 নিম্নরূপঃ

For the purpose of the Present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারা অনুযায়ী আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সব মেয়েকেই শিশু বলে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত কোনো মেয়েকে শিশু বলে গণ্য করা কতদূর বাস্তবসম্মত তা ভেবে দেখা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ছিলো ১৮.৪। আঠারো বছর বয়স হবার আগেই কিছু কিছু মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। বিবাহিত মেয়েদের কি শিশুদের মধ্যে গণ্য করা উচিত?

The Penal Code-1860 এর ধারা অনুযায়ী সাত বছর বয়সের কম কোনো শিশুর কৃত কোনো কর্ম আইনের চোখে অপরাধ নয়। সাত বছর বয়সের বেশি কিন্তু বারো বছর বয়সের কম কোনো শিশু যদি তার আচরণের তাৎপর্য বোঝার মতো জ্ঞান অর্জন না করে, তা হলে তার কৃতকর্মও অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আবার ১৮৯০ সালে The Railways Act- এ বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এ ধরনের অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অন্যান্য আইনেও শিশুদের বয়স ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা আছে।

সার্ক ১৯৯০ সালকে 'মেয়ে-শিশু বর্ষ' বলে ঘোষণা করে এবং স্থির করে যে, বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের শিশু বলে গণ্য করা হবে। যৌতুক ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়কে এ পরিপ্রেক্ষিতে মেয়ে-শিশু বিষয়ক আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

রিসার্চ ইভালুয়েশন এ্যাসোসিয়েটস্ ফর ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (রীড) এর বাস্তবায়নে *"নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ভেঙ্গে দাও নীরবতা"* (সহযোগিতায় রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাস, প্রকাশ ১১ নভেম্বর, ২০০৮) পুস্তিকাটি নারীর জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

অসহনীয় যন্ত্রণা ও বেদনার কাহিনী পরিস্ফুটনের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। যে কাহিনী সার্বিকভাবে রচিত হয়েছে নারী নির্যাতনের নিদারুন অভিজ্ঞতার আলোকে, এ নির্যাতনের সার্বিক রুপ ভয়ানক ও ভীতিপ্রদ এবং সেগুলো হলো- নির্যাতনের মাধ্যমে করুন মৃত্যু, রাসায়নিক দাহ্য পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে দগ্ধ হওয়া, শারীরিক পাশবিক নিপীড়ন এবং মানসিক অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার। এই পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে, পুলিশের কাছে নারী নির্যাতন বিষয়ক যেসব কেস নিবন্ধন করা হয় তা যথেষ্ট নয়, পুলিশদের সিংহভাগেরই (৭২%) ধারণা, মাত্র ১০-২০ শতাংশ কেস থানায় নিবন্ধিত হয় এবং অধিকাংশ পুলিশ (৫৫%) এর মতে, থানায় নিবন্ধনকৃত নারী নির্যাতনের কেসগুলির অন্তত ৫১ শতাংশই অসত্য। এ তথ্যটি নারী নির্যাতনের কেস সমূহের সত্যতা নিরূপণ করার ব্যাপারে পুলিশদের সদিচ্ছার অভাবকেই তুলে ধরে।

রাইটস ও গর্ভনেন্স প্রজেক্ট উইমেন পর উইমেন : রিসার্চ ও স্টাডি গ্রুপ,সহযোগিতায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০০৮ কর্তৃক প্রকাশিত মানবাধিকার ও গর্ভনেন্স বিষয়ক পুস্তিকা *"পুলিশের জন্য"*। এই পুস্তিকাটির মূল উদ্দেশ্য হল পুলিশ এবং পুলিশ প্রশিক্ষকদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করা,যার ফলে পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে মানদন্ড,নৈতিকতা সর্ম্পকিত মানবাধিকার বিষয়সমূহ সম্পৃক্ত করতে পারে। এর লক্ষ হল মানবাধিকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা ও চিন্তাধারা যেন পরিপূর্ণভাবে আইন প্রয়োগকারীদের প্রশিক্ষণের মূলধারায় নিয়ে আসা নিশ্চিত করা যায় এবং ঐ প্রশিক্ষণের সাথে যেন এগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সামগ্রিক লক্ষ হল যে, পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীগণ যে সমাজে কাজ করবেন তারা যেন সেখানে পেশাদার কর্মকর্তার উপযোগী সেবা দিতে পারেন।

"বাংলাদেশের আইন,বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ" শিরোনামের গ্রন্থটি বিচারক মো: শফিকুর রহমান কর্তৃক রচিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রাচীন হিন্দু, মুসলিম ও বৃটিশ আমলের পুলিশ আইন, বিচারালয়ের গঠন, বিচারকগনের নিযুক্তি এবং বিচারবিভাগীয় মানদন্ড,আদালতের ক্ষমতাও এখতিয়ার, আদালতের কার্যপদ্ধতি ইত্যাদির বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি গ্রন্থটিতে তুলে ধরে সে সকল ত্রুটি দূর করার বিভিন্ন সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে।

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী ***Democracy: Rule of Law and Human Rights*** গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গণতন্ত্র,আইনের শাসন ও মানবাধিকার নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হলেও আইনের শাসন ও পুলিশ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে গ্রন্থটিতে একটি চমৎকার প্রবন্ধ গ্রন্থিত করা হয়েছে।তাছাড়া গ্রন্থটিতে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা নিয়ে একটি সৃজনশীল প্রবন্ধ সংযোজিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিখ্যাত মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে এবং বিখ্যাত পন্ডিতদের বাণীর তাৎপর্য বিশ্লেষন করে Rule of Law and Independence of Judiciary প্রবন্ধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক রচিত ***"পুলিশ রেগুলেশনস ও গাইড"*** (প্রকাশক নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০০) নামক

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে লেখক পুলিশ বাহিনীর কার্যাবলী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সন্নিবেশিত করেছেন। পুলিশ বাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। সঠিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। অপরাধীদের আটক করা এবং বিচারে সোপর্দ করে দুস্কৃতিকারী ও সমাজ বিরোধীদের দমন করতে না পারলে একদিকে যেমন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তেমনিভাবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য। পুলিশের এই অপরিহার্য কাজই করতে হয় নিয়মনীতির মাধ্যমে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এসকল বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিবছর *"হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ"* নামে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন বাংলাদেশে এক বছরে ঘটে যাওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ঘটনার সংকলন মাত্র নয়। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, তার অন্তর্নিহিত কারণ খতিয়ে দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এখানে। এই প্রতিবেদন সমূহের চিন্তামূলক ও গবেষণাধর্মী অধ্যায়গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সংবিধানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ, যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটক, চলাফেরা ও সমাবেশের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি বিষয়ে অধিকার লঙ্ঘনের কারণ উদঘাটনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন প্রতিটি অধ্যায়ের লেখকগণ।

Dhaka University Institutional Repository

Roushan Jahan ও Mahmuda Islam কর্তৃক (publishd by Women For Women: A Research and Study Group Dhaka, Bangladesh, 1997) রচিত গ্রন্থ ***"Violence Against Women in Bangladesh, Analysis and Action"***- এ পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় কেস স্টাডি হিসেবে এসেছে পুলিশ হেফাজতে দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষন আর তার হত্যাকান্ড এবং গার্মেন্টস কর্মী সীমা চৌধুরীকে পুলিশ হেফাজতে চার (০৪) জন পুলিশ অফিসার কর্তৃক ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনা।

United Nations Development Program (UNDP) কর্তৃক ***Human Security in Bangladesh*** : In Search of Justice and Dignity গ্রন্থটি প্রকাশিত। গ্রন্থটির "Prosecution and Punishment of Human Security Violations: Functioning of the Court System" শীর্ষক অধ্যায়ে/ গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিরাজিত সমস্যাবলীর তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। যে সকল প্রতিবন্ধকতার কারণে সাধারণ জনগণ আদালতবিমুখ তার তথ্যাবলী গ্রন্থটিতে পরিবেশন করা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি পুলিশের দুর্ব্যবহারের ভয়ে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়না, শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা নিস্পত্তির কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকায়, শতকরা ৭০ ভাগ ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটরদের অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

দিতে হয় বলে এবং শতকরা ৪০ ভাগ ব্যক্তি আদালত ব্যবস্থার প্রতি আস্থা না থাকার কারণে আইনের আশ্রয় গ্রহণে অনিচ্ছুক।

মোঃ আব্দুল হালিম কর্তৃক ***The Legal System of Bangladesh*** গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আইন সংক্রান্ত সংস্থাগুলির বিভিন্ন সমস্যা এবং পদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থটিতে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এতে পুলিশী গ্রেফতার, রিমান্ড, আপীল, রিভিউ, রিভিশন, আইন সহায়তা, আইন পেশা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ১৯৯৯ এর বাংলাদেশ অংশের বিবরণীতে বলা হয়েছেঃ

.... পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং অন্যান্যভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। হুমকি দেয়া, পেটানো এবং মাঝে মধ্যে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। সরকার কদাচিৎ নির্যাতনকারীদের সাজা দিয়ে থাকে এবং শাস্তির ঝুঁকি না থাকায় পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। .... পুলিশ বা অন্যান্য সরকারী হেফাজতে আটক মহিলাদের ওপর ধর্ষণ একটি সমস্যা। ....পুলিশ তার হেফাজতের বাইরেও মহিলাদের ধর্ষণ করে। ....পুলিশ বিরোধী দলের মিছিলের বিরুদ্ধে প্রায়ই মাত্রাতিরিক্ত, কখনো কখনো প্রাণঘাতি শক্তি প্রয়োগ করে। .... বিশ্বাসযোগ্য খবর রয়েছে যে পুলিশ নারী ও শিশু পাচারে সহায়তা করে বা জড়িত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭ই ডিসেম্বর, ২০০২ ইং তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে দূর্নীতিগ্রস্ত খাত হলো পুলিশ বিভাগ। ১০০ জন সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন পুলিশ বিভাগে দূর্নীতির শিকার হন।

নাসির আহমেদ রচিত *"জোট সরকারের ৫ বছর, কিছু খন্ড চিত্র-১"* গ্রন্থে লেখক (প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৯) সম্প্রতি হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে বারবার রাজপথে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের নৃশংসভাবে দমন করতে গিয়ে পুলিশ নারীকর্মীদের ওপর নির্মম পীড়ন ও শ্লীলতাহানির মতো ভয়াবহ অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে বলে কিছু বাস্তবমুখী উদাহরণ দিয়েছেন। লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন, পুলিশের বিরুদ্ধে এ যাবত যত মামলা হয়েছে, দেখা গেছে সব মামলারই তদন্তভার দেয়া হয়েছে পুলিশকে। ফলে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত প্রায় হয় না বললেই চলে। নালিশী মামলাগুলো তদন্তের নির্দেশ আদালত থেকে দেয়া হয় ঠিকই, কিন্তু সে আদেশ সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তারা পালন করছেন না প্রায়। ফলে তদন্ত রিপোর্টও আদালতে পৌঁছায় না। এমনকি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে আদালত তদন্ত রিপোর্ট চাওয়ার পরও রিপোর্ট জমা দেয়া হয় না। এক সময় হারিয়ে যায় নালিশী মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ার বিষয়টিও। এই গাফিলতি বা অবহেলার মূল কারণ, পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ আবার পুলিশকেই দেয়া হয় তদন্তভার।

Dhaka University Institutional Repository

Community Development Library কর্তৃক প্রকাশিত- Sheuly Roselyne Palma কর্তৃক সম্পাদিত ***Women Situation of Bangladesh*** *জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৪ এবং জানুয়ারী-জুন, ২০০৫-* এর প্রতিবেদনে নারীর জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন- নারী নির্যাতন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও পুরুষের মজুরি বৈষম্য, স্বাধীনতার ৩৫ বছরে ক্ষমতায়নে নারীর অর্জন ও করণীয়, নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, নারী অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন লেখক- নারী ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ, তদন্ত ও বিচার, নারীদের নিয়ে সাইবার সন্ত্রাস এবং পর্নোগ্রাফি, এসিড অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, পুলিশ হেফাজতে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামীদের ফাঁসি, নারীর অর্জন ও ব্যর্থতা, নারীর পারিবারিক নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী রচিত ***"নারী ও রাজনীতি"*** (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৬, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, বাংলা বাজার, ঢাকা) নামক গ্রন্থে নারী নির্যাতন ও জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই নারীরা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তব চিত্র একেবারেই বিপরীত। "পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী বলতে কন্যা, জায়া, জননী- এ তিনটি রূপকেই বোঝানো হয়ে থাকে। জৈবিকভাবে একটি শিশু স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও সে জানেনা, সে নারী না পুরুষ। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয় এবং তার ওপর আরোপ করা হয় নানা

Dhaka University Institutional Repository

রকম বিধিনিষেধ।" সমাজ ব্যবস্থা কর্তৃক আরোপিত এই লিঙ্গ বিভাজন নারীর জন্য বয়ে আনে নানা ধরণের বঞ্চনা, নির্যাতন ও নিপীড়ন। আর সে জন্যই নারীরা নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রেই নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এমনকি পুলিশের কাছে সহায়তা চাইতে গিয়ে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হবার ঘটনাও ঘটেছে।

নমিতা খান সম্পাদিত *"নারী ও সমাজঃ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে"* (সালমানী প্রিন্টিং প্রেস, নয়াবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫) গ্রন্থটি অতি সাম্প্রতিক সময়ের নারী-ইস্যু নিয়ে রচিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধের সংকলন। নারী ও সমাজ এখানে কেবল নারীর চোখেই নয়, পুরুষের চোখেও কিভাবে প্রতিফলিত ও মূল্যায়িত হয়েছে, নমিতা খান তা একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। এখানে আলোচিত হয়েছে পুলিশী হেফাজতে দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ আর তার হত্যাকান্ড এবং চট্টগ্রামের সীমা ধর্ষণ আর তার রহস্যজনক মৃত্যু। যে পুলিশ বাহিনীর কাছে বিপন্ন মানুষ আশ্রয় খুঁজবে, নিরাপত্তা লাভ করবে, সেই পুলিশই এই অপরাধের ঘৃণিত হোতা। আইনের শিথিল প্রয়োগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের নিজেদের ধর্ষণকর্মে অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা হেফাজতে আটক বা থানায় আটক নারীদের ওপর পুলিশের মধ্যযুগীয় বর্বরতা, ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণজনিত জটিলতা, বিভিন্ন অভিযুক্ত ধর্ষণকারীদের আইন ও বিচার আদালতের নানা ফাঁক দিয়ে বেকসুর খালাস প্রাপ্তি (স্মতর্ব্য স্মৃতিকণা ধর্ষণ মামলা, সীমা-হত্যা মামলা), সরকারি দপ্তর ও বিভাগসমূহের সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণের অভাব এসবই পরিস্থিতিকে ক্রমশ ভয়াবহ

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতির দিকে ধাবিত করছে। ধষণকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দানও পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।

"বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ২০০৫" (প্রকাশক বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি,প্রকাশ:১২ জুলাই,২০০৬) গবেষণা কর্মটি ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে । এই গবেষণাটি সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়েছে বংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)- এ আগত আইনের সুবিচার প্রার্থী নারী ও শিশুদের নির্যাতনের দুঃখ আর যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে ।

গবেষণার দ্বিতীয় পর্বে *"সামাজিক ও আইনগত বিবর্তন: প্রথা ও আইন"* শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুর নৃশংস আচরণ ও প্রথার মূলের সন্ধানে,প্রচলিত প্রথার মূল উদঘাটনে তৎকালীন সমাজে সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকা,আন্দোলন ও নতুন নতুন আইনের জন্ম ও তার ক্রম:বিকাশমানতাকে । আলোচনা করা হয়েছে, নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা কিভাবে প্রথা আর আচরনের একই নিগড়ে আটকা পড়েছে ।এখানে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রশ্নে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করছে । যেহেতু আইনের সাথে সাথে কোন একটি মামলার কার্যকারিতা নির্ভর করছে ফৌজদারী কার্যবিধির ওপর সে কারণে কোন একটি নির্দিষ্ট মামলায় সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে বা কার্যকারি হচ্ছে না: এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে বা স্তরে আইন ও ফৌজদারী কার্যবিধি কিভাবে কাজ করছে ঘটনা সমীক্ষার মাধ্যমে (কেস ষ্টাডি)তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন আজাদের প্রথম মহাগ্রন্থ *"নারী"* প্রথম বেরোয় ১৯৯২ সালে,প্রকাশক ওসমান গণি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার,ঢাকা। তারপর বেরোয় তিনটি সংস্করণ ও বহুপুনর্মুদ্রন। নারী বাংলা ভাষার প্রথম নারীবিষয়ক গ্রন্থ, যাতে নারীবাদী কাঠামোতে বিশেষণ করা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় নারীর অবস্থা ও অবস্থান। এ গ্রন্থে লেখক ধর্ষিত নারীদের বিচারিক প্রক্রিয়ার কথা উলেখ করতে গিয়ে বলেছেন,পৃথিবী জুড়েই বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ ধর্ষিতদের পীড়িত করে প্রচন্ডভাবে। ধর্ষণের অভিযোগের পর কাজ শুরু করে পুলিশ; তারা তথাকথিত সত্য ঘটনা বের করার নামে নির্মম অশ্লীলভাবে জেরা করতে থাকে ধর্ষিতদের,যেন ধর্ষিতরাই অপরাধী । পুলিশ মনে করে কোন নারী যদি সত্যিই ধর্ষিতা হয়, তার শরীরে নানা রকম চিহ্ন থাকবেই। নারী বাধা দেবে, ধর্ষণকারী তাকে আঘাত করবে ; তার দাগ ফুঠে থাকবে ধর্ষিতের শরীরে। দাগগুলো সাক্ষী দেবে যে নারীটি ধর্ষিত। যদি কোন নারী এমন দাগ ছাড়া পুলিশের কাছে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করে, পুলিশ তাকে একটা মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু মনে করে না। পলিটিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত রচনায় এক গোয়েন্দা সার্জেন্ট তার সহকর্মীদের দিয়েছে এ- উপদেশ [দ্র টেমকিন (১৯৮৬,১৭)]:

> মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের বেলা ছাড়া বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ব্যতীত ধর্ষণ অসম্ভব, তাই তাদের শরীরে সন্ত্রাসের চিহ্ন থাকবেই। যদি কোন নারী শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছাড়া থানায় এসে ধর্ষনের অভিযোগ তোলে, তাহলে তাকে খুব কঠোরভাবে জেরা করতে হবে। যদি তার অভিযোগ সম্বন্ধে সামান্যও সন্দেহ জাগে,তবে তাকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলতে হবে। যে মেয়েরা গর্ভবতী বা বেশী রাতে বাসায় ফেরে, তাদের পরে কড়া দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা এমন ধরনের মেয়েরা খুব বদমাশ; তারা সহজেই ধর্ষণ বা অশোভন আক্রমনের অভিযোগ তোলে। তাদের কোন সহানুভূতি দেখাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

এ- উপদেশ থেকেই বোঝা যায় ধর্ষিত নারী কতোটা সহযোগিতা পায় পুলিশের। ধর্ষিত নারী পুলিশ পার হয়ে বিচারালয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় নতুন বিভীষিকা;পুলিশের নিষ্ঠুর আচরনের পর বিচারালয় মেতে ওঠে আরো নিষ্ঠুর আচরনে। পুরুষ ধর্ষিত নারীর অভিযোগ বিচারের যে- প্রক্রিয়া বের করেছে, তা দেখে মনে হয় ধর্ষণকারীর বিচার তাদের লক্ষ্য নয়,তাদের লক্ষ্য ধর্ষিত নারীর বিচার। ১৯৮২ সালে বিলেতে এক বিচারক মন্তব্য করে [দ্র টেমকিন(১৯৮৬,১৯-২০)]।:

> যে নারীরা না বলে তারা সব সময় না বোঝায় না। বিষয়টা শুধু না বলার নয়, বিষয়টা হচ্ছে সে কিভাবে না বলেছে, কিভাবে সে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছে। সে যদি এটা না চায় তাহলে তার উচিত তার দু-পা চেপে বন্ধ করে রাখা। বলপ্রয়োগ ছাড়া তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়; তাই তার শরীরে বলপ্রয়োগের চিহ্ন থাকবেই।

ধর্ষিত হওয়া যেনো নারীরই অপরাধ- কেনো সে দু-পা চেপে সব কিছু বন্ধ করে রাখেনি? ধর্ষণের বিচার ধর্ষিতাদের জন্যে চরম বিভীষিকার ব্যাপার। নিউজিল্যান্ডে ধর্ষণ সম্পর্কে গবেষকেরা জানিয়েছেন ধর্ষিতরা বিচারের পীড়নকে খারাপ মনে করে ধর্ষণের থেকেও; যা অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমতুল্য । ধর্ষিত নারী বিচার চাইতে গেলে ধর্ষিত হয় কমপক্ষে তিনবার- দুবার রুপকার্থে।

"ধর্ষণ-পরবর্তী আইনি লড়াই" নামের বইটি আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৯৯) প্রকাশ করেছে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা ভেবে। এই বইয়ে ধর্ষণ-পরবর্তী সময় কী কী করা দরকার, পাঠক সেসব তথ্য পাবেন। এছাড়া পাবেন, আইনি লড়াইয়ের পথ-পরিক্রমার নানান খুঁটিনাটি বিবরণ যা একজন মানুষের জানা বা বোঝার সুযোগ কম। এই পুস্তিকাটি যেমন লেখা হয়েছে সাধারনভাবে সকল নারীর জন্য তথ্য পুস্তিকা হিসেবে, আবার বিশেষভাবে লেখা হয়েছে সেই বোনকে

Dhaka University Institutional Repository

২০০৩) গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ষণের নানা ধরনের ঘটনা সংকলন করা হয়েছে। ধর্ষণ কাদের করা হচ্ছে, কারা ধর্ষণ করছে, কোথায় হচ্ছে, ধর্ষণের পর কি হচ্ছে, শাস্তি আদৌ হচ্ছে কি না, ইত্যাদি সকল ধরণের তথ্যকে সাজানো হয়েছে।

ড: নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ কর্তৃক *"মুক্তি মঞ্চে নারী"* (প্রকাশক - প্রিপ ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৯৯) গ্রন্থটিতে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে যে সব মহিলারা নারী মুক্তি আন্দোলন তথা মানবমুক্তির দায়ভাগ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁদের কর্মকান্ডের ওপর আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে কিভাবে নারীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার লড়াইয়ে এক অসম সাহসী যোদ্ধা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়েছেন, পাক সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, শোষণ নির্যাতনে প্রতিবাদী হতে পেরেছেন। জন্মভূমিকে ভালোবেসে, গুলির মুখে, পুলিশের লাঠির কাছে ,গোয়েন্দা পুলিশের নির্মম অত্যাচার সয়েছেন। পুরুষের পাশাপাশি সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন এবং করে যাচ্ছেন।

অদিতি ফাল্গুনী কর্তৃক *"বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস"* (প্রকাশক - অন্বেষা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী বইমেলা, ২০১০) গ্রন্থটিতে উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে ভারত উপমহাদেশের বাঙালী নারীর শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক অভ্যুদয়, বাংলার নারীর রাজনৈতিক লড়াই, কংগ্রেস আন্দোলন, ভোটাধিকার সংগ্রাম, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং বাঙলার কৃষক আন্দোলনে সংগ্রামী

Dhaka University Institutional Repository

তেভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন কালপর্ব, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পার্টির ভূমিকা চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তেভাগা অভ্যুত্থানের এক পর্যায় যে নারী বাহিনী গড়ে উঠেছিল, লেখক তাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে ধরেছেন। বস্তুতঃ গোটা বইয়ে এটিই হচ্ছে লেখকের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। বাংলার তেভাগা অভ্যুত্থান নারীর ভূমিকা বিবৃত করে। বইটির মূলগত বিষয়টি হল এক বিস্তীর্ণ গণ-অভ্যুত্থান যা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বিপ্লবী এলাকাকে কাপিঁয়ে তুলেছিল।

এমতাবস্থায় বলা যায় যে, ১৮৬১-এর ঔপনিবেশিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে যে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়, একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার উপযোগিতা কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। জনগণের নিয়ন্ত্রণ নয়, জন নিরাপত্তার উন্নয়ন : শাসকের ভূমিকা নয়, সেবকের ভূমিকা ; রাজনৈতিক স্বার্থ নয়, ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ নয়, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে অবদান রাখাই আজ পুলিশের মূল কর্তব্য। আইন প্রয়োগে দলীয় বা পক্ষপাতিত্বমূলক কোনো মনোভাব কোনোরূপেই কাঙ্খিত নয়। কেবল সংবিধান ও আইনের চোখে সকলে সমান হলেই চলবে না, আইন প্রয়োগকারীর চোখেও সকলে সমান হতে হবে।

পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের যে কথা বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে করণীয় অপেক্ষা বর্জনীয় বিষয়ের তালিকা অনেক বড় হওয়া উচিত। পুলিশের, সংস্কৃতির মধ্যে অপসংস্কৃতির, ম্যাল প্রাকটিস প্র্যাকটিসের নামে চলে আসছে বহু বছর ধরে। এসব ম্যাল প্র্যাকটিস চিহ্নিত করে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ সপ্তাহে ভালো কাজের জন্য অনেক পুলিশ সদস্যকে পদক প্রদান করা হয়। জঙ্গি দমন, চরমপন্থি দমন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ, আইন প্রয়োগ, গোয়েন্দা তৎপরতা, উন্নত মানের তদন্ত পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং বহু ক্ষেত্রে কর্তব্যের প্রয়োজনে নিঃশেষে মৃত্যুবরণ করা পুলিশ সদস্যের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। অধিকাংশ সময় প্রতিকূল পরিবেশে অপ্রতুল অর্থ, অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সঙ্গতির অভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশকে তার দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার কাজ পুলিশের নয়। নানাবিধ চাপের মধ্যেই তাকে তার প্রাত্যহিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যক্তি নিরাপত্তা উন্নয়নে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্তার কোনো বিকল্প নেই। তার সঙ্গে চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সংকল্প। থানা, পুলিশ, জিডি, এজাহার ইত্যাদি শব্দ জনগণের কাছে অস্পষ্ট ও রহস্যজনক হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। এজন্য প্রয়োজন পুলিশ সহজপাঠ বা 'পুলিশিং মেড ইজি'। থানা পুলিশের কাজের অস্পষ্টতা দূর করে স্বচ্ছতা আনতে হবে এবং এর রহস্য উম্মোচন করে জনগণের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়া ও সুশীল সমাজ অনেক অবদান রাখতে পারে।

সন্ত্রাস, জঙ্গি ও চরমপন্থি তৎপরতা, বেআইনি অস্ত্র, ড্রাগের নেশা, আণবিক বোমা অপেক্ষাও অনেক বেশী বিপজ্জনক। জাতীয় জীবনের অনেক বিভীষিকাময় সংকটের মূলে এসব গণবিরোধী তৎপরতা কাজ করে চলছে প্রতিনিয়ত। তাই জনস্বার্থে এসব অপতৎপরতা নির্মূল করতে জাতীয়ভাবে সমবেত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং পুলিশকেও পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে Missionary zeal নিয়ে এসব

Dhaka University Institutional Repository

বিধ্বংসী কার্যকলাপের মোকাবেলা করতে হবে। কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, তবে কখনও, 'ক্রসফায়ারের' মতো আইনবহির্ভূত কোনো পদক্ষেপ নিয়ে নয়। 'ক্রসফায়ার' নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুরতা- দূর্বলতা থেকেই উৎপত্তি। 'ক্রস ফায়ার' কোনো সমাধান নয়। গণতন্ত্রে মানবাধিকার বা আইনের শাসনের কোনো বিকল্প থাকতে পারে না। অপরাধের প্রকৃত কারণ খুঁজে তার যথাযথ বিহিত করতে হবে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উর্বরতার জন্য যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দায়ী তা চিহ্নিত করে দূর করতে হবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সমাজে আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব ঘটলে তা বিভীষিকা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যেখানে আইন রাজত্ব করে সেখানে আইন মানাই তো স্বাধীনতা, আমরা কি আইন মানা জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না ?

জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুলিশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেই পুলিশের প্রতি আজ আস্থার অভাব হবে কেন ? ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিশ্বাসী হওয়া। 'আমি একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ'- এর চেয়ে বড় গৌরব আর কিসে হতে পারে ? অন্যদিকে আইনের শাসনের নামে মানবাধিকার রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে আইন প্রদত্ত সেই ক্ষমতার অপব্যবহারের চেয়ে বড় কপটতা আর কী হতে পারে ? আইন অনেক কিন্তু সততা ও নৈতিকতার চেহারা এক। নৈতিকতা সম্পন্ন একজন পুলিশ কর্মকর্তা সমাজে অনেক অবদান রাখতে পারে।

পুলিশ বাহিনীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের অসৎ উদ্দেশ্যে, সহজেই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে এবং সহজেই যাতে হস্তক্ষেপ করা যায় তজ্জন্য বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সরকারগুলো প্রশাসনিক ক্যাডারের সহযোগিতায় বিভিন্ন অজুহাতে, বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে পুলিশ বাহিনীর সংস্কারে দীর্ঘ সময় ক্ষেপন করে নিজেদের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পুলিশে নিয়োগ, পদোন্নতি বদলিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকায় পুলিশ কর্মকর্তারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেনা।

অধ্যায় বিন্যাস

গবেষণা কর্মটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলোঃ

১ম অধ্যায় ঃ ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার পরিধি এবং গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত ।

২য় অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ে গবেষণা কর্মের মূল প্রত্যয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। "পুলিশ হেফাজতে নারী" হচ্ছে এই গবেষণার অন্যতম মূল প্রত্যয়। তাই এই অধ্যায়ে পুলিশ বাহিনীর জন্ম, বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, পুলিশ হেফাজত এর অর্থসহ পুলিশ আইনের বিভিন্ন দিক যেমন পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্তব্য-অপরাধ, পুলিশী গ্রেফতার ও আটক, মহিলাদের প্রতি পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী, পুলিশ কর্তৃক মহিলাদের দেহ তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ, সুরতহাল, ময়নাতদন্ত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'পুলিশী হেফাজতে নারী' প্রত্যয়টি

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার পূর্বে "পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে রক্ষাকবচ সহ নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) নারীর ধর্ষণ এবং শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় এ অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পুলিশ হেফাজতে নারী ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান । নারীর অধিকার সচেতনতার যুগ শুরু হয় ব্রিটিশ ভারতে। শিক্ষার সুযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রভৃতি দাবীর পাশাপাশি গণতন্ত্র ও শান্তির দাবীতে নারীরা সোচ্চার হয়েছিল। বিদেশী শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য নারীরা পুরুষের পাশাপাশিআন্দোলন করেছেন সংগঠিত আকারে। সেই আন্দোলনে এবং পুলিশ হেফাজতে থেকে তারা কারাবরণও করেন। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তেভাগা, টংক, নানকার এবং ভাষা আন্দোলনেও নারীরা ব্যাপক অংশগ্রহণ করেন এবং পুলিশী গ্রেফতার এবং পুলিশ হেফাজতে কেউ কেউ ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হন। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পুলিশের সেই নিপীড়ক ভূমিকার অবসান ঘটেনি।

৪র্থ অধ্যায় ঃ ৯০ এর দশকে পুলিশ হেফাজতে নারী ধর্ষণ ও মৃত্যু (ইয়াসমিন ও সীমা চৌধুরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলা)।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীর জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মাপকাঠি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আইন

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিসহ নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় পুরুষের ভূমিকার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। আরও আলোচনা করা হয়েছে পুলিশ কর্তৃক নারী ধর্ষনের তালিকা সহ নারী নির্যাতনের আদিম রূপ। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু সহ কারাগারের তথা থানা হেফাজত গুলোর অবস্থা ও গ্রেফতারকৃতদের অধিকার। পুলিশ হেফাজতে তথা থানা হেফাজতে নারীর গোপনীয়তা রক্ষা, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সহ থানা হাজতে দূর্নীতির মতো বিভিন্ন দিক। নারী বন্দীদের উপর পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক যৌন নির্যাতন পুলিশের দৈনন্দিন কাজের এবং সেবা যত্নের দায়িত্বের গুরুতর লঙ্ঘন এবং এটি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ। এ সকল বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, মৌলবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজে নারীর অবস্থান। পুলিশের নানাবিধ সমস্যা, পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহিতা ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭।

এছাড়াও এ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন ও নীতিগত যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে- বিশেষ করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ঘোষণা, নারী নির্যাতন রোধ ও নারী-পুরুষ সমতা এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে। নারী নির্যাতন মামলার বিচারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, যা নারীর আইনি নিরাপত্তা বিধানের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ। নারী অধিকার আন্দোলনকারীরা নাগরিক সমাজের সাথে সম্মিলিতভাবে কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নের বিচারের দাবির আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, কীভাবে নারীর সম-অধিকারের বিরোধিতাকারী ধর্মীয় দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে- এ বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে এখানে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও ২০১১ এবং জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রকর্তৃক নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। এছাড়াও এখানে আলোচিত হয়েছে পুলিশের নানাবিধ সমস্যা যেমন: আবাসন, খাবার,যানবাহন ইত্যাদি বিষয়। আরো আলোচিত হয়েছে পুলিশী হেফাজতে নারী নির্যাতন সম্পর্কে জনমত। পুলিশ হেফাজত বনাম নিরাপদ হেফাজত এবং এর আইনগত ভিত্তি এবং নিরাপদ হেফাজতে নারীকে যে ধরনের বৈরি পরিবেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে সেসব বিষয়সমূহ।

৭ম অধ্যায় ঃ পুলিশ হেফাজতে নারীর মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে সুপারিশমালা

৮ম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ে গবেষণা ভিত্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে একটি যুক্তিযুক্ত উপসংহার টানা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুলিশ হেফাজতে নারী ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

পুলিশী হেফাজতে নারী ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভূমিকা

'বাংলাদেশে পুলিশী হেফাজতে নারী' ধারণাটি বহুলাংশে নারীর মানবাধিকার এবং বাংলাদেশের নারী তথা মেয়ে-শিশুর অবস্থা তথা বৈষম্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ের শুরুতেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানবাধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার সম্বোধন করে। যেখানে মানুষ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি সর্বজনীন সমমূল্য ও সমমর্যাদা পাবে। এই সর্বজনীনতাই মানবাধিকার সনদের মূলমর্ম। চট্টগ্রামের রাউজান পাবলিক হলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসের এক সেমিনারে বলা হয় ২৫ বছরে পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ধর্ষিত হয়েছে ৫ হাজার ৮ শ ৬৭ জন নারী। আর এ পর্যন্ত মাত্র ১শ ১২টির মতো ঘটনায় পুলিশের শাস্তি হয়েছে (সংবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০) বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার এক পরিসংখ্যানে এই তথ্য দেয়া হয়েছে। সেমিনারে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ ১৯৯৯ সালে দেশে ৮ হাজার ৭শ ১০ জন নারী ও শিশু নির্যাতিত হয়েছে, যা ১৯৯৮ সালের তুলনায় দেড় হাজার বেশি। বাংলাদেশে নারীর অধিকার সুরক্ষার আইনের খুব একটা ঘাটতি নেই, যা আছে তা হলো আইন প্রয়োগের অভাব। সাথে রয়েছে বিদ্যমান ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের সময়োপযোগী সংস্কারের অভাব। এই অধ্যায়ে নারী অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে যেসব আইন রয়েছে সেগুলোর উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Women face specific forms of violence: rape and other forms of sexual abuse, female foeticide, witch-killing, sati, dowry murders, wife-beating. Such violence and the continued sense of insecurity that is instilled in women as a result keeps them bound to the home, economically exploited and socially suppressed. In the ongoing struggles against violence in the family, society and the State, **we recognize that the State is one of the main sources of violence** and stands behind the violence committed by men against women in the family, the work-place and the neighbourhood. For these reasons a mass women's movement should focus on the struggle against them in the home or out of it.

—Resolution,

Nari Mukti Sangharsh Sammelan,

Patna 8 February 1988

বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভারতীয় উপমহাদেশের সংগঠিত রাজন্য ব্যবস্থায় মনুর মন্ত্রিসভার সদস্য কৌটিল্য রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে দেশের ঘটনা প্রবাহ সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। মনুর শাসনামলেই প্রথম সামাজিক সুশাসনের ধারণাটির সূচনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

মুসলিম শাসনামলে শেরশাহ মনুর শাসনামলের অনুরূপ গুপ্তচর নিয়োগ করে দেশের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পুলিশী ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। এই ধারাই পরবর্তীতে মোঘল সম্রাটদের দ্বারা পরিবর্ধিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সম্রাট আকবর উপমহাদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পুলিশ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

সম্রাট আকবর সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফৌজদার, মীর আদল, কাজী ও কোতয়াল নিয়োগ করেন। কোতয়ালগন প্রধানত শহর ও নিকটবর্তী এলাকাসমূহের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তাদের অধীনে ঘোড়সওয়ার ও বরকন্দাজ বাহিনী নিয়োজিত ছিল। ফৌজদারের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় পুলিশী ব্যবস্থা ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ছোট ছোট এলাকার জন্য থানাদার নিয়োগ করা হত।

ইংরেজ শাসন আমল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে কোম্পানীর আমলা, কর্মচারী এবং দেশীয় জমিদারদের হাতে। জমিদারগন মূলত খাজনা আদায় নিরঙ্কুশ করার জন্য স্থানীয়ভাবে পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল নিয়োগ করত।

১৯৭২ সালের ১৫ আগষ্টের রেগুলেশনের মাধ্যমে দুই শ্রেণীর কোর্ট স্থাপন করা হয় : ফৌজদারী এবং দেওয়ানী। কালেক্টরগন তখন দেওয়ানী আদালতে বিচারকার্য সম্পাদন এবং ফৌজদারী আদালতের তত্ত্বাবধান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং প্রথম সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে মোঘল সম্রাটদের প্রবর্তিত ফৌজদারী ব্যবস্থার বাস্তবায়নে একটি নির্দিষ্ট এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ডাকাতদের প্রতিরোধে ফৌজদার নিয়োগ করেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিং প্রবর্তিত ব্যবস্থা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি।

এমনকি এক ক্রান্তিকালে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৮৮৭ খ্রিঃ ভারতবর্ষে আগমন করেন তিনি নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে Regulations for the police of the collectorship in Bengal Behar and Orissa গভর্নর ইন কাউন্সিলে ৭ ডিসেম্বর ১৭৯২ খ্রিঃ অনুমোদন করেন। জমিদারদের স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটগনকে তাদের আওতাভূক্ত এলাকাকে কতিপয় অঞ্চলে ভাগ করে দারোগা নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়। পাইক, চৌকিদার এবং স্থানীয় গ্রাম্য ওয়াচম্যানদের দারোগার অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

পরবর্তীতে ১৭৯৩ খ্রিঃ ১৩ নং আইন দ্বারা পূর্ববর্তী রেগুলেশন সংশোধন করা হয়। নতুন আইন বলে জেলা জজগন ১৭৭৪ সালে ফৌজদারী এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাবলে জেলাসমূহকে ৪০০ বর্গ মাইলের পুলিশ থানায় বিভক্ত করেন। পুলিশ থানার দায়িত্ব একজন দারোগাকে অর্পণ করা হয়। তার অধীন সরকারী বেতনভূক্ত জুনিয়র পুলিশ অফিসাররা কর্মরত ছিল। ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদ শহরকে কতগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন দারোগা এবং শহরের দায়িত্বে কোতয়াল এবং দারোগাগন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ ডাকাত গ্রেফতার, চোরাই ও ডাকাতি মাল উদ্ধারের মত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। এজন্য সরকার তাদের চোরাই মালে ১০% সমমূল্যে অর্থ এবং ডাকাত গ্রেফতারের জন্য ১০ টাকা পুরস্কার

Dhaka University Institutional Repository

দিত। কিন্তু দারোগাদের অধীনে পুলিশী ব্যবস্থা সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থা ১৮০৭ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

১৮০৮ সালে ১০ নং রেগুলেশন বলে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে দারোগাদের কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করার জন্য সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ১৮২৯ সালে এই পদটি বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়। এই পরিবর্তনটি ছিল খারাপ দৃষ্টান্ত। মূলত নিম্ন বেতনভূক্ত দারোগা এবং পুলিশ কর্মচারীগণ থানাদারী ব্যবস্থায় প্রভূত ক্ষমতার যথেচ্ছাচার করেছে এবং প্রশাসনিক ইউনিটির কোন বিকাশ লাভ করেনি।

গভর্ণর জেনারেল মারকুইস অব হেস্টিংস (লর্ড মোরিয়া) পুলিশ সংক্রান্ত সকল আইনকে একত্রিত করে ১৮১৭ খ্রিঃ ২০ নং রেগুলেশনে অন্তর্ভূক্ত করেন। এই রেগুলেশনে দারোগা ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের দায়িত্ব কর্তব্যকে ৩৪ টি সেকশনে বিভক্ত করা হয়।

১৮২৯ খ্রিঃ প্রবর্তিত লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সাফল্যে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ভারতীয় পুলিশ সংগঠনকে আধুনিক পুলিশ সংগঠনের রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৮৩৮ খ্রিঃ মিঃ বার্ডকে চেয়ারম্যান করে এক কমিটি গঠন করা হয়। এদের দায়িত্ব ছিল এতদঞ্চলের জন্য একটি কার্যকরী পুলিশ সংগঠনের পরিকল্পনা প্রনয়ন।

স্যার এফ জে হ্যালিডে হেড কোয়ার্টার্সে একজন সুপারিনটেনডেন্ট জেনারেল, স্থানীয় পর্যায়ে ২৩ জন সুপারিনটেনডেন্ট, ৩২ জন এসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট, ৮৮৮ জন দারোগা ৮৮৮ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৪৪৪০ জন জমাদার এবং ৬৬,৬০০

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ বাহিনীর জন্ম (দেড়শ বছরের পুরনো আইন)

বাহিনী হিসাবে পুলিশের জন্ম ও বেড়ে ওঠার ঐতিহাসিক পটভূমি তাদেরকে জনগণের কাছে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বলে মনে করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ১৮৬১ সালে একটি আইন করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এদেশের জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন করে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হলেও মূলত স্বাধীনতা কামীদের নিপীড়নের মাধ্যমে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রাম দমন করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূল লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে গড়া ওই পুলিশেরই উত্তরাধিকার বাংলাদেশের এখনকার পুলিশ। সেজন্যই ব্রিটিশরা উপমহাদেশ ছেড়ে গেলেও এদেশের পুলিশের ওপর থেকে তাদের আছর এখনো যায়নি।

তবে একথাও ঠিক ব্রিটিশদের বিদায়ের পর পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৪০ বছরেও দেড়শ বছরের পুরনো পুলিশ আইন ও সাংগঠনিক কাঠামো এখনো রয়ে গেছে। যেমন- ১৮৬১ সালের পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬০ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯৩৬ সালের ট্রেনিং ম্যানুয়াল এবং ১৯৪৩ সালের রেগুলেশন অনুযায়ীই চলছে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর সামগ্রিক কার্যক্রম।

বাংলাদেশের পুলিশী কাঠামো

১৯৭১ সালে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী রাজারবাগ সহ সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দীর্ঘ নয় মাস সকলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিনিয়ে আনে কাঙ্খিত স্বাধীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে থানার সংখ্যা ২৮টি। অথচ প্রায় একই সমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতের রাজধানী দিল্লীতে থানার সংখ্যা ১ শরও বেশী। দেশের বিভিন্ন জেলা সদরের মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্য থাকলেও কোথাও একটির বেশী থানা নেই। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, উপজেলা পর্যায়ে ৮ হাজার ৮শ ৩৯ জনের জন্য একজন, জেলা সদরে ১০ হাজার ৪শ ৫৭ জনের জন্য একজন এবং মেট্রোপিলটন থানাগুলোতে প্রতি ১৬ হাজার ১শ ৭ জনের জন্য একজন পুলিশ রয়েছে।

জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশের প্রতিটি থানায় গড়ে একজন মাত্র পরিদর্শক ২ জন সাব ইন্সপেক্টর এবং ২ জন এসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োজিত আছে। মহানগর এলাকার থানাগুলোতে অবশ্য এ সংখ্যা দু' থেকে তিনগুণ বেশী।

পুলিশ বিভাগের নিয়মানুযায়ী পরিদর্শক ও সাব-ইন্সপেক্টরাই থানায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার তদন্ত করে থাকেন। থানাগুলোতে এসব পদে কর্মকর্তার অপ্রতুলতা মামলার তদন্তে ধীরগতির অন্যতম প্রধান কারণ, পুলিশ বাহিনীর বৃহৎ অংশ কনস্টেবলদের নিরাপত্তা ডিউটি ও কমকর্তাদের সফর-সঙ্গী হওয়ার দায়িত্বই বেশী পালন করতে হয়। ফলে তারা জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। ওয়ারেন্ট আদেশ তামিল অস্ত্র, উদ্ধার এবং আইন শৃঙ্খল রক্ষার দায়িত্ব সাব-ইন্সপেক্টররা পালন করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১

বাংলাদেশ পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা ও জনবল

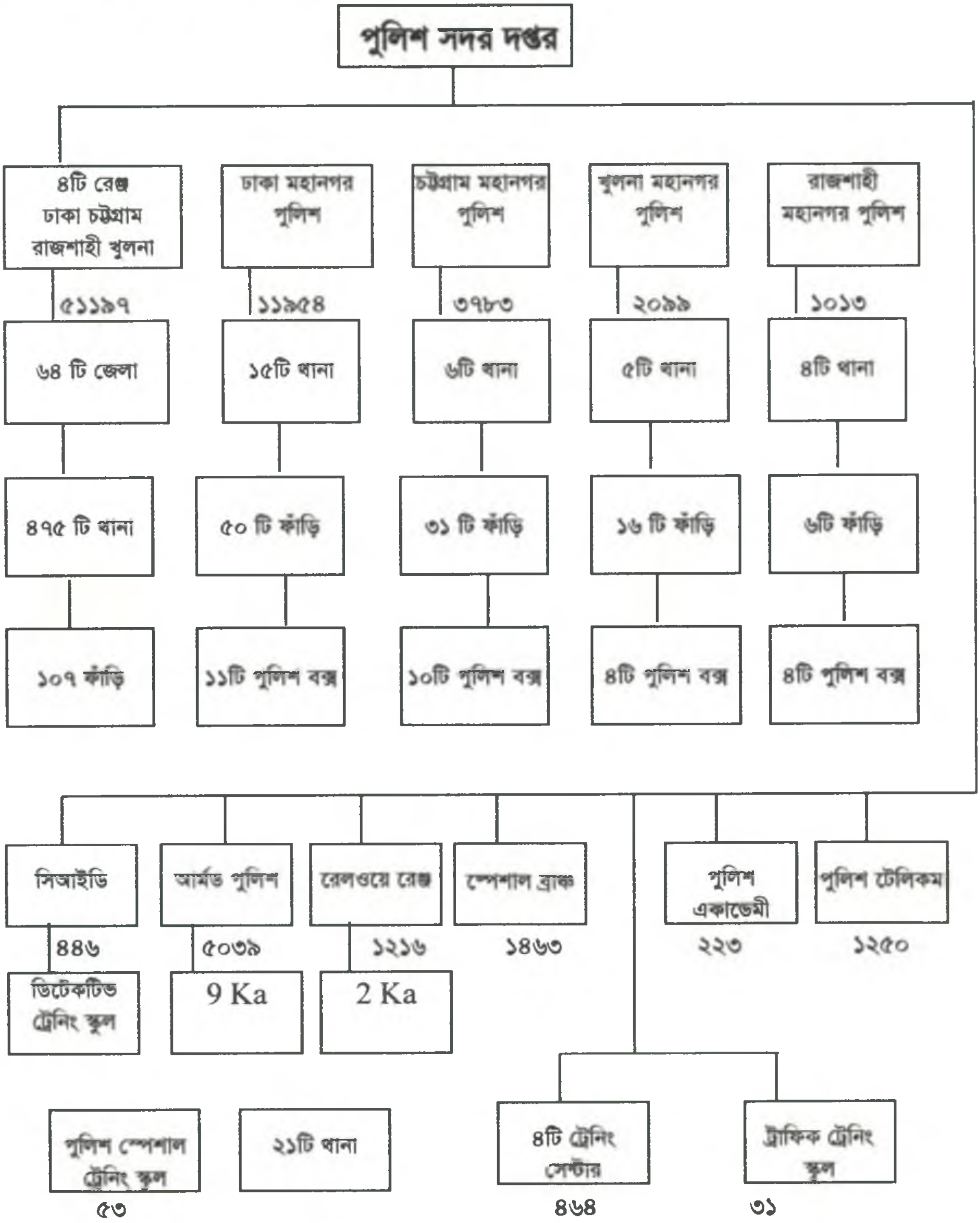

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স

বাংলাদেশ, ঢাকা।

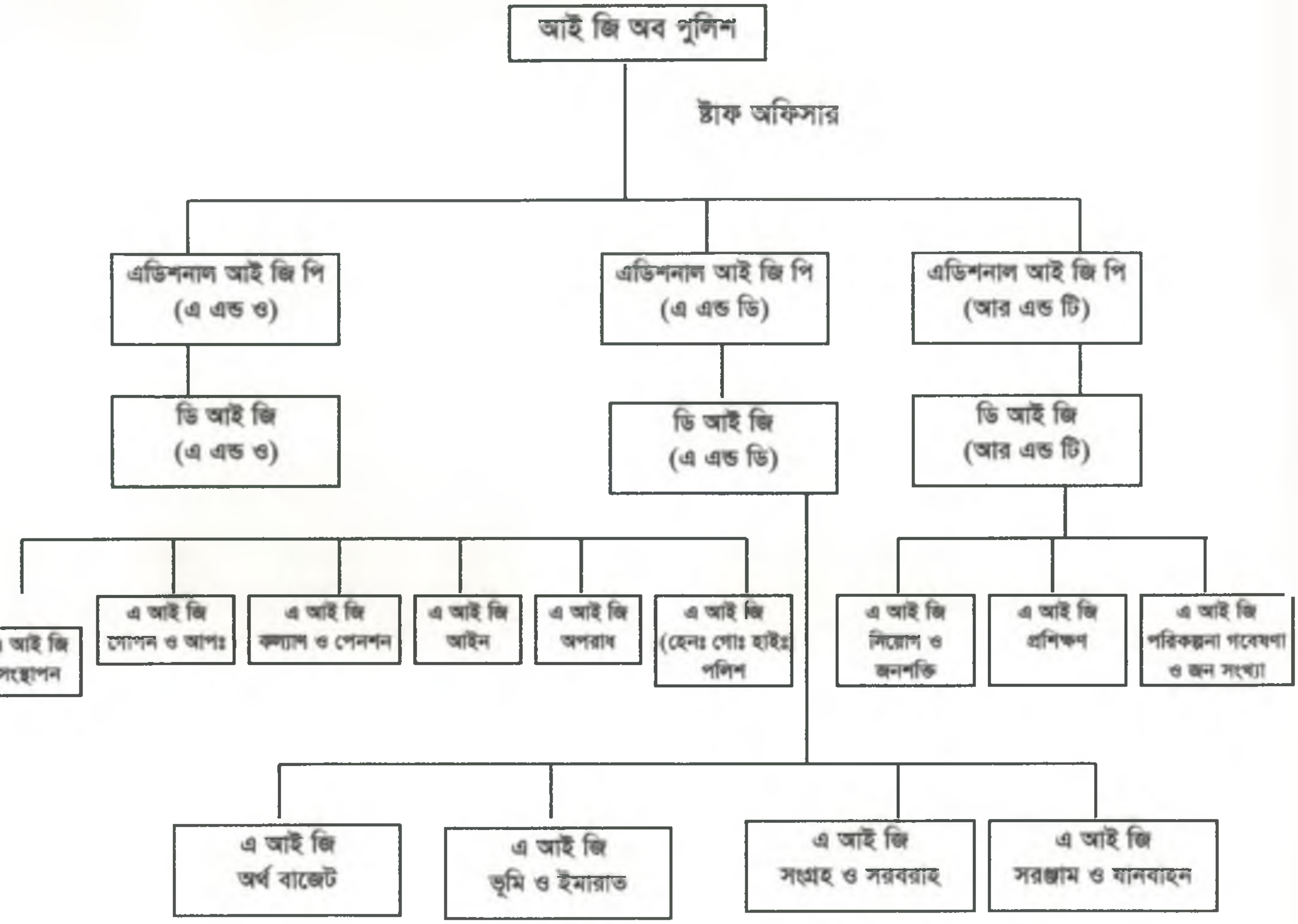

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান

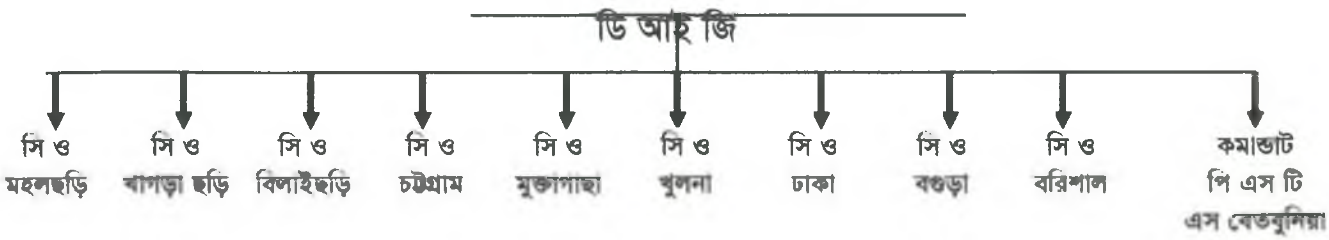

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩

পুলিশ একাডেমী, সারদা

প্রিন্সিপাল

(ডি আই জি)

ভাইস প্রিন্সিপাল (চীপ ল ইন্সট্রাক্টর)			পুলিশ সুপার (প্রশাসন)	
জেডপিটিএস নোয়াখালী	জেডপিটিএস টাংগাইল	জেডপিটিএস রংপুর	জেডপিটিএস খুলনা	পিএসটিএস বেতবুনিয়া

স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসার্চ সেল	সিনিয়র অফিসার্স ট্রেনিং	জুনিয়র অফিসার্স ট্রেনিং	রিক্রুট ট্রেনিং	ইন্ডানিট ইনপেক্টর ট্রেনিং	ফিজিক্যাল ট্রেনিং	লজিসটিক	হসপিটাল	এ্যাকাউন্টস	এ্যাডমিনি-স্ট্রেশন কমন সার্ভিস	এ্যাটাচড বোম্বে কোম্পানী

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪

সাংগঠনিক কাঠামো

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

এডিশনাল আই জি (সি আই ডি)		এডিশনাল আই জি (এস বি)	এডিশনাল আই জি (আর এন্ড টি)	এডিশনাল আই জি (এ এন্ড ও)		এডিশনাল আই জি (এফ এন্ড ডি)
ডি আই জিসি আই ডি	ডি আই জি এস বি	ডি আই জি হেড কোয়ার্টার্স আর এন্ড টি	ডি আই জি হেড কোয়ার্টার্স এ এন্ড ও	ডি আই জি এ পি বি এন	ডি আই জি এ পি বি এন	এডিশনাল ডি আই জি ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী বরিশাল রেঞ্জ টাঙ্গাইল নোয়াখালী খুলনা জেজ পিটিএস

ডি আই জি ঢাকা রেঞ্জ	ডি আই জি চট্টগ্রাম রেঞ্জ	ডি আই জি সিলেট রেঞ্জ	ডি আই জি রাজশাহী রেঞ্জ	ডি আই জি খুলনা রেঞ্জ	ডি আই জি বরিশাল রেঞ্জ	ডি আই জি রেলওয়ে রেঞ্জ	পুলিশ কমিশনার ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী
১। এস পি ঢাকা ২। ,, নারায়ণগঞ্জ ৩।,, নরসিংদী ৪। ,, মানিকগঞ্জ ৫। ,, মুন্সীগঞ্জ ৬। ,, গাজীপুর ৭। ,, ময়মনসিংহ ৮। ,, টাঙ্গাইল ৯। ,, জামালপুর ১০।,, শেরপুর ১১।,,নেত্রকোনা ১২। ,, কিশোরগঞ্জ ১৩। ,, ফরিদপুর ১৪। ,, রাজবাড়ি ১৫। ,, রাজবাড়ি ১৬।,, গোপালগঞ্জ ১৭। ,, শরিয়তপুর	১। এস পি চট্টগ্রাম ২। ,, কক্সবাজার ৩। ,, রাঙ্গামাটি ৪। ,, বান্দরবান ৫। ,, খাগড়াছড়ি ৬। ,, নোয়াখালী ৭। ,, ফেনী ৮। ,, লক্ষীপুর ৯। ,, কুমিল্লা ১০। ,, চাঁদপুর ১১। ,, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১। এস পি সিলেট ২। ,, সুনামগঞ্জ ৩। ,, হবিগঞ্জ ৪। ,, মৌলভিবাজার	১। এস পি রাজশাহী ২। ,, নওয়াবগঞ্জ ৩। ,, নাটোর ৪। ,, নওগাঁ ৫। ,, পাবনা ৬। ,, সিরাজগঞ্জ ৭। ,, বগুড়া ৮। ,, জয়পুরহাট ৯। ,, রংপুর ১০। গাইবান্ধা ১১। ,, নীলফামারি ১২। ,, কুড়িগ্রাম ১৩। ,, লালমনিরহাট ১৪। ,, দিনাজপুর ১৫। ,, ঠাকুরগাঁও ১৬। ,, পঞ্চগড়	১। এস পি খুলনা ২। ,, বাগেরহাট ৩। ,, সাতক্ষীরা ৪। ,, যশোর ৫। ,, মাগুরা ৬। ,, ঝিনাইদহ ৭। ,, নড়াইল ৮। ,, কুষ্টিয়া ৯। ,, মেহেরপুর ১০। ,, চুয়াডাঙ্গা	১। এস পি বরিশাল ২। ,, পিরোজপুর ৩। ,, ঝালকাঠি ৪। ,, ভোলা ৫। ,, পটুয়াখালী ৬। ,, বরগুনা	এ আর পি চট্টগ্রাম সৈয়দপুর	

কমান্ডেন্ট (এস পি) কমান্ডেন্ট (এস পি) কমান্ডেন্ট (এস পি) কমান্ডেন্ট (এস পি) কমান্ডেন্ট (এস পি)

আর আর এ ঢাকা আর আর এফ চট্টগ্রাম আর আর এফ রাজশাহী আর আর এফ খুলনা আর আর এফ বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫

জাতীয় বেতন স্কেল- ২০০৯

(বাংলাদেশ পুলিশ)

বাংলাদেশ পুলিশ			
ক্রমিক নং	পদবী	বেতন স্কেল	মন্তব্য
১।	মহাপুলিশ পরিদর্শক	৪০,০০০/- নির্ধারিত	
২।	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	৩৩,৫০০/- হতে ৩৯,৫০০/-	
৩।	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	২৯,০০০/- হতে ৩৫,৬০০/-	
৪।	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	২৫,৭৫০/- হতে ৩৩,৭৫০/-	
৫।	পুলিশ সুপার	২২,২৫০/- হতে ৩১,২৫০/-	
৬।	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	১৮,৫০০/- হতে ২৯,৭০০/-	
৭।	সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার	১৫,০০০/- হতে ২৬,২০০/-	
৮।	সহকারী পুলিশ সুপার	১১,০০০/- হতে ২০,৩৭০/-	
৯।	ইন্সপেক্টর	৮,০০০/- হতে ১৬,৫৪০/-	
১০।	সাব-ইন্সপেক্টর/সার্জেন্ট/সুবেদার	৬,৪০০/- হতে ১৪,২৫৫/-	
১১।	এ, এস, আই/ হাবিলদার	৫,২০০/- হতে ১১,২৩৫/-	
১২।	নায়েক	৪,৯০০/- হতে ১০,৪৫০/-	
১৩।	কনস্টেবল	৪,৫০০/- হতে ৯,০৯৫/-	

সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার,অর্থ মন্ত্রণালয়,অর্থবিভাগ(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ ও আদালত

বিচার কার্যক্রমে পুলিশের ভূমিকা বিস্তৃত। বিশেষ করে ফৌজদারী মামলার বিচার কার্যে পুলিশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের মাধ্যমেই বেশির ভাগ ফৌজদারী মামলার আইনী ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুলিশের এজাহার, তদন্ত প্রতিবেদন, চার্জশীট ইত্যাদির উপর বহুলাংশে ন্যায়-বিচার নির্ভরশীল। ফৌজদারী ও দায়রা আদালতসমূহে পুলিশ প্রসিকিউশনের দায়িত্ব পালন করে। অথচ বাংলাদেশের জনগণের কাঙ্খিত ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় ও সুষ্ঠু আইন প্রয়োগে পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে, আদালতে মামলা উপস্থাপন করেন যাদের কোন প্রকার দক্ষতা নাই, আইন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। পুলিশ কর্তৃক দাখিলকৃত কোন কোন মামলার এজাহার বা তদন্ত প্রতিবেদনে সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না। ফলে ভ্রম উপস্থাপনা, ভ্রান্ত ব্যাখার কারণে আইনের যথাযথ প্রয়োগহীনতার কারণে প্রকৃতদোষী ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে যান। ফৌজদারী মামলাগুলিতে পুলিশের সাক্ষ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আইন অজ্ঞতা, বিশেষ ট্রেনিং-এর অভাবে এবং সহজেই প্রভাবিত হওয়ার কারণে পুলিশ সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়। পুলিশের অনৈতিক কার্যক্রমের দরুন গ্রাম বাংলায় পর্যন্ত পুলিশকে নিয়ে "মাছের রাজা ইলিশ চাকুরির রাজা পুলিশ" শীর্ষক রম্য প্রবাদ বাক্য রচিত হয়েছে।

নির্বাহী বিভাগকে পুলিশের সহায়তায় আদালতের মাধ্যমে রাজনৈতিক আসামীদের শায়েস্তা করতে দেখা গেছে। বিরোধী দলীয় নেতা ও কর্মীদের নিগৃহীত করার লক্ষ্যে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ফৌজদারী কার্যাবিধির ৫৪ ধারার সুযোগের আওতায় গ্রেফতার করে থাকে। গ্রেফতার করার পর জোরপূর্বক ফৌজদারী কার্যাবিধি

Dhaka University Institutional Repository

১৬১ ধারার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে রাজনৈতিক কর্মীদের অধস্তন আদালতে প্রেরণ করে ধৃত রাজনৈতিক কর্মীর জামিন না মঞ্জুরের জন্য ও রিমান্ডের জন্য আবেদন জানায়। সরকার বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে অধস্তন আদালতকে প্রভাবিত করে। অতঃপর পুলিশের মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার সুবাধে রাজনৈতিক কর্মীদের ভয়ানক প্রকৃতির নির্যাতন চালাতে থাকে। এছাড়াও পুলিশ অনেক দূর্নীতির আশ্রয় নেয়। তাদেরকে প্রতিনিয়তঃ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেখা যায়, এমনকি কখনো কখনো হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়। অথচ এই ধরনের পুলিশকে দিয়ে এজাহার দায়ের থেকে শুরু করে তদন্ত ও চার্জশীট দাখিল করানোর কারণে প্রাক্তন এক আইন মন্ত্রী অভিমত দেন যে পুলিশকে এত ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে দূর্নীতিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাদেরকে শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বেই রাখা উচিত"।

আইন শৃঙ্খলার দায়-দায়িত্বের পাশাপাশি বিচারিক কার্যক্রমে তদন্ত করার দায়িত্ব পালনে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অনেকে এই বাহিনীর ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাদের মতে, যে সকল পুলিশ কর্মকর্তাদের বিচার সংক্রান্ত কার্যে আদালতে আসতে হয় তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আইন বিষয়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০০৫ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত 'গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতা' প্রদান কালে তৎকালীন আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল অভিমত দেন ঃ

পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেনা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে ও বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পুলিশ বিভাগে 'তদন্ত বিভাগ' নামে আলাদা একটি বিভাগ থাকা দরকার সে বিভাগ শুধু তদন্তের কাজই করবে .... পুলিশ বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে।

তার এই অভিমতের সঙ্গে একমত পোষন করে অনেকে মনে করেন যে, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরও সংস্কার আবশ্যকীয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ পুলিশের কর্মকান্ড থেকে তদন্ত ও প্রসিকিউশনকে পৃথক করতে হবে এবং এই দুই বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তানে কোর্ট ইন্সপেক্টরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের একটি অংশ জেলা জজ লিখে থাকেন। অপরদিকে তদন্ত প্রতিবেদনে যাতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে সেজন্য তদন্ত সেলকে আলাদা করে তদন্ত কার্যক্রমে বিচার বিভাগের যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। প্রসিকিউশনের জন্য পাকিস্তানে পুলিশ বিভাগেই আলাদাভাবে আইনে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয় এজন্য তাদের একটি প্রসিকিউশন সাব-ক্যাডার রয়েছে। বাংলাদেশেও পুলিশের মধ্যে এ জাতীয় সাব-ক্যাডার গঠন অত্যাবশ্যক। কার্যকর স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের আইন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনগত সংস্কার অত্যাবশ্যক।

মিথ্যা গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাবার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিতে গিয়ে ৯৬ ভাগ জন মানুষ দূর্নীতির শিকার হন। ৯১ শতাংশ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে, ৮৭ ভাগ অভিযোগ দাখিল করতে এবং ৭৫ শতাংশ লোক অন্যান্য পুলিশী কাজে দূর্নীতির শিকার হন। ২৪ শতাংশ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা, ১৯

Dhaka University Institutional Repository

রিকশা চালককে গুলি করে হত্যা করার দায়ে আগারগাঁও এক পুলিশ সার্জেন্টকে ১৯৯৯ জুলাইতে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ১৭ এপ্রিল, ২০০২ ইং তারিখে দিবাগত রাতে কাপাসিয়ার তারগাঁও ইউনিয়নের ফকির বাড়ির জামালকে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে গিয়ে জেরার নামে নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে হত্যা করার পর লাশ নদীতে ফেলে দেয়। (বিস্তারিত দেখুন, যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ১৯৯৯-এর বাংলাদেশ অংশের অনুচ্ছেদ ১-ক, পৃষ্ঠা-১৩)।

২১শে জুলাই, ২০০৫ইং তারিখে পুরান ঢাকার তাঁতি বাজারে একটি অলংকারের দোকানের কর্মচারীকে আটক করে মামলায় জড়ানোর ভয়ভীতি দেখিয়ে দেড় লাখ টাকা মূল্যের ১ হাজার ১০০ ভরি রূপার অলংকার ও নগদ ২৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে পুলিশের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারা এবং রিমান্ড প্রয়োগের ১৬৭ ধারার ভয়াবহ অপব্যবহারের কারণে ৭ই এপ্রিল, ২০০৩ইং তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী নির্দেশনা দেয়। বিচারপতি হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসউদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সন্দেহজনক কাউকে গ্রেফতার ও পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর এই ৫৪ এবং ১৬৭ ধারা ৬ মাসের মধ্যে সংশোধনীর জন্য সরকারকে একটি যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী নির্দেশনা দেন। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সরকারের পাশাপাশি পুলিশকেও এ নির্দেশনা অনুসরণ করার আদেশ দেন।

তৎকালীন এটর্নী জেনারেল এ.এফ, হাসান আরিফ, সুপ্রীম কোর্ট বারের সভাপতি ব্যারিষ্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ, বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম উক্ত রায়ের প্রশংসা করেন। কিন্তু অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিতাপের বিষয় যে, সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপীল বিভাগ রায়টি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৩ সালে সরকারকে ৬ মাস সময় দিলেও পরে তা বাস্তবায়নের আর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ২০০৪ সালে ফৌজদারি- কার্যবিধির ৫৪ ধারা এবং ডি.এম.পি অধ্যাদেশ ৮৬ ধারায় ৭ হাজার সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ ইং তারিখে তৎকালীন বিরোধী দলের আহবানকৃত লংমার্চ কর্মসূচীকে বানচাল করার লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ইং তারিখে ১২ শত ব্যক্তিকে গণগ্রেফতার করেন। প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ৫৪ ধারার প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে "বাস্তবে ৫৪ ধারার নামে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনকে বৈধতা বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে"। নির্যাতনের ধরণ হচ্ছে এই ধারায় গ্রেপ্তার, তারপর চুয়াত্তরের বিশেষ ক্ষমতা কালো আইনে ডিটেনশন বা রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা। এরপর রিমান্ডের আবেদন, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, বা চাপের মুখে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন নেওয়া এবং সর্বশেষে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন"।

আরো বিস্তারিত দেখুন, Abuse of Section 54 of the code of Criminal Procedure, Dhaka, Odhikar, 2001 and Reasonable Suspicion Versus Un-Reasonable Impugnity, The Abuse of Section 54 of the Code of Criminal Procedure and Section 86 of the Dhaka Metropolitan Police Ordiance 1976, Dhaka, Odhikar, 2002.

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে বাংলাদেশের নারী তথা মেয়ে-শিশুর অবস্থা

মেয়ে শিশু ও নারী বাংলাদেশের জনসংখ্যায় অর্ধেক হলেও সংখ্যালঘুদের মতই, তারা বৈষম্যের শিকার। জন্মের মূহূর্ত থেকে এমনকি ভ্রনাবস্থায় যদি জানতে পারা যায় যে, গর্ভস্থ শিশুটি কণ্যা সন্তান, তবে সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয় বৈষম্য।

ক. ১-৪ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে মেয়ে শিশুর মৃত্যু হার ছেলে-শিশু মৃত্যু-হারের চাইতে ২৭% বেশি। এ বয়সের এক হাজার মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩১ জনের মৃত্যু হয় এবং এক হাজার ছেলে-শিশুর মধ্যে মৃত্যু হয় ১৮ জনের।

খ. শিশু-মৃত্যুর হার ছেলে-শিশুদের চাইতে মেয়ে শিশুদের বেশি। ১-৪ বছর বয়সের শিশুদের ভেতর প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে মৃত্যু হার ছেলেদের বেলায় ১১.৯% এবং মেয়েদের বেলায় ১৫.১%।

গ. মেয়ে-শিশুরা সাধারণভাবে ছেলে-শিশুদের চাইতে ২০% কম ক্যালরি পায়। ১-৪ বছরের মেয়ে-শিশুরা একই বয়সের ছেলে-শিশুদের চাইতে ১২% কম প্রোটিন গ্রহণ করে।

ঘ. ৫৭.৮% মেয়ে-শিশুর উচ্চতা তাদের বয়সের তুলনায় কম- ছেলে-শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৪.৮%।

ঙ. উচ্চতার তুলনায় ৯.৫% মেয়ে শিশুর ও ৬.৮% ছেলে শিশুর ওজন কম। এ প্রবণতা গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী (৯.৮%)।

চ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে-শিশুর ভর্তির সংখ্যা ৬৪ শতাংশ, ছেলে শিশুরা ভর্তি হয় ৭৬%।

ছ. ১০-১৪ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে ২৩% ছেলে ও ১০% মেয়ে মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়ন করে।

Dhaka University Institutional Repository

জ. বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সের মেয়ে শিক্ষার্থীর হার শতকরা ২ ভাগ।

ঝ. মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৯৩১ সালের ১২.৬ থেকে বেড়ে ১৯৮৯ সালে ১৮.৪-এ দাঁড়িয়েছে।

ঞ. ৬৬% মেয়ের প্রথম সন্তান হয় ১৮ বছর বয়সের আগে ; ৮০% মেয়ের বিশ বছরের আগে।

ট. অল্প বয়স্ক মা-দের ৪০% এর মৃত্যু ঘটে গর্ভধারণজনিত জটিলতার ফলে।

ঠ. ২০-২৯ বছর বয়স্ক মায়েদের সন্তানের তুলনায় ১৮ বছরের কম বয়স্ক মায়েদের সন্তানের পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে মৃত্যুর আশঙ্কা ৩৭% বেশি।

(উৎস : ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে UNICEF কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ The Gril Child in Bangladesh ; A Situation Analysis.)

নারী ও পুরুষের মধ্যে পুষ্টি গ্রহণের তারতম্য

বিষয়	পুরুষ	নারী
দৈনিক ক্যালরি গ্রহণ (১৯৮১)	১,৯২৭	১,৫৯৯
দৈনিক প্রোটিন গ্রহণ (১৯৮১)	৪১.৪ গ্রাম	৩২.৭ গ্রাম
শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি (১৯৮৫)	৫০%	১৪.০%

(উৎস : খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫ পৃ. ১১১।)

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারে নারী ও পুরুষের খাদ্য গ্রহণে ব্যবধান (% হারে), ১৯৯৪

পরিবারে খাদ্য সংস্থান	পুরুষ	নারী	মোট
খাদ্য ঘাটতি	১৯.৬	২২.০	২১.০
মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি	৪৯.৭	৪৯.৩	৪৯.৫
খাদ্য আছে	২০.১	১৮.৯	১৯.৫
খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০.৬	৯.৮	১০.২

(উৎস ঃ খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নারী ও উন্নয়ন ; প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫ পৃ. ১১১।)

আইন ও পুলিশ

যে ভূলের জন্য অন্যকে দায়ী করা হয়, সেই ভুল করা পুলিশের শোভা পায় না। ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা, এলাকা বিশেষ হর্ণ বাজানো নিষেধ সত্ত্বেও পরোয়া না করা, এমন ছোট-খাট বিষয় থেকে বড় বড় নিয়ম-কানুন পালন সম্পর্কে পুলিশ নিজেদেরকে ব্যতিক্রম ভাবতে পারে না। ব্যতিক্রম ভাবলেই পুলিশের উপদেশ-নির্দেশ কার্যকর করা যাবে না। একথা বিশ্বাস করতেই হবে যে, দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমেই জনগনকে প্রচলিত আইনের বিধানসমূহের প্রতি মনোযোগী করা সহজ ও সম্ভব আর তা অর্জনের জন্য প্রধান শর্তই হলো আত্মশুদ্ধি। এই আত্মশুদ্ধি যদিও পুলিশের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যপার, কিন্তু এই আত্মশুদ্ধি ও নিজে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে পুলিশকে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে, যা কারো

Dhaka University Institutional Repository

কাম্য নয়। পুলিশের এই নতুন দিকদর্শন আত্মস্থ করতে পারাই হচ্ছে একজন পুলিশের কর্তব্য চেতনার আধুনিকতার সংমিশ্রন।

প্রশিক্ষণ

পরিবর্তনের জন্য ট্রেনিং বা প্রশিক্ষন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরন্তর প্রশিক্ষন কেবল যে নব নব পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলে তাই নয়, প্রশিক্ষন পেশাগত দক্ষতাও বৃদ্ধি করে থাকে, শাণিত করে মেধাকে, আর উদ্দীপ্ত করে কর্মস্পৃহাকে। এক কথায় বয়স ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী প্রশিক্ষন দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

পুলিশ কনস্টেবলদের প্রশিক্ষন কর্মসূচী

পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কনস্টেবল সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু কনিষ্ঠ হলে কি হবে ? এদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বিধানে তাদের অবদানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সমাজ বিরোধী কার্যাকলাপ বন্ধ করতে, দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে কনস্টেবলদের ভূমিকা সর্বাগ্রে। অতি প্রাচীনকাল হতে আধুনিককাল পর্যন্ত দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে সুঠামদেহী, অস্ত্র চালনায় পারদর্শী, বয়সে তরুন দেখে পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হত। প্রাচীনকাল ও মধ্যযুগে এই পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জন্য রাজকীয়ভাবে প্রশিক্ষনের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। যে সকল তরুন ব্যক্তিগত উদ্যোগে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা ও তীর চালনায় সিদ্ধহস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন তারাই সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর যোগ্য বলে বিবেচিত হত। তবে তৎকালে প্রশিক্ষন একাডেমী মোগল আমলে ও ফৌজদারের অধীনে সামরিক ও বেসামরিক বাহিনী বাধ্যতামূলকভাবে গভীর জঙ্গলে শিকারে অংশগ্রহণ করত। এতে করে পাইক, বরকন্দাজদের শারীরিক কসরত ও অস্ত্র চালনার অভ্যাস ও আত্মরক্ষার কলা-কৌশলের বিকাশ ঘটত। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে ও প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করেই পুলিশ বরকন্দাজ বা কনস্টেবল নিয়োগ হত।১৯০২ খৃষ্টাব্দে পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে দৈহিক যোগ্যতার মান নির্ধারন করা হয় এবং নিয়োগের পর ট্রেনিং সেন্টার বা ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হতে রাজশাহীর সারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীতেই কনস্টেবলদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়; যদি ও এর কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিটি রেঞ্জে কনস্টেবলদের জন্য ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। কনস্টেবল পদে নির্বাচিত প্রার্থীদের ট্রেনিংয়ের সময়সীমা ছিল এক বৎসর।ড্রিল, শরীরচর্চা ও ছোট খাট আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষন দেয়া হত। মানসিক সুস্থতার জন্য প্রশিক্ষণকালে তাদের খেলাধূলার ব্যবস্থাও করা হয়। পুলিশ আইন কার্যবিধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও তাদের প্রশিক্ষন দেওয়া হত। কনস্টেবলগণ প্রশিক্ষন সমাপ্তির পর নিজ নিজ জেলা সদরে যোগদান করত। সেখানে পুলিশ বাহিনী ছিল দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি সশস্ত্র পুলিশ,এটি পুলিশ সুপার কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত ছিল। অপর শাখাটি ছিল নিরস্ত্র পুলিশ, এরা ছিল বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি, কোর্ট ও পুলিশ অফিসে নিয়োজিত ; আর সাব ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পুলিশ প্রশাসনের এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ঐ সময়ে কনস্টেবলদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মেট্রিক পাস বা সমমানের শিক্ষিত যারা ইংরেজি জানত, তাদের ছয় মাস প্রশিক্ষণকাল উত্তীর্ন হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

পর আলদাভাবে আইন, কার্যবিধি, অফিসিয়াল ওয়ার্ক, যেমন-পুলিশ ডায়েরী নিবন্ধন, সি.সি.লেখা ইনভেন্ট তৈরী করার পদ্ধতির উপর সাধারণ প্রশিক্ষন দেওয়া হত। এ সমস্ত কনস্টেবলকে বলা হত ই.কে.সি অর্থাৎ ইংলিশ নোয়িং কনস্টেবল। ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন এই সমস্ত কনস্টেবলগণ নিজ নিজ জেলায় যোগদানের পর তাদেরকে রিজার্ভ অফিস, থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ কোর্ট বা পুলিশের অন্যান্য শাখায় অফিসের কাজে নিয়োগ করা হত। তাদেরকে বলা হয় মুন্সি।এর ফলে এ সকল মুন্সিগণ দক্ষতার ভিত্তিতে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি গ্রহণ করেন অতি সহজেই। পরবর্তীকালে এরা অনেকে উত্তরোত্তর পদোন্নতি গ্রহণ করে চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সর্বত্রই এই মুন্সিয়ানার অলিখিত প্রথা প্রবর্তিত রয়েছে এখনও। পাকিস্তান আমলে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ কনষ্টেবল ভর্তি হচ্ছে মেট্রিকুলেট। যদিও কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নির্ধারিত হয় অষ্টম শ্রেণী পাস। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে কনস্টেবল নিয়োগের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি করে মেট্রিকুলেট করা হয়। বর্তমানে কনস্টেবলদের মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতার চেয়ে অধিক উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী হচ্ছে।এ কারণ অবশ্য ভিন্ন।

অপরাধ এবং পুলিশী গ্রেফতার

Cattle tres Pas Act 1871 এর ২০ ধারানুযায়ী যে ধরনের কার্যক্রমের জন্য অভিযোগ করা যায় তাই offence বা অপরাধ। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮ অনুযায়ী সকল ধরনের offence/ অপরাধই 'ক্রিমিনাল 'ল এর আওতাভুক্ত। অপরাধী গ্রেফতার সহ সকল ধরনের তদন্ত কার্যক্রম এমনকি মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পুলিশী হেফাজত ও পুলিশ কর্তৃক মহিলা অপরাধীদের search করা, অপরাধ প্রতিরোধ সহ সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় পুলিশকে অবশ্যই victim বা অপরাধীর নিকট গ্রহণযোগ্য বা আস্থাভাজন হতে হবে।

(CRPC Must be strictly contructed in favour of the accused (P-132).

CRPC অনুযায়ী অপরাধ দুধরনের

(১) আমলযোগ্য অপরাধ (Cognizable offence)

পুলিশ এক্ষেত্রে warrant ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে।

(২) আমলযোগ্য নয় এমন অপরাধ (Non-cognizable offence)

পুলিশ এক্ষেত্রে কোন warrant ছাড়া গ্রেফতার করতে পারে না।

১৮৯৮ সালে প্রণীত ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার অধীনে নয়টি কারণে পুলিশ কাউকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারে। যথা-

(ক) কোনো আমলযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত বলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বা অভিযোগ করা হয়েছে বা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে।

(খ) আইনানুগ অজুহাত ব্যতীত যার কাছে ঘর ভাঙ্গার সরঞ্জাম রয়েছে।

(গ) যার কাছে চোরাই মাল রয়েছে বা যে চুরি সংঘটন করেছে।

(ঘ) ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী বা সরকারি আদেশে যে অপরাধী বলে গণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) পুলিশ অফিসারকে তার কাজে বাধা দানকারী ব্যক্তি বা যে আইনসঙ্গত হেফাজত থেকে পলায়ন করেছে বা সে চেষ্টা করেছে।

(চ) প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে পলায়ন করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

(ছ) বাংলাদেশে করা হলে অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য হতো। বাংলাদেশের বাহিরে কৃত এমন অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তি।

এক্ষেত্রে গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটককৃত ব্যক্তিকে আদালতে প্রেরণ, তাকে গ্রেফতারের কারণ অবহিত করা, গ্রেফতারের বিষয়টি নিকটাত্মীয়দের জানানো এবং তাকে একজন আইনজীবির পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত সংবিধানের সুরক্ষা মূলক বিধানগুলো মেনে চলা জরুরী অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো গ্রাহ্য করা হয় না। অনেক সময় অন্যায় আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় যা সংবিধানের ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদ, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার ৫ অনুচ্ছেদ, পুলিশ আইনের ৩৩ (খ) ধারা এবং পুলিশ অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার লঙ্ঘন।

৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে ডিবির রিমান্ডে ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রুবেলের নিহত হবার ঘটনা জনগনের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে ১৯৯৮ এর ২৩ আগষ্ট গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তার রিপোর্টে বলেন, দুর্নীতি, অবহেলা এবং দক্ষ লোকবলের অভাবের কারণেই পুলিশ বাহিনী কর্তৃক আইনের যথাযথ প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শিত হয়।

CRPC-46 অনুযায়ী গ্রেফতার বলতে সাধারণত পুলিশ দ্বারা বেঁধে বা touch করে কোন ব্যক্তি বা অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। এক্ষেত্রে যদি ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধা দেয় বা সহযোগীতা না করে তখন পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তবে অবশ্যই এ উদ্দেশ্যে কাউকে হত্যা করা যাবে না।

CRPC-52 অনুযায়ী যদি কোন মহিলাকে search করার প্রয়োজন হয় তবে তা অবশ্যই শিষ্টাচারের সাথে মহিলা বা মহিলা পুলিশ দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, গ্রেফতার হওয়ার সময়ই মহিলারা পুলিশ দ্বারা নিগৃহীত হতে পারে। যেমন-

(i) মহিলাদেরকে মহিলা পুলিশের পরিবর্তে পুরুষ পুলিশ দ্বারা Search করালে।

(ii) Search এর সময় অশালীন আচরণ করলে।

পুলিশ হেফাজত

গ্রেফতারের পরে [২৪ ঘণ্টার মধ্যে] আদালতে প্রেরণ করা পর্যন্ত যে সময় ব্যক্তি বা অপরাধী পুলিশের জিম্মায় বা তত্ত্বাবধানে থাকে তাকে বলা হয় পুলিশ হেফাজত।

হেফাজত সাধারনত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে

জেল হেফাজত

পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আদালতে প্রেরিত হলে বা দোষী কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে আদালতে হাজির হলে আদালত যদি জামিন না মঞ্জুর

Dhaka University Institutional Repository

করে তবে উক্ত ব্যক্তিকে (অভিযুক্ত) জেল হেফাজতে প্রেরণ করা হয়। একবার জেল হেফাজতে প্রেরিত হলে পুলিশের আর কোন দায় থাকে না। কারণ জেল হেফাজত পরিচালিত হয় বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা এবং বাংলাদেশ জেল কোড বা কারাবিধি অনুযায়ী। এটি মূলতঃ অপরাধী বা অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত (অপরাধী নাও হতে পারে) ব্যক্তির হেফাজত।

নিরাপদ হেফাজত বা নিরাপত্তা হেফাজত

নিরাপদ হেফাজত মূলতঃ নারী ও শিশুদের স্বার্থেই গঠিত ও পরিচালিত হয়। নিরাপত্তা হেফাজত সরকারি ও বেসরকারীভাবে পরিচালিত হতে পারে। পুলিশ যখন কোন উদ্ধারকৃত অপহৃত নারী ও মেয়ে শিশু কে আদালতে উত্থাপন করে তখন আদালত তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অথবা আইনানুগ অভিভাবকের কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে Custody বা নিরাপদ হেফাজতে প্রেরণ করে।

উল্লেখ্য যে, কোন মামলার সাক্ষী বা সাক্ষীগণের জীবন (পুরুষ/নারী) হুমকির সম্মুখীন হলে আদালত তাদের জন্যও (Safe Custody) মঞ্জুর করতে পারে।

পাগল হেফাজত (Custody of Lunatic)

CRPC-465 অনুযায়ী যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং মানসিক বিপর্যস্ততার দরুন বিচার কার্য বিঘ্নিত হয় তখন কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে safe custody বা নিরাপত্তা হেফাজতে ডিটেনশন বা আটকাদেশ দেওয়া হয়। [Lunacy Act 1912]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, সকল ধরনেরই হেফাজত মূলতঃ পুলিশের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। (অর্থাৎ হেফাজতকৃত নারীর প্রাথমিক হেফাজতই হচ্ছে পুলিশী হেফাজত।)

পুলিশ হেফাজতে নারীর প্রকার

(১) গ্রেফতারকৃত নারী, অপরাধী নারী বা অভিযুক্ত নারী

(২) CRPC-54 অনুযায়ী অপহৃত নারী ও মেয়ে শিশু যাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে বা উদ্ধার করা হবে।

(৩) ষোল বছরের কম বয়স্ক পাচার হওয়া মেয়ে শিশু-

(৪) ফতোয়ার শিকার হওয়া নারী

(৫) CRPC-561 অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক ধর্ষিত নারী

(৬) ধর্ষিত নারী।

পুলিশ হেফাজত (Custody) এর অর্থ

হেফাজত অর্থ প্রবিধান এবং সাক্ষ্য আইনে ভিন্ন ভিন্নভাবে যা যা দেয়া আছে তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের অর্থ একই। ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে যদিও সাক্ষ্য আইনের সংজ্ঞার ধারায় কিছু দেওয়া হয়নি, তবে এর অর্থ ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশে সর্বোচ্চ আদালতসহ বিভিন্ন নিম্ন আদালতে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ একই রয়ে গেছে।

সাক্ষ্য আইনের ২৬ ও ২৭ ধারায় বলা হয় " Custody" অর্থ কোন ব্যক্তিকে যে দেশে থাকে সেই দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলাফেরা সীমিত

Dhaka University Institutional Repository

করে দেয়া কিন্তু গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা এই কথার সাথে শাসনতন্ত্রে যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে তার কোন বিরোধ নাই।

প্রবিধানে এর অর্থ আরও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রবিধানের ৩১৬(গ) প্রবিধান অনুযায়ী পুলিশ অফিসার নিজে কোন আসামীকে গ্রেপ্তার না করে কয়েকজন প্রতিবেশীকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। এটাও গ্রেপ্তারের সামিল। কারণ পুলিশ অফিসারের নির্দেশে প্রতিবেশীরা কাজটি করেছে। একইভাবে কোন কনস্টেবল তার উচ্চপদস্থ অফিসারের নির্দেশে কোন ব্যক্তিকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসতে থাকলে ঐ ব্যক্তিকে যদি অন্য কারও সাথে কথা বলতে বারণ করা হয়, তা হলে এটাও গ্রেপ্তার বলে গণ্য হবে।

আইনগতভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, পুলিশ হেফাজতের মূল অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা। যার উপর আসামীর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। অপরাধপ্রবণ কোন উপজাতির কোন রেজিষ্ট্রি করা সদস্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করলে অথবা সে বাসস্থান বা স্কুল হতে পালিয়ে গেলে এবং এমন এক এলাকায় তাকে পাওয়া গেলে যেখানে তার যাওয়ার কথা নয়, পুলিশ তাকে অপরাধমূলক উপজাতি আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর আইন) আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেপ্তার ও হেফাজতের মধ্যে পার্থক্য

গ্রেপ্তার ও পুলিশ হেফাজতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রয়েছে। গ্রেপ্তার হল আনুষ্ঠানিকভাবে আসামীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। এটি কার্যকর করতে সংযোগ একান্ত প্রয়োজন। গ্রেপ্তার ছাড়াও কোন ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে থাকতে পারেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৬ ধারায় কিভাবে গ্রেপ্তার করতে হবে তার পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। সেখানে "পুলিশ হেফাজত" কথার কোন উল্লেখ নাই।

উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত

আসামীকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের হেফাজতে রাখলে পুলিশ হেফাজতের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। [উমেদ বনাম রাজ্য এম পি, ১৯৭৯ সি আর এল জে এন ও সি এম পি ১৮]

পুলিশী গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

(সংবিধানের ভাষা অনুযায়ী)

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষা কবচ ৩৩(১) ঃ গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবেনা। যিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শ্রীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্ত্বর সম্ভব সুযোগ দান করিবেন তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ ৩৫(১)

অপরাধের দায়যুক্ত কার্য-সংঘঠনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভংগ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচার পদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফায় কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ অনুযায়ী পুলিশী হেফাজতে নারীর ধর্ষণ এবং শাস্তি

(আইনের ভাষা অনুযায়ী)

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০ [সনের ৮ নং আইন]

[১৪ইং ফেব্রুয়ারী ২০০০/২রা ফাল্গুন ১৪০৬]

নারী ও শিশু নির্যাতন মূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন কল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) 'অপরাধ' অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ;

(খ) "অপহরণ" অর্থ বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন স্থান হইতে কোনো ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা ;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) "আটক" অর্থ কোনো ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো স্থানে আটকাইয়া রাখা ;

(ঘ) "ট্রাইব্যুনাল অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোনো ট্রাইব্যুনাল ;

(ঙ) "ধর্ষণ" অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে Penal Code 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 375 এ সংজ্ঞায়িত "Rape";

(চ) "নবজাতক শিশু" অর্থ অনূর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়সের কোনো শিশু ;

(ছ) "নারী" অর্থ যে কোন বয়সের নারী ;

(ছ) "মুক্তিপণ" অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোনো প্রকারের সুবিধা ;

(ঝ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)

(ঞ) "যৌতুক" অর্থ কোনো বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্কে বিদ্যমান থাকা কালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বা বিবাহের পণ হিসেবে, প্রদত্ত অথবা প্রদানের সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ এবং উক্ত শর্ত বা পণ হিসেবে উক্ত বর বা বরের পিতা, মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কনে বা কনে পক্ষের কোনো ব্যক্তির নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ ;

(চ) " শিশু " অর্থ অনধিক চৌদ্দ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি ;

(ছ) " হাইকোর্ট বিভাগ " অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **আইনের প্রাধান্য ঃ** আপাতত ঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৯। **ধর্ষন ঃ** ধর্ষন জনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদির শাস্তি ;

১। যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোনো পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোনো নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারনামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোনো নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষনের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন ;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ধর্ষনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড

(১) কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন বা তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্তি অর্থদন্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করিলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করিলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবেন।

নারীদের প্রতি পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী

Rinki Bhattacharya তাঁর Behind Closed Doors- Domestic Violence in India (Sage Publications India Pvt. Ltd., New Dehi, 2004) গ্রন্থে Chapter four – এ Police Attitude and Women সম্পর্কে Kalindi Muzumdar লিখেন ঃ

Some policemen view girls or women merely as sex objects. This is demonstrated in the sexual abuse of women while in police custody. Women who approach police stations for hlep have been unfortunate victims of sexual exploitation.

The police treat women's problems as unimportant, or secondary, compared to police operations involving catching thieves, pickpockets, gang wars, protecting politicians, providing police bandobast at political meetings etc.

On the whole, the attitude of the police toward women ranges from intense to mild hostility, indifference, condescension, selective acceptance, cooperation and finally, collaboration. The goal of achieving unconditional acceptance and collaboration is still far from reality.

Dhaka University Institutional Repository

Sub- inspectors are often heard to say, we can work with a hundred men but never with one woman. Women are stereotyped as talkative, jealous, quarrelsome, suspicions, and intolerant. These generalizations about women's nature and behaviour thrive within the police ranks. "A woman is her own worst enemy"- this belief was mentioned by police trainees at several training sessions. The police gave examples of dowry harassment and death were mothers in – law were actively involed. While to an extent this was true, the root cause of atrocities by women was overlooked."

বিভিন্ন পুলিশ আইন ও অধ্যাদেশ

পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তাদের স্ব-স্ব কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে যা দরকার হয় তা হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন জানা। এই রেগুলেশন পুলিশ বাহিনীর দৈনন্দিন কর্মধারা নিয়ন্ত্রনের জন্য অন্যতম বিধান। যেমনঃ

১. পুলিশ আইন, ১৮৬১

২. পুলিশ অফিসার (বিশেষ ব্যবস্থা) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

৩. বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন্স (পি আর বি), ১৯৪৩

এছাড়াও যে সমস্ত আইন পুলিশ সদস্যগণের প্রতিনিয়ত দরকার হয় তন্মধ্যে ঃ

৪. বাংলাদেশ দণ্ডবিধি

৫. ফৌজদারী কার্যবিধি ও

৬. সাক্ষ্য আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ অফিসারের কর্তব্য

ধারা - ২৩ ঃ (The Police Act V of 1861)

নিম্ন লিখিত কার্যগুলি সকল পুলিশ অফিসারের কর্তব্য বলে গণ্য হবে ঃ

১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বৈধ আদেশ দ্রুত পালন বা কার্যকরী করা;

২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বপ্রকার বৈধ পরোয়ানা জারি ও দ্রুত কার্যকরী করা;

৩) সর্ব সাধারণের শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ ও যথাস্থানে তার রিপোর্ট দান করা;

৪) কোন অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে বা হবার আশংকা থাকলে উক্ত অপরাধ প্রতিরোধ বা নিবারণ করা;

৫) সর্বসাধারণের বিরক্তিকর কার্য অর্থ্যাৎ গণ উপদ্রব নিবারণ করা;

৬) অপরাধের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান বা উদঘাটন করা;

৭) অপরাধের বিচারার্থে আদালতে সোপর্দ করা;

৮) আইন সঙ্গতভাবে গ্রেফতার যোগ্য সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা।

উপরোক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য সকল পুলিশ কর্মচারী যে কোন সরাবখানা, জুয়ার আড্ডা বা সন্দিগ্ধ ও উচ্ছৃংখল চরিত্রের লোকদের সমাগমের স্থানে বিনা-পরোয়ানায় প্রবেশ করতে পারবেন ও তথায় কি আছে, না আছে তা পরিদর্শন করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ কর্মচারীর অপরাধ

ধারা-২৯ ঃ (The Police Act V of 1861)

যে কোন পুলিশ কর্মচারী যদি নিম্নলিখিত রূপে যে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়; যথা ঃ

১। কর্তব্যচ্যুতি (Violation of duty); কোন নিয়ম (Rule) বা রেগুলেশন স্বেচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করা ও গাফিলতি পূর্বক তা পালনে শৈথিল্য করা (Willful violation of any rule or regulation);

২। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কোন বৈধ আদেশ ইচ্ছাপূর্ব অমান্য করা বা গাফিলতি পূর্বক তা পালনে শৈথিল্য করা (Willful Violation or neglect of any lawful order made by a competent authority);

৩। এই আইনের ৯ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অথবা অন্তত দুই মাসের নোটিশ না দিয়ে কর্মত্যাগ (Withdrawing from duty without permission or without giving two months notice);

৪। ছুটি গ্রহণ করার পর, ছুটির মেয়াদান্তে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কর্মে যোগদানে ব্যর্থ হয়ে (Failure to report for duty on the expiry of period of leave);

৫। উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে পুলিশের কর্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করা (Engaging without authority in any employment other than police duty);

Dhaka University Institutional Repository

৬। ভীরুতার অপরাধে অপরাধী হওয়া (Being guilty of cowardice);

৭। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কোন আসামীর উপর অন্যায়ভাবে শারীরিক নির্যাতন বা আঘাত করা (Offending unwarrantable personal violence to any person in custody);

তবে তাকে বিচারার্থে ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে সোপর্দ করা চলবে এবং বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে তার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা অথবা তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা, উভয়বিধ দণ্ড হতে পারবে।

বিধি-৩৩ জনসাধারণের সহিত পুলিশের ব্যবহার (১৮৬১ সালের ৫ নং আইন)

(আইনের ভাষা অনুযায়ী)

(ক) জনসাধারণের শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও সহযোগীতা ব্যতীত পুলিশের পক্ষে কোন কাজে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নহে। অতএব, যে কোন পুলিশকে কর্তব্য পালনের সময় সকল শ্রেণীর লোকের সহিত ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ নিম্নপদস্থদের উপর সকল সময় লক্ষ্য রাখিবেন যেন তাহারা এই নির্দেশ যথাযথভাবে মানিয়া চলে এবং দায়িত্ব পালনের সময় তাহারা যাহাতে যতদূর সম্ভব কম বিবাদের সৃষ্টি করে সেই সম্বন্ধে তাহাদের বুঝাইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) রূঢ়তা, বদমেজাজ ও নিষ্ঠুরতা বর্জনীয় এবং কেহ অন্যায় আচরণ করিলে উর্ধ্বতন অফিসার তৎক্ষনাৎই অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) উপরোল্লিখিত নির্দেশসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভ্যাস থাকিলে সেই অফিসারের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাইবে না।

(ঘ) প্রত্যেক অফিসার, বিশেষত ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট বা উচ্চতর মর্যাদার অফিসারগণ হেড কোয়ার্টারে অবস্থানকালে কিংবা সফরের সময় সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে ভদ্র লোকদিগকে সহজে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ দিবেন এবং তাহারা যাহাতে অবাধে মত বিনিময় করেন তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

(ঙ) শিক্ষানবিস সহকারী সুপারিন্টেডেন্টের প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারগণ তাহাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের সহিত ভদ্রতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীতা উপরগুরুত্ব আরোপ করিবেন এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে ভদ্রতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা লিখিবেন এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দিবেন।

বিশ্লেষণ

পুলিশের সাফল্যের ভিত্তি কি ? বিধি ৩৩ -এ বলা হইয়াছে যে, পুলিশ বাহিনীর সাফল্য প্রধানত জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল ; যদি তাহদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। অতএব, পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনে দৃঢ়সংকল্প হইবেন এবং সেই সঙ্গে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করিবেন। উক্ত প্রবিধানে আর ও বলা হইয়াছে, উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারগণ নিজেরা

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বিষয় মানিয়া চলিবেনই, সেই সঙ্গে স্ব-স্ব অধীনস্থরাও যাহাতে উহা মানিয় চলেন এবং দায়িত্ব পালনকলে যাহাতে ন্যূনতম সংঘাতের কারণ সৃষ্টি না করেন, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিবেন। দায়িত্ব পালনের সময় কঠোর ও বর্বর আচরণ পরিহার করিতে হইবে এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য তাহাদের পাকড়াও করিবার জন্য ত্বরিৎ পদক্ষেপ লইতে হইবে।

থানা কর্মচারীদের সাধারণ দায়িত্ব

বিধি-২০১ থানার অফিসার-ইনচার্জ (১৮৬১ সালের ৫নং আইনের ১২ ধারা)

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধীর ৪(ত) ধারায় থানার অফিসার-ইনচার্জ শব্দে সুস্পষ্টভাবে কনস্টেবলদের বাদ দেওয়া হইয়াছে। অফিসার-ইন-চার্জ শব্দার্থের আওতায় পড়ে না।

(খ) থানার অফিসার-ইন-চার্জ যদি অসুস্থতার কারণে থানায় হাজির হইতে না পারেন তাহা হইলে মর্যাদায় তাহার নিচের লোকের নিকট দায়িত্ব অর্পন করিবেন এবং বিষয়টি জেনারেল ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিবেন।

বিধি-২০৩ থানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে

(ক) একটি থানার ভিতর ও বাহির উভয়দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি নিদিষ্ট স্থান থাকিতে হইবে। নির্দিষ্ট স্থানে জিনিসটি যাহাতে পাওয়া যায় ওসির তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। কনস্টেবলদের ছাউনিতে প্রত্যেকটি বিছানা গুটাইয়া রাখিতে হইবে। ছাদের সহিত কোন কাপড় ঝুলিয়া থাকিবে না এবং চেয়ারের উপর আজে বাজে জিনিসের স্তুপ জমিবে না। থানার

Dhaka University Institutional Repository

আঙ্গিনা কনস্টেবলদের দ্বারা পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝক রাখিতে হইবে এবং পানি জমিবে এমন গর্ত ও ছিদ্র ভরাট করিয়া দিতে হইবে।

বিধি-৩২১। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অসুস্থতা (১৮৬১ সালের ৫নং আইন)

(ক) যখন কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশী হেফাজতে রাখার দরকার হয় এবং তাহার স্বাস্থ্য এই পর্যায়ের হয় যে, তাহার ও অন্যান্য লোকের উপর মারাত্মক ঝুঁকি গ্রহণ করা ছাড়া তাহাকে কোথাও সরান সম্ভব নহে, তখন গ্রেফতারকারী অফিসার তাহার চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) যখন কোন বন্দীর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তখন নিকটতম সরকারী মেডিক্যাল অফিসারকে ডাকা উচিত। কিন্তু যখন যুক্তিসংগত দূরত্বের মধ্যে কোন সরকারী মেডিকেল অফিসার না পাওয়া যায়, তখন নিকটতম বে-সরকারী ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হইবে এবং তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুপারিন্টেন্ডেন্টের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিল পাঠাইবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহার কন্টিজেন্সী সম্ভাব্য খরচ তহবিল হইতে চিকিৎসার খরচ বহন করিবেন।

বিধি-৩২৪-আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া এবং পুলিশী হেফাজতে রাখার আবেদন

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির ৬১ ধারা ও ১৬৭ ধারা একত্রে পড়িলে এই বিধান পাওয়া যায় যে, কোন আসামীকে গ্রেফতার করার পর যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হয়, তবে তাহাকে কেস ডায়েরীতে সন্নিবেশিত তথ্য সমূহের

Dhaka University Institutional Repository

অনুলিপিসহ অবিলম্বে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। তবে কোন অবস্থাতেই আসামীর পুলিশী হেফাজতে অবস্থানের মেয়াদ মামলার সব অবস্থাতেই যাহা যুক্তিসঙ্গত উহা অপেক্ষা দীর্ঘ হইবে না।

(খ) অতিরিক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করার জন্য হাজতে প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্ট নিম্নে বর্ণিত-আদেশসমূহ জারি করিয়াছেন ঃ

"ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারার বিধি ব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী হাজতে প্রেরণের আদেশ প্রদান অথবা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় বিবেচনা ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। লক্ষ্যণীয় যে, এই ধারা অনুসারে কোন আদেশ দিতে হইলে তাহা দিতে হইবে বন্দীর উপস্থিতিতেই এবং শ্রবনের পর প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে তাহার কোন আপত্তি থাকিলে তাহা সে করিতে পারিবে। যখন বর্ধিত সময়ের জন্য আটক রাখা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখন যথাসম্ভব ন্যূনতম সময়ের জন্য হাজতে রাখার আদেশ প্রদান করা হইবে। পুলিশী আবেদন মঞ্জুর করা উচিত নহে"।

(গ) যখন পুলিশী হেফাজতে পুনরায় প্রেরণের আদেশ প্রদান যুক্তি সঙ্গত সাব্যস্ত হয় এইরূপ অবস্থা বিরাজমান, তখন থানা অফিসার আসামীকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিবেন যদিও তাহার এই মামলা বিচার করায় অধিক্ষেত্র না থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার কেস ডায়েরীর একটি কপিও পাঠাইবেন। অতঃপর বিষয়টি সুপারিন্টেন্ডেন্টের গোচরীভূত করিবেন।

(ঘ) যেই যুক্তিতে পুনরায় হাজতে প্রেরণের জন্য আদেশের প্রার্থনা করা হয় তাহা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন স্পষ্টভাবে ও আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) পুলিশী হেফাজতে পুনরায় প্রেরণের আদেশ দানের জন্য আবেদনকে একটা নিত্য কর্ম (Routine) এবং স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় মনে করা ঠিক নহে। এই আবেদন জেলা বা মহকুমা সদরে উপস্থিত প্রধান পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট করিতে হইবে।

(চ) কোন বন্দীকে পুলিশী হেফাজতে পুনরায় প্রেরণ করার আদেশ দিতে হইলে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা নিম্নপদস্থ কোন অফিসার দিতে পারেন না। পুনরায় হাজতে প্রেরণের আদেশের জন্য আবেদনসমূহ ও শুধুমাত্র যথাযোগ্য পদ মর্যাদার ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছেই করিতে হইবে।

(ছ) কোন বন্দীকে পুলিশী হেফাজতে পুনরায় প্রেরণের আদেশ দানের ক্ষমতা প্রয়োগ শুধুমাত্র বেতনভোগী যথাযোগ্য পদমর্যাদার ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই রূপ ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র একক অধিবেশনের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(জ) যখন পুনরায় হাজতে প্রেরণের আদেশ দানের উদ্দেশ্যে বন্দীর বিবৃতির সত্যতা, পরীক্ষা করা দরকার, তখন তাহাকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে আটক রাখা উচিত।

(ঝ) হাজতে পুনঃ প্রেরণের মেয়াদ যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত।

(ঞ) পুলিশের জিম্মায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ডে রাখিবার আবেদন জানানো হইলে তাহাকে অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করাইতে হইবে। অনুরূপ আবেদন সম্ভাব্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রথমেই করিতে হইবে এবং পুলিশের জিম্মায় আরও রিমান্ডের প্রয়োজন হইলে প্রথম আবেদনপত্রের সূত্র ধরিয়া পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন করিতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রথমবার হাজির করাইবার পর পনের দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে এমন বিচারাধীন বন্দী পুলিশের জিম্মায় থাকিতে পারে না।

রাম আবতার বনাম রাজ্য এ আই আর ১৯৫৫ এ এল এল ১৩৮ ঃ ১৯৫৫ সি আর এল জে ৩৯৪ মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই মর্মে রায় প্রদান করেন যে, কোন ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার বেশি পুলিশ হেফাজতে রাখা উচিত নয়।

রজনীকান্ত বনাম উড়িষ্যা রাজ্য ১৯৭৫ সি আর এল জে ৮৫/অনুমোদনক্রমে উড়িষ্যা হাইকোর্ট একই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩২৪ প্রবিধানে উল্লেখিত 'অবিলম্বে' কথাটির কোন ভিন্ন অর্থ নাই, কারণ অবিলম্বে আদালতে হাজির করা হউক এই কথার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সময়ও প্রয়োজন অতিরিক্ত মনে হয়।

CRPC- ১৬৭ মতে-

পুলিশ হেফাজতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা না গেলে তখনকার কার্যবিধি

(১) যখনই কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া হেফাজতে আটক রাখা হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, ৬১ ধারায় নির্ধারিত চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা যাইবে না এবং এরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, অভিযোগ বা সংবাদ দৃঢ়ভিত্তিক, তা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বা তদন্তকারী পুলিশ- অফিসার, তিনি যদি সাব-ইন্সপেক্টর পদের নিম্নপদস্থ না হন, অবিলম্বে অতঃপর নির্ধারিত ডায়রীতে

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যের নকলসহ আসামীকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) এই ধারা অনুসারে আসামীকে যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হল, তার সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করার অধিক্ষেত্র থাককু বা না থাকুক, তিনি তার বিবেচনামত আসামীকে উক্ত রূপ হেফাজতে আটক রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, তবে এইরূপ আটকের মেয়াদ সর্বমোট পনের দিনের অধিক হবে না।

CRPC- ১৭৬ অনুযায়ী

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ইনকোয়ারী

(১) কোন ব্যক্তি পুলিশের হেফাজতে থাকাকালে মারা গেলে সুরতহাল করার ক্ষমতা সম্পন্ন নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশ অফিসার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্ত ছাড়াও অথবা এইরূপ তদন্তের পরিবর্তে ইনকোয়ারী করবেন।

কবর হতে লাশ তোলার ক্ষমতা

(২) যে লাশ ইতিমধ্যে কবরস্থ করা হয়েছে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যদি মৃত্যুর কারণ পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন, তা হলে তিনি লাশটি কবর হতে তুলতে এবং পরীক্ষা করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিধি-৩২৭ ঃ কারাগারে বন্দীদের বাসস্থান

ক) প্রত্যেক হাজতখানায় বন্দী পিছু ৩৬ বর্গফুট হিসাবে স্থান থাকা চাই।

খ) ইংরেজীতে ও মাতৃভাষায় একটি নোটিশ প্রত্যেক ফাঁড়ি ও থানার হাজতখানার বাহিরে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে এবং তাহাতে ঐ হাজতখানায় সরকার উর্দ্ধপক্ষে কতজন কয়েদী স্থান দিতে অনুমতি দিয়াছেন তাহা দেখাইতে হইবে।

গ) অনুমোদিত সংখ্যা কখনও অতিরিক্ত হওয়া যাইবে না। আর যদি বন্দী সংখ্যা অনুমোদিত সংখ্যা অতিক্রম করে, তবে অতিরিক্ত কয়েদীদিগকে সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত প্রহরাধীনে রাখিতে হইবে।

বিধি-৩২৮ ঃ বন্দীদের হাজতখানায় ভর্তি করার পূর্বে জিজ্ঞাসাবাদ

ক) কোন থানা বা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার উক্ত থানা বা ফাঁড়িতে আনীত সমস্ত বন্দীদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

খ) বন্দীদিগকে হাজতখানায় ভর্তি করার পুর্বে তিনি বন্দীর দেহে কোন রকম জখমের চিহ্ন আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবেন এবং তেমন কোন জখম থাকিলে জেনারেল ডায়েরীতে তাহার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি তিনি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে হাজতখানায় ভর্তির সময় জখমের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে নিরপেক্ষ সাক্ষী ডাকিয়া আনিতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ঃ আসামী পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার পূর্বেকার জখমের ভিত্তিতে আসামীর উপর দৈহিক নির্যাতন চালানোর দায়ে পুলিশ অফিসারদের যাহাতে অভিযুক্ত না হইতে হয়, তাহাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য।

গ) তিনি বন্দীর দেহ তল্লাশীপূর্বক তাহার নিকট হইতে পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া আর সব কিছুই সরাইয়া নিবেন এবং বন্দীকে তাহার নিকট হইতে নেওয়া সমস্ত জিনিসের একটা রসিদ দিবেন।

আয়না,শংখ অথবা লোহার চুড়ি মহিলা বন্দীদের নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়া যাইবে না। বন্দীদিগকে হাজত খানার ভিতরে একমাত্র অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া আর কোন কিছু রাখিতে দিবেন না।

ঘ) অতঃপর, তিনি হাজত খানায় প্রবেশ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবেন এবং পালানো বা আত্মহত্যার উপযুক্ত কোন বস্তু বা অস্ত্র, যথা-বাঁশ, দড়ি, টুল ইত্যাদি যাহাতে হাজত খানার ভিতরে বা তাহার নাগালের মধ্যে থাকিতে না পারে, তাহা দেখিবেন।

বিধি-৩২৯ ঃ হাজতখানার জন্য প্রহরী

ক) কোন বন্দীর উপস্থিতির পর ভারপ্রাপ্ত অফিসার জেনারেল ডায়েরীতে তাহার উপস্থিতির বিষয় লিখিয়া রাখিবেন, একজন প্রহরী নিয়োজিত করিবেন এবং একজন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, একজন হেড কনষ্টেবল অথবা একজন জ্যেষ্ঠ কনস্টেবলকে তাহার দায়িত্বে নিয়োগ করিবেন। এই দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনষ্টেবল অথবা জ্যেষ্ঠ কনস্টেবল এবং অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

কনস্টেবলের নাম ও তাহাদের ডিউটির সময় জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(গ) প্রহরী বদল করার সময় প্রহরার দায়িত্ব সম্পন্ন অফিসার ও নয়া প্রহরী বন্দীদিগকে গুনিবেন এবং দেখিবেন সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা।

(গ) হাজতখানার চাবি প্রহরীর কাছে থাকিবে। একমাত্র জরুরী অবস্থায় ; যেমন- আগুন লাগা ইত্যাদি ছাড়া তিনি আগে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে না বলিয়া হাজতখানার তালা খুলিবেন না।

(ঘ) সন্ধ্যা ও সকালের মাঝখানে ডিউটিরত প্রহরীদের একটা লণ্ঠন সরবরাহ করিতে হইবে। লণ্ঠন দরজা হইতে নিরাপদ দূরত্বে এমনভাবে জ্বলিতে থাকিবে যাহাতে হাজতখানার অভ্যন্তরভাগ আলোকিত হয়।

(ঙ) যদি হাজতখানা খোলা অথবা কোন বন্দীকে বাহির করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ডাকা হইবে এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য কনস্টেবলের সহযোগীতা গ্রহণ করা হইবে।

বিধি-৩৩০ ঃ হাত কড়ির ব্যবহার (১৮৬১ সালের ৫ নং আইন)

(ক) কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা তদন্তস্থলে প্রেরণের জন্য পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত বন্দী এবং বিচারাধীন বন্দীকে তাহাদের পলায়ন বন্ধ করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার চাইতে বেশি কড়াকড়ি করা উচিত নহে। হাত কড়া বা দড়ির ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অমর্যাদাকর।

Dhaka University Institutional Repository

কোন অবস্থায়ই মহিলাদের হাতকড়া লাগানো যাইবে না। বয়স বা দুর্বলতার কারণে যাহাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা সহজ ও নিরাপদ তাহাদের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি করা উচিত হইবে না। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭১ ধারা মোতাবেক গ্রেফতারকৃত সাক্ষীকে কোন অবস্থায়ই হাতকড়া পরানো যাইবে না।

সুরতহাল তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য তদন্ত পরিচালন

465042

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ (৫) উপধারা অনুসারে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট / থানা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন মৃত লাশের সুরাতহাল রিপোর্ট তৈরি করিতে পারেন।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য এনকোয়ারী

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৬ (২) উপধারায় বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মারা গেলে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্ত ছাড়াও বা এইরূপ তদন্তের পরিবর্তে এনকোয়ারী করিবেন। কোন অপরাধের এনকোয়ারীর ক্ষেত্রে তাহার যেরূপ ক্ষমতা থাকে এই ক্ষেত্রেও তাহার সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে। এইরূপ এনকোয়ারী পরিচালনার সময় ম্যাজিস্ট্রেট পরিস্থিতি অনুসারে ফৌজদারী কার্যবিধির বর্ণিত পদ্ধতিতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ময়নাতদন্ত (Postmortem)

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ (৩) উপধারা অনুসারে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য সিভিল সার্জন বা ক্ষমতাবান ডাক্তারের নিকট প্রেরিত লাশের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ মতামত সম্বলিত রিপোর্টকে ময়না তদন্ত রিপোর্ট বলে।

পুলিশ হেফাজতে আসামীর স্বীকারোক্তি

আসামীর স্বীকারোক্তি আসামীর বিরুদ্ধে আসামীর সাক্ষ্য হিসেবেব ব্যবহৃত হয়। সাধারণত স্বীকারোক্তি বলিতে ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আসামীর স্বীকারোক্তিকে বুঝায়। ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট স্বীকারোক্তি ব্যতীতও পুলিশের নিকট অনেক সময় আসামী দোষ স্বীকার করিয়া জবানবন্দী দিয়া থাকে। এইরূপ স্বীকারোক্তি আদালতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা সাক্ষ্য আইনের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সাক্ষ্য আইনের ২৫ ধারায় বলা হয় যে, কোন মামলার আসামী যদি পুলিশ অফিসারের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়া থাকে তাহা আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারায় বলা হয় যে, আসামী পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিলেও তাহা আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না। সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারায় বলা হয় যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে তাহার কোন উক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট মামলার চোরাইমাল বা কোন তথ্য উদঘাটিত হয়, তবে উদঘাটিত বিষয়ের সহিত আসামীর উক্তির সেই অংশটুকু আদালতে প্রমাণ করা যাইবে। অর্থাৎ প্রমাণ সাপেক্ষে আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

হইবে। যেমন- আসামী পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে বলে যে, সে কিছু চোরাইমাল / আলামত 'ক'- এর নিকট বিক্রি করিয়াছে বা রাখিয়াছে আসামীকে লইয়া নিরপেক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ক' হইতে উক্ত মালামাল / আলামত উদ্ধারের সহিত সম্পৃক্ত আসামীর স্বীকারোক্তি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে যাইবে।

পুলিশ কর্তৃক মহিলাদের দেহ তল্লাশি

যদি পুলিশ মনে করেন যে, কাহারো নিকট কোন অবৈধ মালামাল বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আছে, তবে পুলিশ ঐ ব্যক্তির দেহ, সঙ্গে থাকা ব্যাগ ইত্যাদি তল্লাশি করিতে পারেন। যদি সন্দেহকৃত কোন বস্তু তল্লাশিতে পায় তবে উহা উপস্থিত সাক্ষীগণের সামনে জব্দনামা মূলে জব্দ করিতে পারেন এবং উক্ত জব্দকৃত মালামাল বিচারকালে বস্তু প্রদর্শনী হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

মহিলাদের দেহ তল্লাশি মহিলা পুলিশ ব্যতীত অপর কোন পুলিশ স্বয়ং কিংবা কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন মহিলার দেহ তল্লাশি করা যাইবে না। কোন স্ত্রীলোক দ্বারা মহিলার দেহ তল্লাশি করা যায়। তল্লাশি করবার সময় তাহার আব্রু বা সম্ভ্রম যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে তাহা দেখিতে হইবে।

স্ত্রীলোক ও বালক কয়েদীদের এসকর্ট

স্ত্রীলোক ও বালক কয়েদীদের যতদূর সম্ভব বয়স্ক ও পুরুষ কয়েদীদের নিকট হইতে পৃথক রাখা উচিত। প্রয়োজন না হইলে হাতকড়ি লাগাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

আসামীর পুলিশ হেফাজত (Remand)

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ (২) ও (৪) উপধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, থানা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোন মামলার আসামীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে পুলিশ হেফাজতের আদেশ দিতে পারেন। অতএব দেখা যায় যে, বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ আসামীকে পুলিশ হেফাজতের আদেশ দিতে পারেন না।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় বলা হয় যে, যখন কোন মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যদি এইরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, কার্যবিধির ৬১ ধারার বিধান অনুসারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা যাইবে না, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাওয়া তথ্যাদিসহ কেইস ডাইরী সমেত অভিযুক্তকে সংশ্লিষ্ট আদালত সোপর্দ করণপূর্বক রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন পেশ করিতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ (২) উপধারা অনুসারে নথিপত্র পর্যালোচনা করিয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলে ১৬৭(৩) উপধারা মতে যুক্তিসমূহ আদেশ নামায় উল্লেখপূর্বক আসামীকে পুলিশ হেফাজতে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। তবে এইরূপ হেফাজতের মেয়াদ কোন মামলায় কোন আসামীর ক্ষেত্রে সর্বমোট ১৫ দিনের বেশি হইবে না। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ (৪) উপধারায় বলা হয় যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, থানা ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্ন অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে পুলিশ হেফাজতে দেওয়ার আদেশ দিলে আদেশের কপি উর্ধ্বতন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে হইবে। আসামীকে পুলিশ হেফাজতে দেওয়ার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সক্রিয় বিবেচনায় রাখিতে হইবে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এজলাসে হাজির করা হইয়াছে কি-না,

খ) ম্যাজিস্ট্রেটকে নিশ্চিত হইতে হইবে আসামীর শরীরে কোন জখমের চিহ্ন আছে কিনা বা আসামীর চিকিৎসা প্রয়োজন আছে কিনা,

গ) আসামীকে ইতিপূর্বে রিমান্ডে নেওয়া হইয়াছে কিনা এবং রিমান্ড হইতে ফেরত আসার পর তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক স্বীকারোক্তি রেকর্ডের আবেদন ছিল কিনা এবং আসামী স্বীকারোক্তি করিতে অস্বীকৃতি জানায় কিনা,

ঘ) সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার, আসামীকে আদালতে সোপর্দ করণ এর অগ্রায়ণপত্র কেইস ডায়েরী পর্যালোচনাকরণ পূর্বক আসামীকে পুলিশ রিমান্ডে দিবার যথার্থ কারণ আদেশ নামায় উল্লেখ পূর্বক একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসামীকে রিমান্ডে দিবেন। তবে আদালত হইতে নেওয়ার এবং আদালতে ফেরত পাঠাইবার সময়, নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় হিসাবে বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য যে, তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক মামলার কেইস ডায়েরী আদালতে পেশকরণ বাধ্যতামূলক। সাধারণত রাষ্ট্রবাদী মামলায় অনেক সময় এজাহারে আসামীর নাম থাকে না, সেই ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মামলার ঘটনা উদ্ভাবনের জন্য আসামীর রিমান্ডের আবেদন পুলিশ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও গুরতর অপরাধ ; যেমন- খুন, জখম, ডাকাতি, ধর্ষণ, চুরি ইত্যাদি মামলার আলামত উদ্ধার চোরাই মালামাল উদ্ধার, সহযোগীদের গ্রেফতার ইত্যাদি কারণ উল্লেখপূর্বক কোন মামলার আসামীকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন পুলিশ সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করিয়া থাকে। পুলিশ আবেদন করিলেই ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে পুলিশ রিমান্ডে দিতে বাধ্য নয়। রিমান্ডে নেওয়ার কারণ অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হইতে

Dhaka University Institutional Repository

হইবে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হইলে অর্থাৎ কেইস ডায়েরীতে আসামীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য না থাকিলে আসামীর সম্পৃক্ততা না থাকিলে, আসামীর শরীরে যদি জখম থাকে বা আসামীর অসুস্থতার সমর্থনে কোন যুক্তিসঙ্গত আবেদন থাকে, আসামীকে একবার রিমান্ডে নেওয়া হইয়াছে এবং স্বীকারোক্তি করিতে অস্বীকৃতি জানানোর পর পুনঃ রিমান্ডের আবেদন নামঞ্জুর হইবে। জামিনের আবেদন না থাকিলে আসামী জেল হাজতে যাইবে। অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণের অভিমত যে, রিমান্ড বাতিলের দিন জামিনের আবেদন থাকিলেও জামিন না দেওয়া সমীচীন। আসামীকে রিমান্ডে দেওয়া হইলে মেয়াদ শেষে রিপোর্টসহ আসামীকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির করিতে হয়। আদালতে জামিনের আবেদন না থাকিলে আসামীকে জেল-হাজতে পাঠাইবেন।

তদুপরি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে জামিনের আবেদন থাকিলেও তাহা কার্যবিধির ৪৯৭ ধারার বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। অর্থাৎ পরিস্থিতির আলোকে জামিন দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করিবেন।

নারী অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে যেসব আইন রয়েছে সেগুলো হলো-

১. হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, ১৮৫৬।

২. তালাক আইন, ১৮৬৯।

৩. খ্রিষ্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২।

৪. বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন, ১৮৭৪।

৬. জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন, ১৮৮৬।

৭. অভিভাবকত্ব আইন, ১৮৯০।

৮. বিদেশী বিবাহ আইন, ১৯০৩।

৯. হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৮।

১০. হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধন আইন, ১৯২৯।

১১. বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯২৯।

১২. হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার আইন ১৯৩৭।

১৩. মুসলিম বিবাহ আইন, ১৯৩৯।

১৪. এতিম ও বিধবার গৃহ আইন, ১৯৪৪।

১৫. হিন্দু বিবাহিত নারীর আলাদা বসবাস ও ভরণপোষণ আইন, ১৯৪৬।

১৬. হিন্দু বিবাহ বাতিল রহিতকরণ আইন, ১৯৪৬।

১৭. মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইন, ১৯৬১।

১৮. মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন, ১৯৭৪।

১৯. যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০।

২০. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫।

২১. পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৮৯।

নারীর বিশেষ অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আইনগুলো বলবৎ রয়েছে-

১. পাচার বিরোধী আইন, ১৯৩৩।

২. শিশু আইন, ১৯৭৪।

৩. মাতৃদুগ্ধ সংক্রান্ত আইন, ১৯৮৪।

৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩।

৬. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২।

৭. এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২।

শ্রম আইনের অধীনে বাংলাদেশের নারীদের জন্য নিম্নলিখিত আইনগুলো রয়েছে-

১. মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৩৯।

২. কয়লা শ্রমিক নারীর মাতৃত্ব সুবিধা আইন, ১৯৪১।

৩. মাতৃত্বকালীন সুবিধা (চা-বাগান) আইন, ১৯৫০।

৪. চা শ্রমিক আইন (অধ্যাদেশ), ১৯৬২।

৫. ফ্যাকটরি আইন, ১৯৬৫।

জেন্ডার উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে নারীর অধিকার সুরক্ষায় আইনের খুব একটা ঘাটতি নেই, যা আছে তা হলো আইন প্রয়োগের অভাব। এক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, সমাজের সর্বস্তরে দুর্বৃত্তায়ন, কালো টাকা ও পেশিশক্তির কারণে বেশির ভাগ সময়ই নারী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কিংবা প্রচলিত আইনে দুর্বলতার কারণে অনেক সময়ই অপরাধী পার পেয়ে যায়।

গ্রেফতারকালে পুলিশ অফিসারদের দায়িত্বগুলো কি কি ?

প্রত্যেক অধিকারের সাথে ঐ অধিকারগুলোকে সম্মান ও রক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশ অফিসারদের উপর বর্তায়। সুতরাং, গ্রেফতারকালে ও তার পরে পুলিশ অফিসারদের নিম্নলিখিত দায়িত্ব রয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

- সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তার অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা।

এর অর্থ হল, পুলিশ অফিসারদের উচিত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার অধিকার এবং অধিকারগুলো কিভাবে সে পেতে পারে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা। পুলিশ অফিসারদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলো সম্বন্ধে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অবহিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

- নীরব থাকার এবং অপরাধ স্বীকার না করার অধিকার, এবং মৌনতা অপরাধের স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে না ;
- একজন আত্মীয় বা নিকট বন্ধুর সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ করার অধিকার ;
- একজন আইনী প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং তার সাথে গোপনে আলোচনা করার অধিকার ;
- যদি সন্দেহভাজনের একজন উকিলের খরচ দেবার সামর্থ্য না থাকে তবে তার পক্ষে একজন আইনী প্রতিনিধি নিয়োগ পাবার অধিকার ;
- যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে আটক ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির করার অধিকার (প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইনানুযায়ী) ;
- আটক ব্যক্তির পক্ষের আইনী প্রতিনিধির সম্মুখে জেরাকৃত হবার অধিকার, যদি না এই অধিকার বাতিল করা যেতে পারে অথবা যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিদেশি নাগরিক হয় ;
- আটক ব্যক্তির নিজ দেশের কূটনীতিক বা রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগের অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

- **যৌক্তিক তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য**

  পুলিশ অফিসারদের নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে ঃ

  - গ্রেফতারের কারণ ;
  - গ্রেফতারের সময় ;
  - প্রহরাধীন স্থানে স্থানান্তরের সময় ;
  - বিচারক বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সম্মুখীন করার সময় ;
  - আইন প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের পরিচয় ;
  - প্রহরাধীন স্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ;
  - জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদের পূর্ণ বিবরণ এবং
  - পুলিশ কর্তৃক সংরক্ষিত আটক ব্যক্তির সম্পদের বিবরণ।

- **এর সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত**

  - ব্যক্তিকে আটক করার সময় ও তারিখ ;
  - তার / তাদের শারীরিক অবস্থা ;
  - ডিটেনশন অফিসার, উকিল, ডাক্তার এবং পরিবার বা বন্ধুর সাথে সকল সাক্ষাৎকার ;
  - অনুশীলনের সময়সীমা ;
  - মুক্তি বা ডিটেনশন স্থানে স্থানান্তরের সময় ও তারিখ।

- গ্রেফতারের তথ্যাবলী ঐ ব্যক্তি বা তার আইনজীবিকে জানাতে হবে।

- প্রয়োজনবোধে সাক্ষাৎকার কালে একজন দোভাষী নিয়োগ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ডিটেনশন বা বিনা বিচারে আটকাবস্থা

ক) পুলিশ ডিটেনশনে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার

আইনানুযায়ী পুলিশ যে কোন ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও শুনানীর পূর্বে কিছু সময়ের জন্য আটক করতে পারে এবং শুনানীর সময়ই স্থির হয় যে ঐ ব্যক্তিকে জামিন দেয়া যাবে কি যাবে না।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক আটক ব্যক্তির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার আছে। The 1997 Minimum Rules Part C গ্রেফতারকৃত বা বিচারের অপেক্ষাধীন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। ১৯৯৮ Body of Principles ইতোমধ্যে, 'যে কোন আটকাদেশ বন্দী'-দের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

প্রত্যেক মৌলিক অধিকারের সাথে পুলিশ অফিসারদের উপর সেই অধিকারকে সম্মান করা ও স্বীকার করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অধিকারগুলোর সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলো জানা এবং আটক ব্যক্তি যেন এই সব অধিকার লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া- উভয়েই পুলিশ অফিসারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

খ) আটক হবার কারণ সম্পর্কে অবহিত হবার অধিকার

- প্রত্যেক আটক ব্যক্তির অবিলম্বে আটক হবার কারণ সম্পর্কে অবহিত হবার অধিকার রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে যত দ্রুত সম্ভব করা উচিত। এটি যদি তাৎক্ষনিকভাবে করা সম্ভব হয়, তাহলে তাই করা উচিত। যুক্তিসঙ্গতভাবে যত দ্রুত সম্ভব আটক

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকে তার পরিবার বা আইনী প্রতিনিধিকে তার আটক অবস্থার ব্যাপারে অবহিত করতে অনুমতি দেয়া উচিত।

গ) নির্দোষ হিসেবে অনুমতি হবার অধিকার

- প্রত্যেক আটক ব্যক্তির সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মানবিক আচরণ পাবার অধিকার আছে।
- প্রত্যেক, এমনকি দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও ন্যায্য বিচারের দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্বে নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হবার অধিকার আছে।

স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম হিসেবে হাজত

- বিচারের পূর্বে কারাগারে ডিটেনশন দেয়া নিয়ম নয়, বরং ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম হল, পরিবেশ-পরিস্থিতি ভিন্ন কিছু দাবী না করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেয়া উচিত।

ঘ) সুবিচার পাবার যোগ্যতা

- আইনী বিচারালয়ে ডিটেনশনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সফল হলে মুক্তি পাবার অধিকার। উদাহরণস্বরূপ, আটক ব্যক্তি যখন জামিনের আবেদন করে তখন এটা হতে পারে।
- ডিটেনশনের সময়সীমা ও বৈধতার সিদ্ধান্ত বিচারক বা সমতুল্য কর্তৃপক্ষের নেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

- পুরুষ বা নারী, আটক ব্যক্তি নিজেই তার আইনজীবীর মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগের অধিকার থাকতে হবে।
- সকল আটক ব্যক্তিদের উকিল বা অন্য আইনী প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করার অধিকার থাকতে হবে।
- সকল আটক ব্যক্তিরই বিচারসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সম্মুখীন হবার এবং ডিটেনশনের বৈধতা পুনর্বিবেচনার আবেদনের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরই যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে বিচার পাবার বা মুক্ত হবার অধিকার রয়েছে।

গ্রেফতার, আটক এবং অপরাধ তদন্তে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও নির্দেশাবলী

গ্রেফতারের বা গ্রেফতার করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগিত নির্দেশাবলী ও মানদণ্ড এবং অনুশীলন হতে নির্ধারিত নির্দেশাবলী নিম্নরূপ ঃ

সকল পুলিশ কর্মকর্তার জন্য প্রযোজ্য

- গ্রেফতার করার পদ্ধতি, গ্রেফতার করার ক্ষমতার মাত্রা এবং গ্রেফতারের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।
- গ্রেফতার করার বিষয়ে পারস্পরিক দক্ষতাকে সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য গ্রেফতার করায় অংশগ্রহণকারীদেরও বাস্তব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে যোগাযোগের দক্ষতা এবং মানবিক

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলো যথাযথ সম্মান দেখানোর কৌশলগত দক্ষতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনায় আনতে হবে।

- গ্রেফতারের সময় নিরস্ত্র থাকতে হবে, থাকতে হবে ভদ্র, প্রচেষ্টা হবে শান্ত, প্রতিরোধে কোন ক্ষতিকর বিষয় থাকবে না তবে প্রয়োজনে কর্তৃত্বকারী সুর এবং শক্ত প্রতিরোধ গড়া যাবে।
- গ্রেফতারের সময় হ্যান্ডকাফ সহ আটকের অন্যান্য সরঞ্জামাদি ব্যবহারের দক্ষতা ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- গ্রেফতারের সময় আত্মরক্ষার সাথে সাথে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- যেখানে সম্ভব গ্রেফতারের আদেশ বা ওয়ারেন্ট বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
- ইউনিফর্মের মাঝে ছোট একটি কার্ড বহন করতে হবে, যাতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকারের বিষয়গুলো লেখা থাকবে। ঐ অধিকারগুলো মাঝে মাঝে পড়তে হবে এবং গ্রেফতারের সময় তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।
- চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণে কিংবা সামাজিক শিক্ষামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির কৌশল সম্পর্কে অবগত হতে হবে।
- যত্নসহকারে গ্রেফতার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উর্দ্ধতন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য

- গ্রেফতারের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ও স্থায়ী আদেশ জারী ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সব কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের পদ্ধতি, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার এবং নিরাপদ ও মানবিক গ্রেফতারের কৌশল সম্পর্কে নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- আন্তঃযোগাযোগ দক্ষতা, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ কৌশল, আত্মরক্ষা এবং বিবর্তনমূলক কলা কৌশলের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- স্থানীয় অধিকারের প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক গ্রেফতার সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য আদর্শ ফরম তৈরী করতে হবে।
- পূর্ব পরিকল্পিত গ্রেফতারের ক্ষেত্রে, গ্রেফতারের অবস্থা ও প্রেক্ষাপট এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, ব্রিফিং ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং একাধিক বিকল্পের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রত্যেক গ্রেফতারের পরে সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরকে Debrief করতে হবে এবং গ্রেফতারের তথ্যসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি-না তা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।
- গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি যাতে নির্দিষ্ট আইনী সহায়তা নিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার স্বীকৃত মানদন্ড প্রতিষ্ঠায় পুলিশ ও জেল কর্মকর্তাদের বাস্তব পদক্ষেপ

আটক ব্যক্তি বা কয়েদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য মানবাধিকার এর ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব পদক্ষেপের বর্ণনা করা যেতে পারে। এখানে সুবিধার জন্য "আটক ব্যক্তি" এবং "আটক" শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সব পুলিশ কর্মকর্তার করণীয়

- আটক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে অবগত হতে হবে।
- দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, আত্মরক্ষা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং তদারকী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষকের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য তাদের সম্পর্কে লিখিত যে সমস্ত তথ্য পাচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে হবে।
- সম্প্রদায়ের নেতা, আইনী প্রতিনিধি, পরিবারের সদস্য, পরিদর্শক ও ডাক্তারদের পরিদর্শনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ব্যক্তিগত পরিচয় বহনকারী ব্যাজ সার্বক্ষনিক দৃশ্যমান অবস্থায় রাখতে হবে।
- আটক ব্যক্তিদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যতীত আগ্নেয়াস্ত্র হাজত / থানায় প্রবেশ করা যাবে না।
- আটক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও পরীক্ষা নিশ্চিতকল্পে নিয়োজিত, সময় ভিত্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- কোন আটককৃত ব্যক্তির প্রতি শারীরিক ও মানসিক কোন রকম বিরূপ আচরণ করা হয়েছে মর্মে সন্দেহ দেখা দিলে তা সাথে সাথে রিপোর্ট করতে হবে।
- শাস্তি দেয়ার জন্য বেঁধে রাখার বস্তু (রশি, হ্যান্ডকাফ ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না। তবে আটক ব্যক্তি স্থানান্তরের সময় পলায়ন প্রতিরোধ রেখে, চিকিৎসার কারণে কিংবা আটককৃত ব্যক্তির নিজের অথবা অন্য আটককৃত ব্যক্তির জখম প্রতিরোধ কল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ সাপেক্ষে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আটককৃত ব্যক্তিদের বিনোদনের ব্যবস্থাসহ তাদের লেখার ও পড়ার সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও তদারককারী কর্মকর্তাদের করণীয়

- আটক ব্যক্তিদের প্রতি কী রকম ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে স্থায়ী বিধান তৈরী করতে হবে এবং তা বিতরণ বলবৎ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- আটক কাজে নিয়োজিত সব কর্মচারীদেরকে বিশেষায়িত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আটক ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ এমনকি তার খাবার এর উপর যদি কোন বিধি নিষেধ থাকে তাও সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- তিন স্তর বিশিষ্ট নোটিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আটক কাজের নোটিশ (তাৎক্ষনিক) ; অভিযোগের বিবরণ সম্বলিত নোটিশ (দ্রুত) ; এবং আটককৃত ব্যক্তির অধিকার সম্বলিত নোটিশ (প্রথম দুই প্রকার নোটিশের সাথে তা দিতে হবে)
- কার্য বন্টনের সময় কয়েদখানা তত্ত্বাবধানকারী অফিসারকে গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের থেকে পৃথক রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের আর আটক রাখার প্রয়োজন নেই তা নির্ধারণের জন্য প্রসিকিউটর, জজ, পুলিশ, তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীরা মিলিত হবেন।
- মহিলা আটককৃত ব্যক্তির পাহারা, তল্লাশি এবং তত্ত্বাবধান মহিলা কর্মচারী দ্বারা করতে হবে।
- জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কোন পুরুষ কর্মচারী মহিলা ডিটেনশন এলাকায় প্রবেশ করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

- আটক ব্যক্তির জন্য পৃথক কক্ষ এবং পৃথক ভাবে পরিবারের লোকজনদের সাথে পৃথকভাবে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আইনজীবিদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে।
- সাক্ষাতকারী এবং আটক ব্যক্তির সাক্ষাতের সময় মাঝখানে গ্রীল, টেবিল বা অনুরূপ কোন কিছুর মাধ্যমে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা থাকবে।
- দ্রুত তদন্ত করতে হবে। কঠোর সাজাপ্রাপ্ত এবং প্রাথমিক অপরাধের ক্ষেত্রে নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা অসৌজন্য মূলক আচরণ বা শাস্তি এ ধরণের কার্য করা যাবে না।
- যথাসময়ে চাহিদা মাফিক সকাল এবং সন্ধ্যার মধ্যে ১৫ (পনের) ঘন্টার বেশী হবে না খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সর্বদা একজন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে পরামর্শকসহ আত্মহনন নিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে।
- সকল আটক ব্যক্তির অসুস্থতার লক্ষণ, জখম, মাদক বিষয়ে মাতলামি এবং মানসিক অসুস্থতার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- নিয়মিতভাবে শৃঙ্খলা বর্হিভূত ছোট ছোট বিষয়গুলো সতকর্তার সাথে হস্তক্ষেপ করতে হবে।
- অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যে প্রাথমিক কার্য নেওয়া হয়েছে তা আটক ব্যক্তিদের অবগত করতে হবে। আটক ব্যক্তিদের বাইরে নেয়া ব্যতীত প্রশিক্ষিত অফিসার ডিটেনশন এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র বহন করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

* সকল অফিসারদের ডিটেনশন এলাকায় রায়ট কন্ট্রোলসহ রায়ট কন্ট্রোল এর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ নিতে হবে।
* ডিটেনশন এলাকায় সকলকে সহজে দৃশ্যমান ব্যাজ ধারণ করতে হবে, যাতে কোন ঘটনায় সহজে সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায়।
* কয়েদিদের স্বার্থে তাদের পরিবার এবং পরিবারবর্গের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
* কর্মচারীদের নিয়ম ভঙ্গের জন্য জরিমানা, ঘন্টা বাজানো, চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত, বেতন কর্তন এবং চাকুরী হতে বহিস্কৃত বা কোন গুরুতর নিয়ম ভঙ্গের কারণে ফৌজদারী অভিযোগ অভিযুক্ত করার বিষয় প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জানাতে হবে।

পুলিশ এবং কারা অফিসারদের শুধুমাত্র এই মান এবং অভ্যাস সচেতনতা নিশ্চিত করাই প্রয়োজন নয় বরং কয়েদীদের অধিকার সম্পর্কে তাদের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ঃ একজন আটক ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার অধিকার আছে এবং তাদেরকে তা করতে সুযোগ দিতে হবে।

কারাগারের অবস্থা

কারা কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা প্রায় উল্লেখ করেন যে, তাদের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও সম্পদ দিয়ে তারা সর্বোচ্চ ভাল করার চেষ্টা করেন।

এটা সত্য যে, কমনওয়েলথভুক্ত কারা অফিসারদের মানবাধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা তাদের নিজেদের মধ্যে কয়েদখানার অবস্থা উন্নতির জন্য যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

নয়। যাই হোক, মানবাধিকার অচেতনতা ও অপব্যবহার প্রতিরোধ পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ।

অপরাধ তদন্তে জাতিসংঘ মান এর প্রয়োজন

যদিও এমন কোন আন্তর্জাতিক ডকুমেন্ট (দলিল / instrument) নাই যা অপরাধ তদন্ত কাজ করবে, আন্তর্জাতিক আইনি খসড়া অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনি মানসমূহ প্রয়োগযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক। তদন্তকালীন স্বাক্ষী, বাদী-বিবাদী, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ, ব্যক্তিগত তদন্ত, যানবাহন বা স্থান পরিদর্শন এবং পত্রাদির বা যোগাযোগের অভিগ্রহণ বা আদান প্রদানে এ অধিকার বা আইনসমূহ সংরক্ষণ বা মেনে চলবে।

- ব্যক্তির স্বাধীনতা বা নিরাপদ অধিকার
- স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার
- সরল অনুমান প্রযোজ্য যদি না আইন প্রক্রিয়ায় অপরাধ প্রমাণিত হয়।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, চিঠিপত্র সংক্রান্ত পক্ষপাতদুষ্ট অনুমান এ অধিকারভুক্ত নয়।
- সম্মান ও যশের উপর আইনবহির্ভূত আক্রমন এ অধিকার ভুক্ত নয়।
- অমানুবিক শারীরিক ও সম্মান হানিকর নিপীড়ন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পুলিশ হেফাজতে নারী

ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

পুলিশ হেফাজতে নারী

(ব্রিটিশ আমল)

অসহযোগ আন্দোলন ও পুলিশি গ্রেফতার এবং হেফাজত

স্বদেশী যুগে শুরু হলেও মহিলাদের অংশ গ্রহণ ব্যাপক গণরূপ পেতে আরো সিকি শতক সময় লেগেছিল। গান্ধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে অহিংসা প্রতিরোধ অর্থাৎ সত্যাগ্রহ নীতির প্রবর্তন করেন। শ্রেণী সংগ্রাম ঘৃণা করলেও এবং শ্রেণী সংগ্রামের পথে তাঁর প্রতিবন্ধ প্রভাব থাকলেও সত্যাগ্রহে মহিলাদের অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য গান্ধী প্রশংসিত হয়েছেন। মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাপকতম হয়েছিল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

ঐ বছরই লবন তৈরী ও সংগ্রহের ওপর ইংরেজ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে গান্ধী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা আন্দোলনকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়। এখানেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকের অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ১৯৪২- এর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সময় থেকেই ব্যাপক ধরপাকড়ের পর প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে মহিলারা স্থানীয় নেতৃত্বে আসতে শুরু করেন। জানা যায় যে বেশ কয়েক জনকে সংকটের মুহূর্তে সংগঠনকে জিইয়ে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমন্বয় রক্ষার কাজে তাঁদের ভূমিকায় গুরুত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে এই মহিলাদের জাদরেল আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, এই মহিলাদের মধ্যে সাবিত্রী দেবী ও ননীবালা দেবীর নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির দমনপীড়ন অগ্রাহ্যকরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে যথোপযুক্ত বিশ্লেষন করা সম্ভবপর না হলেও স্পষ্টতই বহু সংখ্যায় নারীরা তাদের অবগুন্ঠনের অবরোধ ছুঁড়ে ফেলে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের অংশগ্রহণে বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারত বর্ষের সর্বত্র মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি পরিচালিত হয় আর এ সকল আন্দোলনে নারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তবে সেই আন্দোলনে অনেক নারী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং পুলিশ হেফাজতে থেকে কারাবরণও করেন। যারা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তাদের কয়েকজনের কথা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

পুলিশী হেফাজতে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নারী

লীলা নাগ (রায়)

১৯০০ সালের ২ অক্টোবর জন্ম নিয়েছিলেন এদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত অকুতোভয় সৈনিক সংগ্রামী ঐতিহ্যে ভাস্বর লীলা রায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯৩০ সালে সশস্ত্র বিপ্লব এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এই দু'টো ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়লে শ্রীমতী নাগ দু ধারার আন্দোলনেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিপ্লবী কর্মী সুনীতি চৌধুরী এবং শান্তি ঘোষ কুমিল্লা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সশস্ত্র আক্রমন পরিচালনা করেন। এর কিছু দিন পরে ২০ ডিসেম্বর বেঙ্গলী অর্ডিনান্স এ্যাক্ট এর অধীনে লীলা নাগ এবং তাঁর অনুসারী রেনু সেনকে গ্রেফতার করা হয়। তারাই ছিলেন ডিটেনশন প্রাপ্ত ভারতীয় প্রথম নারী। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত লীলা নাগকে সুরী জেলে রাখা হয়। পুলিশী

Dhaka University Institutional Repository

হেফাজতে এবং জেলে কারাবন্দীদের সাথে কারা কর্তৃপক্ষের দূর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনি অনশন আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৩৯ সালের ৩ জুলাই নেতাজীর গ্রেফতারের পর লীলা নাগ তার স্বামীসহ গ্রেফতার হন এবং ২৯ আগষ্ট মুক্তি পান। ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পরপরই তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং তাকে ডিটেনশন দেওয়া হয়। এ সময় জেলা শহর দিনাজপুরের জেলে লীলা নাগকে বন্দী রাখা হয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় পঁচিশ জন সশস্ত্র পুলিশসহ পাঁচ / ছয় জন পুলিশ কর্মকর্তা তার সেলে তল্লাশী চালায়।

মনোরমা বসু

মনোরমা বসু একজন সাধারণ পরিবারের অসাধারণ মেয়ে। জন্ম তাঁর বরিশাল জেলার নরোত্তমপুর গ্রামের অতি দীন এক পরিবারে, ১৮৯৭ সালে। অল্প বয়সে তিনি পিতাকে হারান। চিররুগ্না মা। ঘরে বাইরে দুই তাঁকে সামলাতে হতো। বাইরের কাজে পাড়া-পড়শীদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেলেও ঘরের কাজ সম্পূর্ণই তাঁকে করতে হতো। লেখাপড়ার খুব একটা সুযোগ তিনি পাননি। তা বলে তিনি নিরক্ষর ছিলেন না। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর ছিল। ছোট বেলায় চরকা কাটা তাঁর শখ ছিল। দেখতে সুশ্রী ছিলেন না বলে অবহেলা আর অনাদরে তিনি মানুষ হয়েছেন। ১৯১০ সালে তের বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় বরিশালের বাঁকাই জমিদার বাড়িতে। স্বামী চিন্তাহরণ বসুর দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে আসেন তিনি।

১৯২১ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষে। বরিশাল জেলার অতিক্ষুদ্র বাঁকাই গ্রামেও এ আহবান পৌছে। বাঁকাই গ্রামের জমিদার বাড়ির

Dhaka University Institutional Repository

কূলবধূ মনোরমাকেও আলোড়িত করে। বাঁকাই মহিলা সমিতির দৈনন্দিন কর্মসূচী তাঁর কাছে কেমন যেন নিস্প্রাণ, নিস্প্রভ ঠেকে। বাঁকাই গ্রামে আন্দোলনের ডাক পৌছালো কিন্তু সক্রিয় আন্দোলন গড়ে উঠছে না দেখে বিচলিত হন তিনি। হঠাৎ নিজের মধ্যেই তিনি এক নতুন রূপ আবিষ্কার করেন। তিনি তো ১৯০৫ সালের স্বদেশী আবহাওয়ার মানুষ।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে ৩রা ফেব্রুয়ারি হরতালের প্রচার করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং তার ছয় মাসের জেল ও ১৫০/- টাকা জরিমানা হয়। ১৯৩০ সালের লবন আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার ও কারাদন্ডিত হন সত্যাগ্রহী সরযুবালা গুপ্তা, সুনীতি বসু, কামিনী বসু ও প্রতিভা সেন। ১৯৩০ সালেই কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত সিলেটের শ্রীহট্ট মহিলা সংঘের সভানেত্রী জোবেদা খানম চৌধুরীর নেতৃত্বে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে শত শত নারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথে নামলে প্রায় ৬০ জন নারী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে কারাবরন করেন।

সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে বরিশালের বিশিষ্ট নেত্রী মনোরমা বসু বলেন, সাবেক বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত মেয়েরা আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দন্ডিত হয়েছেন তাদের সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে বহরমপুর জেলখানায়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্র ঘরের মেয়ে। উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময় দেবীর মতো প্রখ্যাত কংগ্রেস নেত্রীরাও আছেন। বিভিন্ন জেলার প্রায় পাঁচশ বন্দীনি এখানে আছেন।

এ জেলে থাকাকালে জেননা ফটকে এক বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন মনোরমা। বিতর্কের বিষয় ছিল ঃ "আমরা জেলখানায় এসে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি না লাভবান হয়েছি"। সাধারণ মেয়ে কয়েদীরাও এ বিতর্কে অংশ নেয়। মনোরমার কাছে

Dhaka University Institutional Repository

ট্রেনিং পাওয়াতে বিতর্কটি ভালই জমেছিল। মনোরমা বন্দিনীদের শোনাতেন ময়মনসিংহের হাজং কিষাণীদের সংগ্রামের কথা, নাচোলের কৃষকনেত্রী ইলা মিত্রের কথা, চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তের কথা। শুধু ইতিহাসের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি মনোরমা, জেলে মেয়েদের ওপর যে অত্যাচার হতো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করতেন। জেলে-জমাদার-সেপাই থেকে শুরু করে, সবাই তাঁকে 'মাসিমা' বলে ডাকতে শুরু করে এবং খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো।

পাকিস্তান স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ এর ৫ জুন বরিশালে খাদ্য আন্দোলনের সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর হাজতবাস হয়। এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পরে নিরাপত্তা বন্দীদশার পর ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পরে ২৫ শে এপ্রিল মুক্তি পান। ১৯৫৪ সালে ৯২ (ক) ধারার গভর্নর শাসন জারি হলে তার নামে আবার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয় এবং তিনি পলাতক জীবন যাপন করেন। প্রদেশে আওয়ামী-লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্যের সাথে তাঁদের উপর থেকেও গ্রেফতারী পরওয়ানা উঠে যায় এবং তিনি বরিশাল শহরে ফিরে এসে আবার গড়ে তোলেন মাতৃমন্দির ও আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সরলা বালা দেব

সিলেটের নারী আন্দোলন ও নারী জাগরণে প্রাণ সঞ্চারকারী সরলা বালা দেবের জন্ম ১৮৯২ সালে সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণের রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দেব চৌধুরী বংশে। অল্পবয়সে তাঁর বিয়ে হয় রমনমণি দেবের সাথে। রমনমণি দেব সিলেটের গহরপুর সংলগ্ন লতিবপুর গ্রামের ছেলে ছিলেন। ১৯১১ সালে ১৭ বৎসর বয়সে সরলা দেব বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সমাজ সেবা ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির সাথে যুক্ত করেন। ১৯২৬ সালে সিলেটে প্রতিষ্ঠিত নারী-শিল্প ভবনে তিনি যোগ দেন।

১৯৩০ সালের ৮ এপ্রিল 'বিদ্যাশ্রমের' পৃষ্ঠপোষকাতায় সিলেটে 'মহিলা সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংঘ প্রতিষ্ঠার পর তাঁকে সংঘের সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হয়। শহর ও গ্রামে এ সংঘের উদ্যোগে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও চরকা আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সরলাবালার নেতৃত্বে সিলেট শহরে বহু বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা হয়। হীরা প্রভা চৌধুরী, কনকলতা নাগ, শশীপ্রভা দেব, নরেশনন্দিনী দত্ত, সুহাসিনী দাস প্রমূখ এসব কাজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

তিনি ১৯৩১ সালের ২৮ জানুয়ারী একটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ও পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৩১ সালের ৯ মে তাঁর নেতৃত্বে সিলেট শহরে সুরমা উপত্যকা নারী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এ সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী। সভার উদ্বোধক ছিলেন শান্তি দাশ (শান্তি কবির), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন উর্মিলা দেবী ও ঢাকার আশালতা সেনসহ অনেকে এ সম্মেলনে যোগ দেন। এ সম্মেলনই ছিল সিলেটের নারীদের পরিচালিত প্রথম একটি বড় অনুষ্ঠান। এ সম্মেলনে নেতাজী সুভাষ বসুও যোগ দেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সরলাদেব অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ করার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। পরে আবার ১৯৩৪ সালে 'ভানুবিল প্রজা সত্যাগ্রহে' যোগ দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি সিলেট জেলার পরিচালক নির্বাচিত হন। ঐ সময় স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত ইত্যাদি বর্জনের এক বিরাট কর্মসূচী ছিল। এ কর্মসূচীটি

Dhaka University Institutional Repository

সফল পরিচালনার ভার ছিল তাঁর উপর। সে কারণে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়।

আশালতা সেন

১৮৯৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন আশালতা সেন। ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি গান্ধীজীর গ্রেফতারের পরে ঢাকাতে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ব্যাপকভাবে সভা-সমিতি দ্বারা প্রচারকার্য চলতে থাকে। সেই সময় আশালতা সেন শুধু ঢাকা শহরের নয় বিক্রমপুরের অনেক মহিলাকেও ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে এনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে থাকেন। ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সময় সত্যাগ্রহী সেবিকা দলের মহিলাদের উপর প্রায়ই লাঠিচার্জ করা হতো। ফলে ১৭ জন মহিলা আহত হন। তার মধ্যে কমলা দেবী, হেম্মলিনী গাঙ্গুলী ও সুনীতি বসুর আঘাত গুরুতর ছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা সভা-সমিতি করতেন ও চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন করতেন ; ফলে সরকার গ্রামবাসীদের মালামাল ক্রোক করতো। মালপত্র ক্রোকের দ্বারা সাধারণ গৃহস্থদের বহু ক্ষতি হলেও তারা তাতে বিচলিত হতেন না। তাছাড়া তারা ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ও ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করতেন, মদ, গাঁজা ও বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করতেন এবং সাইক্লোস্টাইল করে বে-আইনী প্রচার পত্র বিলি করতেন। আশলতা সেন ১৯৩২ সালের ৭ই মার্চ গ্রেফতার হন এবং দুটি মামলায় শাস্তি ভোগের পর ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। ঢাকার তালতলা অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে নিহত তরুণ যুবকদের জন্য আহুত এক শোক

Dhaka University Institutional Repository

সভায় সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তিনি অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীসহ গ্রেফতার হন এবং ৮ মাস কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

অরুনা আসফ আলী

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক পরিমন্ডল যখন সোচ্চার স্বাধীনতার দাবিতে, উত্তাল যুব সমাজ, সর্ব সাধারণের চোখে স্বপ্ন স্বাধীন আবাসের, সংকল্প শৃংখল ভাঙ্গার, তখনি জীবন্ত কিংবদন্তী রূপে আবির্ভূত হন অরুণা আসফ আলী। অরুণার নাম শুনলেই কেঁপে উঠত শাসক শ্রেণী। ব্রিটিশের ত্রাস, তেজস্বী যোদ্ধা, অসীম সাহসী এ নারী কালের প্রবাহে পরিচিতি পেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে।

অরুণা গাঙ্গুলী তথা অরুণা আসফ আলীর জন্ম ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে অবিভক্ত পাঞ্জাবে, এক প্রবাসী বাঙালী ব্রাহ্ম ঘরে। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয়।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহবানে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন অরুণা। এ আন্দোলন করার দায়ে তাঁকে যেতে হয় জেলে। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত কারাভোগ করেন তিনি। এই যে শুরু তারপর শুধু এগিয়ে যাওয়া। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে নিজেরই অজান্তে অরুণা এসে পৌছান ১৯৪২ সালের ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ আন্দোলনে। সে সময়কার রাজনীতিতে তিনি সংগঠক ও সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন উঠে আসে তুঙ্গে। এ আন্দোলনকে বিনষ্ট করার জন্য তৎপর হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। শীর্ষস্থানীয় সব নেতাই হন কারারুদ্ধ। কিন্তু নেতাদের অভাবে থেমে থাকেনা কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

ভারত ছাড় আন্দোলন শুরুর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার কথা জানতেন অরুণা। ভারতবর্ষের মোম্বাই শহরের বর্তমান ক্রান্তিময়দানে (পুরানো নাম ট্রাক ময়দান) কংগ্রেসের ঝান্ডা উড়াবেন কংগ্রেস নেতা আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না আজাদ। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সারা মাঠ জুড়ে প্রচন্ড উত্তেজনা, বিশৃংখলা। তারমধ্যে দেখা গেল ব্রিটিশের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দ্রুত বেগে পতাকা হাতে দৌড়ে চলছেন এক তরুণী। শুধু দৌড়িয়ে ক্ষান্ত হলেন না তিনি। ক্ষিপ্রতার সাথে মূহূর্তে উড়িয়ে দিলেন স্বাধীনতার ঝান্ডা। শুরু হয় গেল ভারত ছাড় আন্দোলন। ক্রান্তি কন্যা অরুণা তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। বেয়াল্লিশের অগ্নিকন্যা হিসেবে চলে এলেন খ্যাতির পাদ প্রদীপে। কোটি কোটি ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুললেন অরুণা। ভারত ছাড় আন্দোলন পরিণত হলো জঙ্গী গণ আন্দোলনে। এ ঘটনার পর নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় কংগ্রেস। হুলিয়া জারি হয় অরুণার উপর। দশ হাজার রূপী মূল্য ধরা হয় তাঁর মাথার। বাজেয়াপ্ত হয় তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পদ। অরুণা চলে যান আড়ালে। শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ পলাতক জীবন। হন্যে হয়ে পুলিশ ঘোরে অরুনার খোঁজে। পুলিশের নাকের ডগায় বসে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রাণবন্ত ও সজীব রাখার জন্য প্রচার, লিফলেট ও পুস্তিকা প্রকাশনার কাজ রাখেন অব্যাহত। চলে গণ সংযোগ। ১৯৪৪ সালে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পনের অনুরোধ করেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধকে উপেক্ষা করেন তিনি। পরে অবশ্য মুক্ত রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা দত্ত

১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে কল্পনা জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বিনোদবিহারী দত্ত ও মাতা শোভনাবালা দত্ত। কল্পনা দত্তের ঠাকুরদা ডাক্তার দূর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে তাদের বাড়িটা পুলিশের নজর থেকে বহুদিন নিরাপদ ছিল। ১৯২৯ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন করে মাস্টারদা, তখনো মাস্টারদার সঙ্গে কল্পনা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিপ্লবী কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য। তার কয়েকদিন পরে তিনি চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং তিনি বিপ্লবী মনোরঞ্জন রায়ের মারফত সূর্যসেনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রশস্ত্র ও গোপন জিনিস তিনি নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন।১৯৩০ সালের শেষের দিকে অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ প্রমূখ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুর্ষ্ঠনের অনেক বীর নায়ক গ্রেফতার হয়ে চট্টগ্রাম জেলের হাজতে ছিলেন। তারা জেলের ভিতরে ও বাইরে বহু স্থানে ডিনামাইট বসিয়ে নানা জায়গা উড়িয়ে দিয়ে জেলের বন্দীদের মুক্ত করতেন এবং চট্টগ্রামের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টকে আক্রমনের পরিকল্পনা করতে থাকেন। এই ডিনামাইট অভিযানে কল্পনা দত্ত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। কল্পনা দত্ত কলকাতা থেকে বোমা তৈরি করার মালমশলা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং চট্টগ্রামের বাড়িতে বসে গান তৈরি করতে থাকেন। সেগুলি চলে যেতো জেলের ভিতরে। এই সময় চট্টগ্রাম জেলে অনন্ত সিং প্রমুখের সঙ্গে মাস্টারদার যোগাযোগ হতো কল্পনা দত্তের মাধ্যমে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তকে দিয়ে মাষ্টারদা পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ কাজের এক সপ্তাহ পূর্বে পুলিশ কল্পনা দত্তকে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার করে। পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমনের প্রস্তুতির জন্য কল্পনাকে মাস্টারদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যে পথ দিয়ে তার কাছে যেতে হবে সেই এলাকায় একটি মেয়ের পক্ষে একা যাওয়া তখন নিরাপদ ছিলনা। সেজন্য কল্পনা পুরুষের বেশে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হন। কিন্তু পথে এ বেশেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। একমাস পরে পুলিশ কোন কিছু প্রমাণ না পেয়ে তাঁকে জামিনে খালাস দেয়। মামলা ছিল '১০৯ ধারার' ভ্যাগাবন্ড কেস।

তিনি যখন মাস্টারদার সঙ্গে গৈরালাতে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে পলাতক ছিলেন তখন ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী হঠাৎ মিলিটারি এসে রাত্রে সেই বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। মিলিটারি বাড়ি ঘেরাও করেছে টের পেয়েই বিপ্লবীরা পালিয়ে যাবার জন্য সর্ন্তপনে এগিয়ে যান। মিলিটারি লোকেরা ইলুমিনেটিং বোমা ছুড়ে দিবালোকের মতো আলো করে ফেলে বিপ্লবীদের দেখতে পায়। গুলি বর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ করে বাঁশঝোপের মধ্যে অবস্থানকারী বিপ্লবী বীর সূর্যসেন ও ব্রজেন সেনকে তারা ধরে ফেলে। কল্পনা দত্ত বহু কষ্টে মিলিটারির তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালের ১৯ মে অতিভোরে মিলিটারির হাতে অন্যান্য বিপ্লবীর সাথে কল্পনা দত্ত গ্রেফতার হন। মিলিটারি সুবেদার কল্পনা দত্তকে চপোটাঘাত করে। তাঁদের গ্রেফতার করে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার পথে অন্য ছেলেদের মতো কল্পনা দত্তকে ও হাতে হাতকড়া লাগিয়ে এবং কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। এই মামলার নাম ছিল 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি কেস'। কল্পনা দত্ত প্রায় ছয় বছর জেলে থাকার পর মুক্তি পান ১৯৩৯ সালের মে মাসে।

Dhaka University Institutional Repository

হোসনে আরা

কবি হোসনে আরার জন্ম ১৯১৬ সালের ৮ জুলাই শবেবরাতের দিনে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়া থানাধীন পেয়ারা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ এবং মাতার নাম হালিমা খাতুন। হোসনে আরার পিতা প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর অগ্রজ। মুন্সি মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ পেশাগত জীবনে একজন সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন। এছাড়াও পুঁথি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আলাদা একটা পরিচয়ও ছিল। ১৩১৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন তাঁর লেখা একটি পুঁথি প্রকাশিত হয়।

১৯৩২ সালে তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেন। শহরে আসার পর স্বামীর প্রভাবে রাজনীতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালের ২৫ জানুয়ারী সকালবেলা কংগ্রেস কর্মী জালালউদ্দিন হাশমীর কাছে খবর পান যে, ২৬ জানুয়ারী কলকাতা ময়দানে অধ্যাপিকা জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হওয়াতে কংগ্রেসের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য হোসনে আরাকে সে সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে এবং একটি ভাষণও দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

স্বামীর অনুমতি নিয়ে পরদিন তিনি কোলকাতা ময়দানে সমবেত জনতার সামনে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। এ বক্তব্য প্রদানের কারণে তিনি ব্রিটিশ রাজের কোপানলে পড়েন। বক্তব্য শেষ হবার আগেই তাঁকে পুলিশ ভ্যানে তুলে লালবাজার পুলিশ সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। লালবাগ থেকে তাঁকে কোলকাতা সেন্ট্রাল জেলে অন্তঃরীণ রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলীপুর জেল থেকে পরবর্তীতে হিজলী জেল ও বহরমপুর জেলে তাঁকে আটক থাকতে হয়। হোসনে আরার গ্রেপ্তারের খবর কোলকাতার পত্রিকায় খুব ফলাও করে ছাপা হয়। সব পত্রিকায় তাঁর পরিচয় দেয়া হয় ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভ্রাতুস্পুত্রী হিসেবে। হোসনে আরার গ্রেপ্তারের বিষয়টিকে তাঁর পিতৃকূলের আত্মীয় স্বজনরা খুব একটা ভালো চোখে দেখেননি। কেননা সে যুগে একটি মুসলমান মেয়ের কারাবরণকে পরিবারের মর্যাদাহানি বলে মনে করা হয়েছিল।

কারাগারে এসে হোসনে আরা তাঁর পূর্ব পরিচিত অনেককে পান। এদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপিকা জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন উর্মিলা দেবী। বিপ্লবী বীণা দাশের বড়বোন কল্যাণীদাশ, কুমিল্লার ষ্টিভেন্স হত্যা মামলার আসামী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী, ঔপন্যাসিক প্রবোধ সান্যালের ভাগ্নি নলিনী মৈত্র এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের বোন যমান ঘোষ। এরা সকলে তাঁকে জেলে খুব খাতির যত্ন করতেন। বিদ্যা চর্চা করাতেন। অল্প কিছুদিন পর তাঁকে মেদিনীপুরের হিজলী মহিলা স্পেশাল জেলে বদলি করা হয়। পরে হিজলী থেকে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। ১৯৩২ সালের জুন মাসে ছয় মাসের সাজা শেষে বহরমপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি নেতাজী সুভাষ বসুর লেখা একটি চিঠি পান। সে চিঠিতে নেতাজী তাঁকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্যে অভিনন্দন জানান। হোসনে আরা প্রথম মুসলিম নারী যিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং জেলে যান।

Dhaka University Institutional Repository

থানা হেফাজতে হেলেনা দত্ত

ব্রিটিশ বিরোধী ও নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী বিপ্লবী নেতা লীলা নাগের অসংখ্য অনুসারির যে কয়জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন হেলেনা দত্ত তাদের অন্যতম। তৎকালীন ঢাকা জেলার কালীগঞ্জের ভাওয়ালে পৈত্রিক বাড়ীতে ১৯১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর হেলেনা দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঐ সময় ঢাকা জেলায় বিপ্লবীদের ধর পাকড় শুরু হয়ে যায়। হেলেনা দত্ত বিপ্লবীদের রিভলবার ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন। ১৯৩২ সালে বিপ্লবীদের দ্বারা একটি সফল ট্রেন ডাকাতি হয়। পরে জেনারেল পোস্ট অফিসে ডাকাতি হয়। এই ডাকাতি মামলায় সুনীল দাসকে লালবাগ থানায় ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে মেরে ফেলে ১৯৩২ সালের ১৭ই জুলাই। এই ঘটনা হেলেনা দত্তকে বিপ্লবী কর্মকান্ডে আরো উৎসাহ যোগায় এবং তার মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জেগে ওঠে। এর পর হেলেনা দত্ত কলকাতা যান অস্ত্র আনার জন্য। উপেন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটি রিভলবার নিয়ে ঢাকাতে সুধীর দত্তকে দেন। পরবর্তীকালে আবার একটা রিভলবার আনতে গিয়ে ১৯৩৩ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এরপর বরাহনগর থানায় একদিন ও লালবাজারে তের দিন থাকার পর ২৮ ফেব্রুয়ারী তাকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাড়ে তিন মাস পর তাকে হিজলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ বছর জেলে থাকার পর ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান।

১৯৪২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আবার দানা বেঁধে ওঠে। হেলেনা দত্ত ঐ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি তখন আত্মগোপনে থেকে আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন, তিন চার মাস পলাতক অবস্থায় ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় গ্রেফতার হন। এবার তাঁকে ঢাকা জেলে নেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমল

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর তেভাগা, নানকার, টংক প্রভৃতি আন্দোলনে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। অনেক অঞ্চলে গোটা গ্রামীণ জনপদ জেগে উঠেছিলো যুগ যুগের শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে। নারী ও পুরুষ এর সমান অংশীদার ছিল এর আগে প্রধানত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই নারী সমাজকে সক্রিয় দেখা গেছে। এতে যারা অংশ নেন, তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল পরিবারের। তাঁদের বেশিরভাগ আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ নারীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ভারত ত্যাগের প্রাককালে, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় বিস্ফোরিত হয়েছিল এক গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বিদ্রোহ। যাদের স্মৃতিতে এবং জঠরে তখনো ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের বেশ পুরানো হয়নি, বাংলার সেই কৃষিজীবী মানুষ তাদের সমস্ত আলস্য ও শাসনভীতি ছুঁড়ে ফেলে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামীণ ভদ্রলোক অর্থাৎ জোতদারের ভূমিদাসে পরিণত করা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে তারা ফসলের বর্দ্ধিত ভাগ দাবী করেছিল। আর সেই দাবীকে কার্যকর করতে সংঘটিত হল তেভাগা অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের লড়াই।

অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে এর নেতৃত্ব দিয়েছিল গ্রামীণ দরিদ্র রমনীরা, যারা আন্দোলনে অর্জিত ফলকে রক্ষা করতে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়ন প্রতিরোধ করতে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিল। তেভাগার অনন্য ঘটনা হল মহিলাদের (স্বতঃস্ফুর্ত) জঙ্গী বাহিনী গঠন, যার নাম ছিল "নারী বাহিনী"।

Dhaka University Institutional Repository

তেভাগা আন্দোলন গ্রেফতার ও পুলিশি হেফাজত

১৯৪৫ সালে তেভাগা আন্দোলনের শুরু থেকেই বাংলার নারীরা জমিদার জোতদার এবং পুলিশের সাথে সংগ্রাম করে। ১৯৪৬ সালে ঠাকুরগাঁয়ের বহু কৃষককে পুলিশ গ্রেফতার করে অমানবিক নির্যাতন চালায়। পুলিশী আক্রমনে যাতে পুরুষ কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য শত শত নারী কৃষকের সামনে থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছে। অনেক নারী লাঠি হাতে বটি হাতে পর্যন্ত পুলিশকে তাড়া করে।

১৯৪৮-৪৯ সালে কৃষক আন্দোলনের নেতা রমেন মিত্র এবং ইলামিত্রের নেতৃত্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে তেভাগা আন্দোলনে রাজশাহীর সাঁওতাল মহিলারা যোগদান করেন। এ আন্দোলনে সাওতাল নারীরা ব্যাপক পুলিশি গ্রেফতার ও পুলিশি হেফাজতে নৃশংস জেল জুলুমের শিকার হন।

মহিলাদের গণ অংশগ্রহণ বাংলায় বিশেষভাবে ব্যাপক হয়েছিল। এ ঘটনার যথার্থ নিরুপনের জন্য শুধু কংগ্রেস পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনেরই নয়, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি যে সমস্ত আন্দোলনের সুত্রপাত ও পরিচালনা করেছিল সেগুলোরও যথাযথ পর্যালোচনা করা আবশ্যক। বাংলার অত্যাচারিত রমনীকুলের সংগঠন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল চল্লিশের দশকে, তুলনাহীন দুর্ভিক্ষের আগে ও পরে। বাংলার সমাজ যে সময়ে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখনই গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা সমাজ ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মানব মুক্তির পতাকার অদ্বিতীয় ধারক ও বাহক রুপে।

প্রথমতঃ অত্যাচারিত বাঙ্গালী রমনীকূল ১৯৪২-৪৩ এর কৃত্রিম খাদ্যাভাবে বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন যা ইতিহাসে প্রায়শই ঘটতে দেখা গেছে। পশ্চিমে বা তৃতীয় বিশ্বে-পৃথিবীর সর্বত্রই মহিলারা খাদ্যাভাবে সময়ে খাদ্য

Dhaka University Institutional Repository

শস্য এবং চালের মজুতদারী ও রপ্তানীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আন্দোলনমূখী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ তেভাগা চলাকালীন ঘটেছিল একটি ঘটনা পরম্পরাগত পরিবর্তন। ইতিপূর্বে যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের জাগরন ঘটে থাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে তবে তেভাগার সময় জেগে ওঠে ছিলেন চরম নিপীড়িত রমনীরা, যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একইসাথে সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতা উভয় বিরোধী গ্রামীণ বিদ্রোহের অত্যন্ত সাহসী ও সুযোগ্য নেতৃত্বের আসনে। শ্রেণীগত নেতৃত্বের নিরিখে মহিলা প্রতিরোধের ইতিহাসে এই তেভাগা হল সর্বোচ্চ শিখর।

উত্তরাঞ্চলে তিন জেলা জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর আর রংপুরের বিভন্ন অঞ্চল থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিন মাসের মধ্যে আন্দোলন প্রচন্ড আকার ধারণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে সময়ে বাংলায় তেভাগার জন্য সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছিল সেই একই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য এক অংশে আরেকটি গ্রামীণ কৃষি সংগ্রাম বিস্ফোরিত হয়েছিল নিদারুন প্রখরতায়। অঞ্চলটি হল প্রাক্তন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গনা। এখানেও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বর্গাদার, ক্ষেতমজুর ও নারীরা সামন্ততান্ত্রিক শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য তেলেঙ্গানায় কোন নারী বাহিনী ছিল না এবং এই বিচারে তেলেঙ্গানার শ্রেণী উত্তরন বাংলার মত সুদূরপ্রসারী হয়নি। তাদের তেভাগার বোনদের মত তেলেঙ্গানার মেয়েরাও পুলিশ ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তেলেঙ্গানার বহু নারী' তাদের বাঙ্গালী বোনদের মত, শহীদত্ব বরণ করেছে যা সংগ্রামে নিহত অথবা অত্যাচারে প্রাণ দেওয়া অসংখ্য বীর রমনীর কাহিনীতে প্রতিফলিত। এমনই এক বীরাঙ্গনা ছিল পাথর কাটিয়ে নাগাম্মা যে মাল্লারেড্ডিগুড়ম নামক স্থানে এক দীর্ঘস্থায়ী গণসংঘর্ষের সময় পাথর বওয়ার কাজ করতে করতে নিহত হয়। আরো আছে লাছাম্মা নামে এক রজকিনীর কাহিনী যাকে উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে লাঠি আর গাছের ডাল দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো সত্ত্বেও তার মুখ থেকে আত্মগোপনকারী কর্মীদের সম্বন্ধে একটাও কথা বের করা যায়নি। এছাড়া আছে নেরেদা গ্রামের ৭০ জন রমনীকে গিরগিটির সাহায্যে অত্যাচারের জঘন্য বর্বর ঘটনা। ভাল খাবারের দাবীতে দেড়শ জন নারী বন্দীকে অনশনে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে রামবায়াম্মাকে চাবুক মেরে হত্যা করা হয়েছিল। তেলেঙ্গানা বিদ্রোহে আত্মবলি দিয়েছিল অসংখ্য রমনী। সামরিক বাহিনী দ্বারা ধর্ষনের বিরুদ্ধে অসম সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাফল্যের জন্যই সম্ভবতঃ তেলেঙ্গানার নারীরা প্রথম খ্যাতি অর্জন করে। শুধু রাজাকাররাই নয়, ১৯৪৮ এর পরবর্তী সময়ে হায়দ্রাবাদে হস্তক্ষেপকারী ভারতীয় বাহিনীও বিদ্রোহী কৃষকদের শায়েস্তা করার নিষ্ঠুরতম হাতিয়ার হিসেবে ধর্ষণকে বেছে নিয়েছিল। ১৯৫১ পর্যন্ত তিন বছরে একশরও বেশী নারী বর্বরোচিত ধর্ষণের ফলে প্রাণ হারায়। মাগারাম নামে একটা জায়গায় কংগ্রেসী দালালদের আঙ্গুলী নির্দেশে ধরা এক নারীকে ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করার পর রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। গণধর্ষণের খবর ছিল অসংখ্য। যে সব গ্রামে বা কেন্দ্রে পুলিশ কিংবা সামরিক বাহিনী শিবির স্থাপন করত তার প্রত্যেকটাতে গণধর্ষণ তথা গায়ের জোরে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করানোটা ছিল নিতান্তই মামুলি ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামী কৃষক রমণীদের উপর পুলিশি বর্বর আক্রমন

তেভাগা আন্দোলনে কৃষক রমণীদের গভীর সম্পৃক্তিতে শাসক শ্রেণীর পুলিশ বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মহিলাদের উপর নির্মম দমন নিপীড়ন চালায়। মহিলাদের উপর এই অমানুষিক আক্রমন ও অত্যাচারের খবর তখন পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।তৎকালীন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নির্যাতনের কিছু খবর :

- ময়মনসিংহ জেলার সুসং এর জিগাতলা গ্রামে পুলিশের আক্রমনে বহু কৃষক মেয়ে আহত হন। রামেশ্বর হাজং এর স্ত্রী গুরুতর আহত হন ও তার ৩ মাসের শিশু প্রহারের ফলে মারা যায়।
- ৩১ জানুয়ারী (১৯৪৭) ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার বাহেরতলি গ্রামে মেয়েদের উপর পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করে। হাজং মেয়ে কুমুদিনীকে প্রকাশ্যে গ্রামের পথে মারপিট করা হয়। কুমুদিনীর কাঁধের উপর বন্দুক রেখে পুলিশ গুলি চালালে বৃদ্ধা রাসমনি নিহত হন।
- দিনাজপুরের চিরিরবন্দর থানার তালপুকুরে গুলি চালাবার দিন পুলিশ গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঢুকে মেয়েদের উপর আক্রমন চালায়। মুন্সী লাল মুহম্মদের স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে।
- নিহত শহীদ সমিরুদ্দিনের স্ত্রী, রাজমোহনের স্ত্রী এবং বৃদ্ধা ও অল্প বয়স্ক মহিলাদের শরীরে বেয়নেটের খোঁচা দেওয়া হয়।
- সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার কেন্দমারী গ্রামে এবং পাঁশকুড়ার চকদুর্গাপুর ও কলাগেছিয়া গ্রামে বহু স্ত্রীলোকের গহনাপত্র নিয়ে অমানুষিক মারপিট করে।

Dhaka University Institutional Repository

- ১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) মালদা জেলার কনোট গ্রামে হানা দিয়ে পুলিশ মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায় এবং জনৈকা বৃদ্ধাকে এমনভাবে মারধর করে যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে যান ও পরে মারা যান।
- কাকদ্বীপ (২৪ পরগণা), ৪ঠা এপ্রিল সুন্দরবন অঞ্চলের লয়ালগঞ্জ ও হরিপুর হইতে পুলিশ ও জোতদারদের গুন্ডাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী পাওয়া যাইতেছে। নেতাকর্মীদের খোঁজ না দেওয়ায় পুলিশ ঘর থেকে মহিলাদের টেনে বার করছে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে ঘন্টার পর ঘন্টা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করিয়ে তামাসা দেখছে। বিবস্ত্র অবস্থাতেই জানকী দাসী ও তারিণী দাসীকে বেত মারা হয়। উভয়েই অজ্ঞান হয়ে যান । ভূষণ মাইতির স্ত্রীর উপরও এইভাবে নিপীড়ন চলে। কোথাও কোথাও রাত্রিকালে হানা দিয়ে কৃষক রমণীদের বিবস্ত্র করা হয় এবং নগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর টর্চের আলো ফেলিয়া পাষন্ডের দল বিকৃত লালসা চরিতার্থ করে।
- আবদুলাহ রসুলের কৃষক সভার ইতিহাস মারফৎ জানা যায় যে তেভাগা আন্দোলন দমনের নামে পুলিশ ২৪ পরগণা, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় নারী ধর্ষণ করে। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সমগ্র তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনে অর্ধশতাধিক কৃষক রমণী শহীদ হন।

বিমলা মাজির বীরত্বগাথা

মেদেনীপুর জেলার বিমলা মজি সেই সব রমনীদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যারা তেভাগা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসছিল। বিমলার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় মন্বন্তরের শেষ পর্বে যখন সে মহিলা সংগঠক মনিকুন্তলা সেনের সঙ্গে তার অঞ্চলের গ্রামগুলি

Dhaka University Institutional Repository

পরিদর্শনে গিয়েছিল। ত্রাণ (দুগ্ধ কেন্দ্র) ও পুনর্বাসনের মাধ্যামে স্থানীয় মহিলা সমিতি গড়ে তোলার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। পরে বিমলাকে কম্যুনিস্ট পার্টি অন্য কয়েকজন পুরুষ ক্যাডারের সঙ্গে তারই জেলার নন্দীগ্রামে পাঠিয়েছিল। এখানে তার দায়িত্ব ছিল তেভাগার জন্য মেয়েদের জাগানো।

ঐতিহ্যের ভার কাটিয়ে মেয়েরা অত্যন্ত দ্রুত সংগঠিত হয়েছিল। নদীর তীরে অবস্থিত কেদেমারি নামে এক গ্রামে তারা প্রথম মিছিল করে। মিছিলে ছিল ফেস্টুন আর আওয়াজ ছিল- "হিন্দু, মুসলিম ভাই ভাই", "আমাদের দাবী রসীদের ওপর ভিত্তি করে তেভাগা;" "রসীদ ছাড়া আমরা আমাদের ধান দেব না।" উপরন্তু এই নন্দীগ্রামে মেয়েরা লাল ঝাঁন্ডা, ঝাঁটা আর লঙ্কার গুঁড়ো অস্ত্র করে ধান কেটে নেয় আর দশ-পনেরটা গ্রামের ধান একটা যৌথ সমবাইতে তুলে রাখে। ইতিমধ্যে, আন্দোলনের নেতাদের খুঁজে বের করতে পুলিশ গ্রামে জোর তল্লাসী শুরু করলে বিমলাকে আত্মগোপন করতে হয়। তার নিজের ও গ্রামের অন্য মেয়েদের কৌশলের সাহায্যে বিমলা বার বার গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়।

পুলিশের নজর এড়িয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে অবশেষে বিমলা মাজি পুলিশের জালে ধরা পরে এমন একটা গ্রামে যেখানকার ভৌগলিক অবস্থা পালানোর পক্ষে সহায়ক ছিল না। যে বাড়ীতে বিমলা লুকিয়ে ছিল সেখানে ঢুকে পুলিশ তাকে মশারীর ভেতর থেকে টেনে বের করে এবং মারতে শুরু করে। একমাস বিমলাকে একটা খাঁচায় রাখা হয়েছিল। বিমলার নামে ১৪০ টা মামলা ছিল। উপমহাদেশে ভাগ হবার বহু পরে বিমলার দীর্ঘ আড়াই বছরের কারাবাস শেষ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তেভাগা আন্দোলন এবং পুলিশ হেফাজতে ইলা মিত্র (১৯৪৮-১৯৪৯

বাংলাদেশের কিংবদন্তী নারী, বিপ্লবী চেতনার প্রতীক, নাচোলের মাঠে, কৃষকের ঘরে মূর্তিমতি রাণী মা, জোতদারের ত্রাস, মুসলিম লীগ সরকারের চক্ষুশূল বাঙালীর গর্ব ইলামিত্র ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নগেন্দ্র নাথ সেন। ১৯৪৪ সালে ইলা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তেভাগা দাবিতে উত্তরবঙ্গে আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে আসছিল ঠিক সেই সময় (১৯৪৬-৪৮) রাজশাহীর নাচোলে সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান ভাগচাষীদের আন্দোলন তীব্র বিদ্রোহের রূপ নেয়। এ আন্দোলন ১৯৪৬-৪৭ সালে দানা বাঁধে। নাচোল কৃষক আন্দোলনের সাথে ইলামিত্র ও তাঁর স্বামী রমেন মিত্র উভয়েই জড়িত হন এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে তাঁদের দুজনের যৌথ নেতৃত্বে সাঁওতাল অধ্যুষিত নাচোল থানার চন্ডীপুরগ্রামে এ কৃষাণ আন্দোলনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। নাচোল হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি থানা। নাচোল থানা তেভাগা আন্দোলনের জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ইলা মিত্র এ আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যান এবং অনেক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সহায়তা করেন। ১৯৪৬-১৯৪৭ এর দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোর, খুলনা, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মালদহসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এ আন্দোলন। নাচোল আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শাসক গোষ্ঠীর নজর পড়ে এবং হস্তক্ষেপ শুরু হয়। পুলিশ কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য গ্রেফতার পদ্ধতিকে বেছে নেয়। কৃষকের ঘর জ্বালিয়ে দেয়। ১৫০ জনের অধিক কৃষককে গুলি হত্যা করা হয়। পুলিশী নির্যাতন চরমে উঠলে পর ইলামিত্র আত্মগোপন করেন এবং গোপনে

Dhaka University Institutional Repository

কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে এবং ৫০ সালের শুরুর দিকে নাচোল একেবারে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১৯৪৮ সালের মে মাস থেকে পুলিশ জমিদার যৌথভাবে গ্রামে গ্রামে উৎপীড়ন শুরু করে। তেভাগা আন্দোলন বন্ধ করার জন্য পুলিশ বাহিনী শুরু করলো নতুন ধরনের নির্যাতন। এর পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি সকাল নয়টার নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ও তিনজন কনস্টেবল নাচোলের কেন্দুয়া ও ঘেচুয়া গ্রামে টহল ও সালামী আদায় করতে আসে। তেভাগা আন্দোলনের নেতার খোঁজ না পেয়ে পুলিশ কৃষক সুরেন বর্মনের বাড়ি যায় ও তাকে তেভাগাবন্টন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পেটাতে থাকলে এলাকার অতীষ্ট জনগণ মারমুখো হয়ে ওঠে। এদিকে সংকেত পেয়ে হাজার হাজার নারী, পুরুষ তীর ধনুক বল্লম নিয়ে সুরেন বর্মনের বাড়ি গিয়ে পুলিশদের ঘিরে ফেলে এবং দারোগা-পুলিশসহ ৩ জনকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ফলে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ সরকার তেভাগা আন্দোলন নির্মূল করার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ দিয়ে নাচোল এলাকার মানুষদের উপর অত্যাচার ও খুনের স্টিম রোলার চালায়। গ্রামবাসীদের গুলি করে ও পিটিয়ে হত্যা করে। ইলা মিত্র ও বৃন্দাবন সাহাসহ অন্যান্য নেতা সাওতাল কৃষক গ্রাম ত্যাগ করে সীমান্ত পার হবার জন্য যাত্রা করেন সাত জানুয়ারি।

ইলা মিত্র সাঁওতালদের মতো পোশাক পরলেও এবং তাদের মতো কথা বললেও পুলিশ চিনে ফেলে। ইলা মিত্র ও বৃন্দাবন সাহাকে গ্রেফতার করে। এরপর চলে ইলামিত্র সহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃত কৃষক নেতা কর্মীদের উপর বর্বর অমানুষিক নির্যাতন, অনেক নেতা কর্মী নাচোল থানায় অত্যাচার নির্যাতনে শহীদ হন।

Dhaka University Institutional Repository

থানায় ইলা মিত্রকে সনাক্ত করা হয়। শারীরিক নির্যাতনের পর তাঁকে থানায় বারান্দায় বসিয়ে রাখা হয়। নাচোল থানায় ইলা মিত্রকে চারদিন রাখা হয়। তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়। প্রচন্ড জ্বর ও রক্তাক্ত অবস্থায় ইলা মিত্রকে নবাবগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিপাইরা তাঁকে জোর ঘুষি মেরে অভ্যর্থনা জানায়। নবাবগঞ্জ থানায় ইলা মিত্রকে ৭ দিন রাখা হয়। ওই থানার ওসি রহমান সাহেব তাঁর পূর্ব পরিচিত ছিলেন। ইলা মিত্রের শারীরিক অবস্থা ও রক্তক্ষরণ দেখে রাতের বেলা সবার অলক্ষ্যে সেলে ঢুকে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতেন। মূলতঃ ওসি সাহেবের কারণে নবাবগঞ্জ থানার অত্যাচার তাঁর উপর খুব একটা বাড়েনি। ১০৫ ডিগ্রী জ্বর গায়ে তাঁকে আনা হয় নবাবগঞ্জ থানার সেলে। এখানে ডাঃ আইয়ুব আলী তাঁর চিকিৎসা করেন। ১১ জানুয়ারী একজন নার্স তাঁকে পরীক্ষা করে। তাঁকে ওষুধ ও কম্বলের টুকরো দেওয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও প্রচন্ড জ্বরের কারণে বার বার তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হতে থাকে। এ অবস্থার মাঝে ১৬ জানুয়ারী তাঁর ওপর পুলিশী নির্যাতন চলে এবং থানার সেল থেকে বের করে এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পুলিশের তৈরি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে সই দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়।

অর্ধচেতন অবস্থায় পুলিশ জোর করে তাঁর সই নেয়। সই নেওয়ার পর তাঁকে পুনরায় থানার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইলা মিত্রের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে পরে নবাবপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু এখানে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়াতে রাজশাহীর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫০ সালের ২১ জানুয়ারী ইলা মিত্রকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর কর হয়। সেখানে নির্জন অন্ধকার সেলে তাঁকে একাকী রাখা হয়। ঘরটিতে শুধু শোবার মত স্থান ছিল। সে ঘরের একপাশে একটি ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়ে বড় জেলঘরে নারী রাজবন্দী ও

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ নারী বন্দীদের দেখা যেত বলে সেই ফুটোটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রায় একবছর অসুস্থ অবস্থায় ইলামিত্র ওই নির্জন সেলে একাকী আটক ছিলেন। কারো সাথে কথা বলা বা দেখা সাক্ষাতের কোন উপায় ছিলনা। জেলের ডাক্তার ইলা মিত্রের পূর্ব পরিচিত হওয়াতে ব্যক্তিগত সহানুভূতি তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ সময় জেলে সিকিউরিটিপ প্রিজনার্স রুল' বাতিলের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী সব রাজবন্দীরা এক যোগে আন্দোলনে নামেন।

আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ আমলে কারাগারে রাজবন্দীদের বিশেষ মর্যাদা দিতে ব্রিটিশরা বাধ্য হয়েছিল। বহু কষ্ট ও সংগ্রাম করে বন্দীরা এ মর্যাদা আদায় করেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদা তুলে নিয়ে তাদের সাথে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মত আচরণ করা হত। ১৯৪০ সালের সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুল- বাতিল হয়। রাজবন্দীদের শেষে শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের সব ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে নাচোলের পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত মামলাটি রাজশাহীর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ মিয়ার কোর্টে ওঠে। এ মামলায় ইলা মিত্রসহ মোট ৩১ জন আসামী ছিলেন। পাকিস্তানের পেনাল কোডের ৩৪, ১৪৮, ৩০২, ১৪৯ ও ৩৩৩ ধারা মতে ইলা মিত্র সহ ২০ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। মামলা পরিচালনার জন্য ইলার পক্ষে উদ্যোগ নেন তাঁর স্বামী রমেন মিত্র। এ মামলার কাগজপত্র তৈরি হয় আইনজীবি মন্মথ বাবুর সহযোগিতায়। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এস.এ. ডাঙ্গের আইন সহায়তা তহবিল থেকে মামলার চালানোর জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫০০ টাকা সাহায্য হিসেবে মিলে। এ সময় মামলা পরিচালনা করেন রাজশাহীর এ্যাডভোকেট বীরেন

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ও তাঁর সহকর্মীরা। এ মামলা উপলক্ষে ইলা মিত্র যে জবানবন্দী কোর্টে দিয়েছিলেন তা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ইশতেহার আকারে ছাপিয়ে বিলি করা হয়। এ জবানবন্দী থেকে দেশের সাধারণ মানুষ পুলিশী নৃশংসতার কথা জানতে পারে।

রাজশাহী জেলে ইলামিত্রের জবানবন্দী

কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি নির্দোষ।

বিগত ০৭/০১/১৯৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল থানা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে পাহারাদার পুলিশরা আমার ওপর অত্যাচার করে। নাচোলে ওরা আমাকে একটা সেলের মধ্যে রাখে। সেখানে একজন পুলিশের দারোগা আমাকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, হত্যাকান্ড সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি যদি না করি, তাহলে ওরা আমাকে উলঙ্গ করবে। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার পরনের সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সেলের মধ্যে আটকে রাখে। আমাকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। এমন কি এক বিন্দু জলও না এদিন সন্ধ্যায় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এস.আই.এর উপস্থিতিতে সিপাইরা এসে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর ওরা আমার পরনের কাপড় চোপড় ফেরৎ দেয়। রাত প্রায় বারোটার সময় আমাকে বের করে সম্ভবত এস.আই. এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে যে কামরায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ওরা নৃশংস ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ওরা আমার পা দুটোকে লাঠির মধ্যে রেখে ক্রমাগতভাবে চাপ দিতে শুরু করে। ওদের ভাষায় আমার বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানী ইনজেকশন' পন্থায় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। এ ধরনের অত্যাচার চলার সময় ওরা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল এবং আমার চুল ধরেও টান দিচ্ছিল। কিন্তু আমাকে দিয়ে জোরপুর্বক কিছুই বলাতে সক্ষম হয়নি। এতসব অত্যাচারের দরুণ আমার পক্ষে আর হেঁটে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে নিয়ে গেল। এবার পুলিশের সেই দারোগা সিপাহীদের ৪টা গরম ডিম আনার নির্দেশ দিয়ে বলল যে, এবার মেয়েটাকে কথা বলতেই হবে। তারপর শুরু হলো নতুন ধরনের অত্যাচার। ৪/৫ জন সিপাহী মিলে জোর করে আমাকে চিৎ করে শুতে বাধ্য করল এবং ওদের একজন আমার গোপন অঙ্গ দিয়ে একটা গরম ডিম ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সে এক ভয়াবহ জ্বালা। প্রতিটি মূহূর্তে অনুভব করলাম, আমার দেহের ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী সকালে আমার জ্ঞান ফিলে এলো। একটু পরে জনা কয়েক পুলিশ সঙ্গে করে আবার সেই দারোগার আগমন ঘটে । সেলে ঢুকেই সে আমার তলপেটে বুট দিয়ে প্রচন্ড জোরে লাথি মারে। আমি দারুণ ব্যথায় কুঁকড়ে গেলাম। এরপর ওরা জোর করে আমার ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দিল। আমি তখন অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছি। কোনরকম স্বীকারোক্তি না পেয়ে দারোগা তখন রাগে অগ্নিশর্মা। যাওয়ার আগে বলে গেল, আমরা আবার রাতে আসব। তখন তুমি স্বীকারোক্তি না দিলে, একের পর এক সিপাহী তোমাকে ধর্ষণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গভীর রাতে দারোগা আর সিপাহীরা আবার এলো এবং আবারো আমাকে হুমকি দিল স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি তখনও কিছু বলতে অস্বীকার করলাম। এবার ৩/4 জন মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে ধরে রাখল এবং একজন সিপাহী আমাকে রীতিমত ধর্ষণ করতে শুরু করল। অল্পক্ষনের মধ্যে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। পরদিন ১০/০১/৫০ তারিখে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখনও দারুণভাবে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল এবং আমার কাপড় চোপড় ছিল রক্তে ভেজা। এ অবস্থায় আমাকে নাচোল থেকে মহকুমা সদর চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে জেলের সিপাইরা জেল গেটেই আমাকে কিল-ঘুষি মেরে অভ্যর্থনা জানালো। আমার শারীরিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং জনাকয়েক সিপাহী মিলে আমাকে ধরাধরি করে একটা সেলে নিয়ে এলো। তখনও আমার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল এবং শরীরে প্রচন্ড জ্বর। সম্ভবতঃ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার আমার দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে ১০৫ ডিগ্রী নোট করেন। ডাক্তার যখন জানতে পারলেন যে আমার দারুণ রক্তক্ষরণ হয়েছে তখন তিনি আমাকে এ মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, শুশ্রুষার জন্য একজন মহিলা নার্স পাঠানো হবে। তিনি কিছু ঔষুধ দেয়া ছাড়াও দুটো কম্বলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১১/০১/৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের একজন নার্স আমাকে পরীক্ষা করে। আমার সম্পর্কে উনি কি রিপোর্ট দিয়েছেন তা আমার জানা নেই। তবে নার্স আসার পর পরনের রক্তাক্ত কাপড়গুলো বদলিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরতে দেয়া হয়। এ সময় আমি একটা সেলে থাকতাম এবং একজন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেছিলেন। আমার শরীরে তখনও প্রচন্ড জ্বর এবং রক্তক্ষরণ অব্যাহত ছিল। এছাড়া প্রায়ই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়তাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৬/০১/৫০ তারিখের সন্ধ্যায় আমার সেলের সামনে একটা 'স্ট্রেচার' আনা হলো এবং জানানো হলো যে, পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে, আমি খুবই অসুস্থ, আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব হবে না। প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লাঠি পেটা করা হলো এবং আমি 'স্ট্রেচারে' শুতে বাধ্য হলাম। আমাকে একটা বাড়িতে নেয়া হলো। তখন আমি প্রচন্ড জ্বরে অর্ধ চৈতন্য এ অবস্থাতেও আমি স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকার করি। তখন সিপাহীরা একটা সাদা কাগজে জোরপূর্বক আমার দস্তখত আদায় করে নিয়েছে। আমার শারীরিক অবস্থার আরোও অবনতি হওয়ায় পরদিন আমাকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু আমার অবস্থার আশংকাজনক হয়ে উঠলে ২১/০১/৫০ তারিখে আমাকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় এবং জেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়

মাননীয় বিচারক, আমি কোন অবস্থাতেই পুলিশের কাছে কোন জবানবন্দী দিইনি এবং এ লিখিত বক্তব্য ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নাই।

নিরুপমা গুপ্ত

অবিভক্ত ভারতের পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে নিরুপমা বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে কমরেড নিবেদিতা চৌধুরী (নাগ) এর সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পৃক্ত হন।পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করলে নিরুপমা গুপ্ত পুলিশী হয়রানির শিকার হন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ বিভিন্ন ধরনের জেরা ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং তিনি একরাত থানা হেফাজতে অবস্থান করেন। পরদিন তাকে জেলে পাঠানো হয়।

১৯৪৯ সালে জেলে রাজবন্দিদের দাবির সমর্থনে এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে মহিলা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও শ্রমিক সংগঠন যৌথভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকার সদরঘাটের কাছে অবস্থিত করোনেশন পার্কে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে কমরেড নিবেদিতা নাগের বক্তব্য শেষ হতেই পুলিশ ১১ (এগার) জন মেয়েকে গ্রেফতার করে। তাঁদের মধ্যে নিরুপমা গুপ্তও ছিলেন। তিনি ছাড়া পান ১৯৫০ সালে।

অপর্ণা পাল চৌধুরী

চল্লিশের দশকের সূচনালগ্ন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অবিভক্ত ভারতবর্ষে ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে ক'জন মহিলা অংশ নেন তাদের মধ্যে অপর্ণা একজন। তিনি বহু লাঞ্ছনা ভোগ ও রাজনৈতিক নির্যাতনের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন এবং অবিভক্ত ভাতরবর্ষের 'নানকার' কৃষক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন।

অপর্ণা পাল চৌধুরী ১৯২২ সালে সিলেট জেলার নবীগঞ্জ থানার মান্দারকান্দি গ্রামে এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা গিরিন্দ্র চন্দ্র ধর তদানীন্তন গণপূর্ত বিভাগের হিসাব রক্ষক ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪)

Dhaka University Institutional Repository

সময় বিশ্ব যুদ্ধের ব্যয়ের খতিয়ান তৈরির জন্য সরকারীভাবে তাকে মেসপোটেমিয়ায় পাঠানো হয়।

১৯৩৮ সালে আসামের ধুবড়ীর লেডি কার বালিকা বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি আই.এ পাশ করেন এবং কাছাড় জেলার গুরুচরণ কলেজে স্নাতক ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে সুরথ পাল চৌধুরীর সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওই বছর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দিয়ে তাঁর নারী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৪ সালে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি হাইলাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি মহিলা সমিতি গড়া, কিশোর বাহিনী গড়া এবং পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত বই বিক্রির কাজে নিজেকে পাকাপোক্ত ভাবে জড়ান তিনি।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তান সরকার বেআইনী ঘোষণা করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে সুনামগঞ্জ থেকে সিলেটের পঞ্চখন্ডে যান। এ সময় তিনি লাউতা বাহাদুরপুরের নানকার কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। প্রথমে সমর্থনকারী এবং পরে তাদের নেত্রীতে পরিণত হন। এ সময়ে মহেরী, উলোরী, সানেশ্বর গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা গড়ে উঠে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই মহিলা সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। মহিলা সমিতিকে কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি দাঁড় করানোর জন্য মহিলাদের সংগঠিত করার কাজও বেশ জোরে সোরে চলে। জমিদারী প্রথার অবসান ও নানকার প্রথা রদের দাবিও মহিলাদের মধ্য থেকে ওঠে। মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেন নানকার নেতা তপন মোল্লা, পটল মোল্লা, অজয় ভট্টাচার্য ও তাঁর স্বামী সুরথ পাল চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালে সিলেটের লাইতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে যুদ্ধোত্তর যুগে সংগঠিত নানকার আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়। লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলটি কতগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত। নানকার বহুবার জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু ১৯৪৫ এর আগে তারা তেমন কোন সুবিধা করতে পারেননি। ১৯৪৫ সালে সিলেট অঞ্চলে নানকার প্রজারা সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন শুরু করেন। তারা জমিদারদের বয়কট করা শুরু করেন।

এ আন্দোলনে সরকার ছিল জমিদারদের পক্ষে। ফলে এ অঞ্চলে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি পুলিশ ক্যাম্পও বসে। এ ক্যাম্পের পুলিশ ও জমিদারদের লাঠিয়ালরা সব সময় কৃষকদের তাড়া করে বেড়াত। নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এবং জানমালের কারণে হিন্দু মুসলমান কৃষক রমনীরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

সানেশ্বর বাজারে ১৫ আগস্ট হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সম্পর্কে লাউতা-বাহাদুরপুরের জমিদারদের পাঠানো রিপোর্ট পেয়ে ১৬ আগস্ট ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আমলাদের বৈঠক বসে। ১৭ আগস্ট এক বিশাল পুলিশ বাহিনী সানেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ১৮ আগস্ট পুলিশ বাহিনী সোজা পথে সানেশ্বর না গিয়ে রাতের আঁধারে লাউতা-বাহাদুরপুর এসে জমিদারদের কাছারিতে ওঠে। অন্যদিকে মুসলিমলীগ ওয়ালাদের নেতৃত্বে একটি উন্মত্ত জনতার দল বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে লাউতা-বাহাদুরপুরে এসে পৌছে। ভোর রাতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী রণসাজে দামামা বাজিয়ে সানেশ্বর বাজারের দিকে এগুতে থাকে। জমিদারের লোকজনেরা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে পথ দেখিয়ে হাঁটা পথে দুই শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ, ই.পি. আর বাহিনীকে সানেশ্বর গ্রামের ভেতর নিয়ে যায়। টর্চের আলো ফেলে

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িঘর অনুমান করে নিয়ে দলে দলে তারা বাড়িগুলোতে ঢুকে পড়ে। ছন বাঁশের তৈরি দূর্বল নিচু ঘরগুলোর চালে ও বেড়ায় তারা হাতের রাইফেল দিয়ে দমাদম পেটাতে আরম্ভ করে। আচমকা এ উন্মত্ত কোলাহলে ঘরের ভেতরে ঘুমন্ত মানুষগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা ঘরের দ্বার না খুলে ভেতরে থেকে তারস্বরে আর্ত চিৎকার শুরু করে। এতে পুলিশ বাহিনী ক্ষেপে যায়। লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে নারকীয় অত্যাচার শুরু করে। মহিলাদের ঘরের বাইরে টেনে এনে ধর্ষণ করে। পুলিশের বর্বতার শিকার হন অশ্বিনী দাসের স্ত্রী হিরণ্যবালাসহ আরো অনেকে। আক্রমনকারীরা মারপিটের সাথে লুটপাটও শুরু করে। আক্রান্ত জনতার আর্ত বিলাপ শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের জনতাও হৈ চৈ এবং চিৎকার শুরু করে দেয়। উলুউড়ি, নরিসপুর, গোরের টিকা, বিবিরাই, রঙপুর, বিলবাড়ি, সুপাটেক, আনন্দপুর গ্রামের লোকজনের কাছে পৌছে যায় সানেশ্বরের বিপদ সংকেত। সেই সংকেত শুনে গ্রামবাসীরা লাঠি নিয়ে বের হয়ে আসে। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে পুলিশবাহিনী দক্ষিণ দিকে সুনাই নদীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে জনতার মুখোমুখি দাঁড়ায়। উলুউড়ি গ্রামবাসীর সাথে অপর্ণাও পুলিশের সামনে এসে দাঁড়ান। সে সময় তিনি উলুউড়ি গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে অবস্থান করছিলেন। গ্রামবাসীদের হাতে ছিল লাঠি। পুলিশ জনতাকে বেআইনী ঘোষণা করলে পুলিশের সাথে অপর্ণার বাকবিতন্ডা হয়। তিনি বলে ঃ 'পুলিশের হাতের বন্দুক ফেলে দিলে আমরা লাঠি ফেলব'। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে শুরু হয় গুলি। গুলি আরম্ভ হতেই জনতা মাটিতে শুয়ে পড়ে। কেউ বা নদীর তীর থেকে পাশের ধান ক্ষেতের ভিতর লাফিয়ে পড়ে। উলুউড়ি গ্রামের ব্রজনাথ দাস চটই এর নেতৃত্বে একদল কৃষক পুলিশের মোকাবিলা করার জন্য গুলির মধ্যেও কৌশলে এগিয়ে আসতে থাকেন। পুলিশ বেষ্টনীর কাছাকাছি এসে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

গুলিবদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পুলিশের অনবরত গুলি বর্ষণে অমূল্য, কটুমণি, পবিত্র, প্রসন্ন, দীননাথ, হৃদয় ও অদ্বৈত আহত হন। হৃদয় ও অদ্বৈত গুলি খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মাঠ পার হয়ে গ্রামে এসে ওঠেন। দীননাথ ধরা পড়ে যান। বাকিরা মারা যান। চটই নিহত হবার খবরে তার বাড়ির লোকজন আহাজারি করতে করতে উল্টো পথে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঘটনাস্থলে দৌড়ে চলছিল। পথে অপর্ণা পাল ও তাঁর সাথীরা তাদের ঠেকাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। শোকে বিহবল চটইর গোটা পরিবার মহিলা কর্মীদের বাঁধা ঠেলে সামনে এগিয়ে যান।

এ অবস্থায় তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের এভাবে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করে তাদের সঙ্গ নেন। মাঠের অন্যপ্রান্ত থেকে তাদের দেখতে পেয়ে পুলিশ গুলি ছোড়া বন্ধ করে রাইফেল তুলে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে। মহিলা কর্মীরা চটইর পরিবারকে মাঠের মাঝে অরক্ষিত ফেলে সরে যেতে পারলেন না। পুলিশ বাহিনী ছুটে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে লাথি মেরে মেরে সকলকে মাটিতে ফেলে রাইফেলের বাট দিয়ে অমানুষিকভাবে পেটানো শুরু করে। এ অমানুষিক অত্যাচারে অপর্ণা পালের অবস্থা সঙ্গীন হয়। অন্তঃসত্ত্বা থাকার কারণে এ আঘাতে মাঠের মধ্যে তার গর্ভপাত ঘটে। এরপর পুলিশরা উপস্থিত সকলকে প্রায় উলঙ্গ করে পায়ে ধরে টানতে টানতে শতাধিক গজ দূরে নদীর তীরে নিয়ে আসে। পুলিশের কয়েকটি নৌকাও ততক্ষণে লাউতা বাহাদুরপুর ঘাঁটি থেকে এসে পৌছে। পুলিশ সারা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে গুলিতে নিহত ও আহতরা পানি পানি বলে চিৎকার করা সত্ত্বেও তাদের কাউকে একফোটা পানিও দেওয়া হয়নি। সানেশ্বরের গুলি বর্ষনে ঘটনাস্থলে নিহত হন ৪ জন। আহত হন ৪ জন। পরে একজন জেলে

Dhaka University Institutional Repository

মারা যান। ঘটনাস্থলে বন্দী হন ৮ হন। এ আটজনের অন্যতম ছিলেন অপর্ণা পাল চৌধুরী ও তাঁর ননদ অসিতা পাল চৌধুরী।

নিবেদিতা চৌধুরী (নাগ)

১৯১৮ সালে ৪ আগষ্ট নারায়নগঞ্জে মাতুলালয়ে নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন। মা অমিয় বালা চৌধুরী ছিলেন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। বাবা সতীব চৌধুরী ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের সহপাঠী। সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতো। এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে অপসারণ করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি একটি বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। সেখানেও কাজ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে চলে যান ত্রিভূবন কলেজের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করার দায়িত্ব নিয়ে।

১৯৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ছাত্র ফেডারেশনের সাথে যৌথভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই উপলক্ষে একটা মিছিল করে করোনেশন পার্কে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার আগেই পুলিশ বেশ কিছু কর্মীকে গ্রেফতার করে। তাঁদের মধ্যে রীনা সেনগুপ্ত, নিরূপমা গুপ্ত, উমা রায়, রাধা দাস, বিউটি মুখার্জী, দেবী মুখার্জী, সুনীতি মুখার্জী, কনাপাল ও নিবেদিতা নাগসহ এগারোজন মহিলা কর্মী ছিলেন। তাদের প্রথম সুত্রাপুর থানায় নিয়ে যায়। সেদিন থানাতেই রাত কাটাতে হয়। পরের দিন পায়ে হাঁটিয়ে এবং কুৎসিত গালাগাল করতে করতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভানু দেবী

রক্ষণশীল গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে ভানু দেবী অবিভক্ত বাংলার নারী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ প্রথম সারির নেত্রী। ১৯০৭ সালে বাংলাদেশের খুলনা জেলা শহর থেকে মাইল তিনেক পূর্ব দিকে ভৈরব নদীর দক্ষিণে খানকা গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারে তাঁর জন্ম।

চট্টোপাধ্যায়রা সে সময় এ অঞ্চলের নামকরা জমিদার ছিলেন। ভানু দেবীর বাবার নাম গোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মা কিরণময়ী দেবী। তিন বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। পরে তাঁর বাবা আমার বিয়ে করেন। বিমাতা চারুবালা দেবীর কাছে তিনি লালিত পালিত হন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ বসু কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্তে বরিশাল ও খুলনা শহরে আসেন। ভানু দেবীর কাকা কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন জেলা কংগ্রেসের একজন অন্যতম নেতা। তিনি খুলনা শহরে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে নেতৃত্ব দান করেন। সুভাষ বসু সে সময় ভানু দেবীর কাকার বাসায় থাকেন। সুভাষ বসুর খাওয়া-দাওয়া তথা যাবতীয় ব্যবস্থার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। সে সময় নেতাজী ইচ্ছা প্রকাশ করেন ভানু দেবী যেন ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। নেতাজীর এ ইচ্ছাকে তিনি সম্মান জানিয়েছিলেন। কিছুদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষেও কাজ করেন।

১৯৪৩ সালে কাঁটিপাড়া গ্রামে সাতক্ষীরা মহকুমা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক আন্দোলনের নেতা আবদুল্লাহ রসুল এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এখানে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মহকুমা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ভানু দেবী এ সম্মেলনের

Dhaka University Institutional Repository

সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে এ অঞ্চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠন বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৯৪৬ সালে খুলনায় মৌভাগে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মীর সংখ্যা তখন খুব বেশী ছিল না। তাই এ সম্মেলনের জন্য সকল কর্মীদের ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়। ভানু দেবী একাই মেয়েদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পান।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার পর খুলনা শহর পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। ভারত বিভাগের পর সুযোগ সন্ধানী মাতব্বর ও জোতদাররা শুরু করেন হিন্দু বিতাড়নের কার্যক্রম। শুরু হয় অত্যাচার। নিগৃহীত হন নারীরা। নির্যাতীত নারীদের দাঙ্গাবাজদের হাত হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয় সর্বদলীয় 'নারী সেবা সংঘ'। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে গঠিত এ সংঘের সদস্যরা খুলনা ও পার্শ্ববর্তী উপদ্রুত এলাকার তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করেন। এ সময় মণিকুন্তলা সেন, যুঁইফুল বসু প্রমূখ প্রাদেশিক মহিলা নেত্রীরা কোলকাতায় ভানু দেবীর ভাইয়ের বাসায় এসে ভানু দেবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভানু দেবীর স্বাস্থ্য আশংকাজনক দেখেও চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে খুলনা শহরে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ অবস্থায় ভানু দেবী খুলনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। খুলনায় ফিরে এসে আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা মিলে 'নারী সেবা সংঘকে' শক্তিশালী করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তারা কয়েকশত বিপন্ন লাঞ্ছিতা যুবতীকে উদ্ধার করেন। এ উদ্ধার কাজে বহু মুসলিম সদস্য সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। ১৯৪৮ সালের শেষভাগে ডুমুরিয়া থানার ধানিবুনিয়ার কৃষক আর উত্তর খুলনার কালশিয়ার কৃষকেরা মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলে। কালশিরার কৃষকেরা পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সদ্যোজাত পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন এ আন্দোলনকে

Dhaka University Institutional Repository

ধুলিসাৎ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জারী করা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। এ অবস্থায় ভানু দেবীর ওপর দায়িত্ব পড়ে গোপন পার্টির সংগঠন টিকিয়ে রাখা।

এ সময় পুলিশের কঠোর টহলদারী উপেক্ষা করে রাতের আঁধারে তাঁকে যেতে হতো অত্যাচারিত কৃষক এলাকায়। সাথে থাকতেন তার ভাই বিষ্ণু দাস। বিষ্ণু দাসকে ধরিয়ে দেবার জন্য এনাম ঘোষণা করা হয় 'হাজার' টাকা। কৃষক রমণীরা পুলিশের ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত। সাধারণ কৃষকরা ছিল ভীত। ভানু দেবী তাদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে সাহস যোগান। কিন্তু বেশীদিন এভাবে কাটানো গেলনা। ভানু দেবীর গতিবিধি জেনে যায় পুলিশ। ১৯৪৮ সালের ৭ মে মূলঘর রেলস্টেশনে অপেক্ষারত ডাঃ সুনীল বিশ্বাস ও ছাত্রকর্মী মানিক দাসকে নিতে এসে তিনি ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। ধরা পড়ার পর ভানু দেবীর ওপর শুরু হয় অমানুষিক পুলিশী নির্যাতন। এ নির্যাতনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। রাজবন্দী হিসেবে তাঁকে একের পর এক ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং সর্বশেষ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ভানু দেবীর অবস্থার অবনতি ঘটে। তিনি প্রায় অচল হয়ে পড়েন। এ অচল অবস্থায় জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে টানাটানি করেন এ অভিযোগে যে জেলের অভ্যন্তরে তিনি নারীবন্দীদের এমনভাবে সংগঠিত করছেন যা আদৌ জেলের পক্ষে নিরাপদ নয়।

জেল জীবনে ভানু দেবীর সাথী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নেত্রীস্থানীয় নারীরা। এদের মধ্যে উল্লেখ্য ঢাকার নিবেদিতা নাগ,বরিশালের মনোরমা বসু মাসিমা, সিলেটের অসিতা ও অপর্ণা পাল চৌধুরী এবং রাজশাহীর ইলা মিত্র। এছাড়া ছিলেন ঢাকার নাদেরা বেগম, রাণু চ্যাটার্জী, ময়মনসিংহের হাজং কমরেড আশমণি হাজং ও

Dhaka University Institutional Repository

ভদ্রমণি হাজং, পাবনার লিলি চক্রবর্তী প্রমূখ। প্রতিটি জেলেই তাঁরা মহিলা গ্রুপ গঠন করে।

রাণী মিত্র

বাবা দ্বারকানাথ মিত্র ও মা প্রফুল্লবাসিনী মিত্রের দশ সন্তানের অন্যতম রাণী মিত্রই কেবলমাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরিবারে কোনরূপ রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল না। বাবা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। রাণী মিত্রের জন্ম ১৯২৫ সালের ৮ মে দিনাজপুরের শহরের রক্ষনশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে। তিনি অংক ও অর্থনীতি নিয়ে বি.এ পাশ করেন। পরবর্তীকালে এম.এ. ও বি.টি পাশ করেছেন কলকাতা থেকে।

১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় রাণী মিত্র কমিউনিস্ট পার্টি জেলা কমিটির সদস্য হন। পার্টির এবং কৃষক সমিতির বহু নেতা কর্মী তখন জেলে এবং বাকীরা আত্মগোপন করে ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাণী মিত্রকে তখন গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়, সাথে ছিলেন বীনা সেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতার অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রাণী মিত্র ছিলেন সর্ব কনিষ্ট ডেলিগেট। দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর রাণী মিত্রকে পাঠানো হয় দিনাজপুরে। সেই সময়ে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে। রাণী মিত্রের নামে তখন হুলিয়া। ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য গোপনে গোপনে কাজ করেছেন, পাশাপাশি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। ১৯৪৮ সালেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তিনি একমাত্র মহিলা বন্দী। মোহাম্মদ আলী জিন্নার জন্মদিনে একমাত্র মহিলা বন্দী হিসেবে ছাড়া পান, কিন্তু তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনপ্রভা বিশ্বাস

আজীবন সংগ্রামী জীবনপ্রভা বিশ্বাস ১৯২৫ সালে ১৩ মাঘ বৃহত্তর বরিশালের বর্তমান পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার কামারকাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ধন্বন্তরী আইচ সরকার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৪৪ সালে পার্টির সদস্যপদ পান। ১৯৪৮ সালে জীবনপ্রভা বিশ্বাসের বিয়ে হয় স্কুল শিক্ষক অজিত কুমার বিশ্বাসের সাথে। অজিত কুমার নিজেও ছিলেন মার্কসবাদে বিশ্বাসী। জীবনপ্রভা বিশ্বাস কমিউনিস্ট পার্টি করতে গিয়ে অনেক বাধা পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের আগে এবং পরে ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগের প্ররোচনার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। দাঙ্গায় বহু হতাহত হয়। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে হিন্দুরা স্রোতের মতো ভারতে চলে যেতে থাকে। কিন্তু জীবনপ্রভা বিশ্বাসরা ভারতে যাননি। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের পুলিশী হয়রানির মধ্যে রাখে। অনেকের বিরুদ্ধে হুলিয়াও জারি করে। ১৯৪৮ সালের বিয়ের পরপরই জীবনপ্রভা বিশ্বাস আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। তখন তিনি গৌরনদী এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গৌরনদীর গৈলা গ্রামে সেনগুপ্তদের বাড়িতে পার্টির সভাগুলি হতো। ১৯৪৯ সালে একদিন এক হিন্দু গুপ্তচর পুলিশকে খবর দেয়। আগের দিন সভা করে কমরেড মুকুল সেন মাহিলাড়া গ্রামে চলে যান। জীবনপ্রভার স্বামী অজিত কুমার মাহিলাড়া থেকে গৈলা গ্রামে আসছিলেন। পথে গ্রেফতার হন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন জীবনপ্রভা বিশ্বাস গৈলা গ্রামে গ্রেফতার হন। দু'জনকেই বরিশাল জেলে পাঠানো হয়। জেলে তখন ভজন বসু (মনোরমা মাসিমার মেয়ে), পুতুল দাশগুপ্ত, অমিয়া দাশগুপ্ত, খুকু সেনগুপ্ত, সুজাতা দাশগুপ্ত অনেকেই ছিলেন। সুজাতা দাশগুপ্তকে গর্ভাবস্থায় জেলে নেয়া হয় এবং জেলে থাকাকালেই তাঁর এক পুত্র সন্তান হয়। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে বা ১৯৫১ সালের প্রথমদিকে জীবনপ্রভা বিশ্বাস জেল থেকে ছাড়া পান।

লতিকা সেন

লতিকা সেনের জন্ম ১৯১৩ সালের ২৮ মে (বাংলা ১৩১৯ সাল, ১৪ জ্যৈষ্ঠ) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নিবারণ চন্দ্র দাশ এবং মা কিরণ বালা দাশ। পিতা নিবারণ চন্দ্র দাশ সে সময় রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। তাঁর পিতামহ প্রসন্নকুমার দাশ একজন আইনজীবি ছিলেন। মাতামহ নিখিলনাথ রায় সে সময় বাংলা সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পিতার বদলির চাকুরি হেতু শৈশবকালে তাঁর কেটেছে মায়ের সংগে মামা বাড়িতে।১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি এক নাগাড়ে ঢাকায় থাকেন। ঢাকায় আসার অল্পদিন পর বড়ভাই অনিলকুমার জড়িয়ে পড়েন অনিল রায়ের 'শ্রীসংঘের' সাথে। সেই সূত্র ধরে লতিকাও জড়িয়ে যান লীলা রায়ের দীপালি সংঘের সাথে। ১৯৩৬ সালে বেঙ্গল লেবার পার্টির সাথে মতদ্বৈততার কারণে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। লতিকা সেনই অবিভক্ত ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলাদেশের প্রথম নারী সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টির গোপন ক্রিয়াকলাপের সাথে লতিকার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। বেআইনী পত্র-পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ, প্রচার ও বিতরণে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সেলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ২০ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রণেন সেনের সাথে তাঁর পরিণয় ঘটে। ১৯৪০ সালে পুলিশের রিপোর্টের কারণে তিনি ভবানীপুর বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদটি হারান। চাকুরিচ্যুত হওয়ার ফলে তিনি বিশেষ প্রতিকুল অবস্থার মুখোমুখি হন। ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। কয়েকহাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্দী মুক্তির জন্য ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কোলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে 'ভারত সভা হলে' একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে মহিলাদের একটি শোভাযাত্রাও বের হয়। সহযোগী যোদ্ধা প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয় দত্ত ও গীতা সরকারকে নিয়ে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে লতিকা সেন ছিলেন। ভারতের কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানীতে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর গুলিবর্ষন করে। পুলিশের গুলিতে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে নেতৃত্বদানকারী লতিকা সেন ও তাঁর সহযোগী চারজন মহিলা শহীদ হন। ব্রিটিশ বিতাড়িত ভারতবর্ষে আবারো শহীদের খাতায় নারীর নাম লেখা হয়। জীবন বিসর্জন দিয়ে লতিকা সেন ও তার সাথীরা প্রমাণ করেন স্বাধীন ভারতবর্ষে নারীদেরও রাজনীতি করার অধিকার আছে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাঁরাও নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে সমর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি দত্ত

শান্তি দত্ত সিলেট জেলার নিজ গ্রাম মান্দারকান্দিতে ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই পরিবারে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবেশ ছিলো। পরবর্তীকালে ঐ গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক সমিতিরি ঘাঁটি স্থাপিত হয়। তাঁর দুই দাদা অপূর্ব ভট্টাচার্য ও মনি ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে শান্তি দত্তেরও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামী বারিন দত্ত। দেশ বিভাগের পর তাঁর পরিবার সিলেট শহরে চলে আসে। ঐ সময়ে তাঁদের বাড়িটি কমিউনিস্ট নেতাদের আশ্রয় ও সভাস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখানে গোপনে পার্টি কর্মীদের রান্নাবান্না করে খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পার্টির দলিল পত্র সংরক্ষণের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি করতেন। একবার পুলিশ হানা দেয় তাঁদের বাসায়। গোপন কাগজপত্র সেখানে ছিল। শান্তি দত্ত পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তা সরাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সময় আর ছিল না। অথচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল যা পুলিশের হাতে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা ছিল এবং পার্টি দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এমন অবস্থায় শান্তি দত্ত সেই কাগজটির মুখে পুরে চিবিয়ে নষ্ট করে দেন। কিন্তু তাঁরা দুই বোন শান্তি ও লক্ষ্মী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান। সিলেট কারাগারে তাঁকে দু মাস বন্দী থাকতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন, গ্রেফতার ও পুলিশ হেফাজতে নারী

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল সে আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হয়নি, বিশেষ করে নারী সমাজের আশা আকাঙ্খা। ভাষা আন্দোলনকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উষালগ্ন। ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম মেয়েদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। তাঁরা রাজপথে নেমে আসে দলে দলে। ভাষা আন্দোলনে নারীরা জোরালো এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। তৎকালীন সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মেয়েরাই প্রথম রাস্তায় বের হয়ে আসে পুলিশী ব্যারিকেড ভেঙ্গে ডঃ হালিমা, সুফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহীম, ফজিলাতুন্নেসা, জুলেখা, নূরী, সারা তৈফুর সহ নাম না জানা অনেক নারীই প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। পুলিশী বাধায় অনেক ছাত্রীই আহত এবং গ্রেফতার হয়। নারায়নগঞ্জের মর্ডান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়ে যায়।

পুলিশী হেফাজতে সুফিয়া খাতুন (ভাষা আন্দোলনে প্রথম গ্রেফতারকৃত নারী)

জ্ঞানপিপাসু ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় নেত্রী সুফিয়া খাতুন ১৯৩৩ সালে ৩০ জানুয়ারী যশোর জেলার পোস্ট অফিস পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হলে তিনিও তখন সেই আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং হামিদা রহমানের সাথে মিছিলে যোগ দেন। তারপর প্রথমে মধুসূদন ও মমিন স্কুলের মেয়েদের বের করে নিয়ে প্রধান রাস্তা অতিক্রম করে কালেক্টরি অফিসের দিকে যান। তাঁর নেতৃত্বে মিছিল এগিয়ে যায়, 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' স্লোগান নিয়ে যখন তিনি অফিস ঘেরাও করে, তখন পুলিশ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছেলেদের গ্রেফতার করে। সুফিয়া খাতুন বাড়ি চলে আসেন। তখনো তিনি ভাবেননি তাকেও গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু পরদিন সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সম্ভবত, সুফিয়া খাতুন প্রথম নারী যিনি ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। ওই দিন ছিল রবিবার, সারাদিন তাঁকে থানায় বসিয়ে রেখে বিকেলে এসডিও সাহেবের বাসায় নিয়ে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে ২৩ মার্চ কোর্টে হাজির হতে হবে এই শর্তে তাঁকে জামিন দেয়া হয়।

নাদেরা বেগম

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে কুমিল্লার এমএলএ এডভোকেট ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পরিষদের ভাষা করার দাবি করলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান জানান যে, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলমানের ভাষা হচ্ছে উর্দু। তাই উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। তাঁকে সমর্থন করেন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন। লিয়াকত ও নাজিমউদ্দিনের গণপরিষদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ২৭ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। নাদেরা বেগম সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যয়নরত। বড় দুই ভাই কবীর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী সে সময় প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয়।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক সূত্রেই ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে ছাত্রদের মিছিল বের হলে পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার দায়ে হামলা করে তা ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে। নাদেরা বেগম মেডিকেল কলেজের ভেতরে ঢুকে পড়েন। পুলিশ তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে থাকলেও নাদেরা বেগমকে ধরতে পারেনি। তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বের হলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান তারাবাগে বেগম সুফিয়া কামালের বাসায়। সেখানে তাঁর নাম দেয়া হয় জাহানারা বেগম জানু। বাসায় অপরিচিত কেউ এলে সুফিয়া কামাল তাঁকে বোনের মেয়ে বলে পরিচয় দিতেন এবং বাসার সবাইকে তিনি সেভাবেই বলে রাখেন। সুফিয়া কামালের বাসায় আত্মগোপনরত অবস্থায় মাস খানেক থাকার পর খবর পান সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় পুলিশ হামলা চালাতে পারে বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি চলে যান মদন মোহন বসাক লেনের ৪৯ নং বাড়িতে। সেই বাড়িতে পুলিশ হানা দেয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে দুই বছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরে রংপুর জেলখানায় রাখা হয়।

রীনা সেনগুপ্ত

রাজনৈতিক পরিমন্ডলের মধ্যেই যাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা রাজনীতি শেখা তাঁর প্রয়োজন হয় না। রীনা সেনগুপ্ত এমনই একজন ব্যক্তি। তাঁর একমামা ছিলেন বিপ্লবী সূর্য সেনের সহযোদ্ধা ১৯২৯ সালের ২৩ জানুয়ারী রীনা সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন পৈত্রিক নিবাস চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার ধরলা গ্রামে। ১৯৪৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই এ পড়ার সময়ে ১৯৪৮ সালের ৭ নভেম্বর রীনা সেনগুপ্তের বিয়ে হয় তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলা সাধারণ সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কল্পতরু সেনগুপ্তের সাথে। ১৯৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর করোনেশন পার্কে সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার আগেই পুলিশ যাদেরকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়ে যান তাদের মধ্যে রীনা সেনগুপ্তও ছিলেন। জেলে যাওয়ার আগেই থানা থেকে তাঁরা অনশন শুরু করেন।

১৯৫০ সালে রীনা সেনগুপ্তকে ঢাকা জেল থেকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা জেলে দীর্ঘদিন অনশন ও খাবারের অব্যবস্থার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চট্টগ্রাম জেলে আসার কিছুদিন পর কোর্ট থেকে জামিন পান। তখন তিনি খুবই অসুস্থ, কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার পর আবার দলের কাজ শুরু করেন। ঐ সময়ে বেশ কয়েকটা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। একুশ দিন বাইরে থাকার পর আবার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর আবার জেল হয়।

ডঃ হালিমা খাতুন

১৯৩২- (১৩৩৮ বাং) সনের ২৫ আগস্ট বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার বাদেকাপাড়া গ্রামে হালিমা খাতুনের জন্ম। হালিমা খাতুন পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম, এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাশাস্ত্রে এম, এড করেন। হালিমা খাতুন ১৯৬৩ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যান এবং সেখানকার ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডো থেকে ১৯৬৮ সনে ডক্টরেট ইন এডুকেশন লাভ করেন। ড. হালিমা খাতুন স্কুল জীবন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ভাষা কন্যা। ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি অন্যান্যদের সাথে পুলিশের ব্যারিকেড অমান্য করে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আমতলার মিটিং থেকে বের হন। এই ঘটনা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর পরে দীর্ঘকাল ধরে ভাষা আন্দোলনসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসীম নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে যান।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং পুলিশি হেফাজতে নারী

১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে চৌদ্দজন মহিলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে মহিলা মুসলিম সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিতদের কয়েকজন হচ্ছেন নূরজাহান মুরশিদ, দৌলতননেছা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেছা, মেহেরুন্নেছা খাতুন প্রমূখ।

দৌলতননেছা খাতুন

দৌলতুন্নেছা খাতুন জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সনের ১৬ই জুন (আনুমানিক) বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক গ্রামে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি যশোর জেলার মাগুরা মহকুমায় (বর্তমানে জেলা)। তাঁর পিতা মোহাম্মদ ইয়াসিন ও মাতা নুরুন্নেছা খাতুন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে দৌলতুন্নেসা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ সনের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। ১৯৩২ সনের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কয়েকজন মিলে গাইবান্ধা মহিলা সমিতি গঠন করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্ব ও কর্মভার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে দৌলতুন্নেসা পরিণত বয়সের পরিচয় দেন। এই সমিতি সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং এবং ১৪৪ ধারা অমান্য ও প্রচার কার্য চালায় এর ফলে তাঁর পরিবারের ওপর চলে পুলিশী নির্যাতন। তাঁর স্বামীকে গাইবান্ধা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং বাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এতো বাধাবিঘ্ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও দৌলতুন্নেছা আন্দোলন পরিচালনা করে যান। অবশেষে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি সাত মাস কারাবরণ করেন। দৌলতুন্নেছা খাতুন রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি ও বহরমপুর জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৫৪ সনে ৯২ (ক) ধারা বিরোধী আন্দোলনে এগার মাস কারাবরণ করেন ও তিন মাস গৃহবন্দী ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৭ সনের ৪ আগস্ট দৌলতুন্নেছা খাতুন ইন্তেকাল করেন।

নিলুফার আহমেদ ডলি

১৯৩২ সালের ৯ এপ্রিল রংপুর সদরে বেগম নিলুফার আহমেদ জন্ম গ্রহণ করেন। মা বেগম আফতাবুন নাহার, বাবা ক্যাপ্টেন ডাঃ নঈম আহমেদ। বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সময় তিনি যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালান এবং প্রার্থীদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৮টি আসন। অল্প দিনের মধ্যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এ সরকারকে বাতিল করে ৯২ (ক) ধারার মাধ্যমে গভর্ণরের শাসন জারি করে। প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয় দলে দলে। সে বছরই নিলূফার তানজিম উদ্দিন আহমেদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছু দিন পর নিরাপত্তা আইনে রাজবন্দি হিসেবে তাঁকে রংপুরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশী হেফাজতের পর তিনি রংপুর ও রাজশাহী কারাগারে এক বছর বন্দি ছিলেন।

বদরুন্নেসা আহমেদ

বদরুন্নেসা আহমেদ ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ (বাংলা সন ১৩৩০) কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে বি.এ., ১৯৬১ - তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এড. এবং ১৯৬৩- তে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতায় ছাত্রী অবস্থায় মুসলিম মহিলাদের সভা সমিতিতে যোগ দিতেন বদরুন্নেসা আহমেদ। তবে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে এসে সেই তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে অংশ নিতে সম্মত হন। বদরুন্নেসা আহমেদ শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমন্বয়ে গঠিত জোট 'যুক্তফ্রন্টের' প্রার্থীর মনোনয়ন অর্জন করেন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হয়ে কুষ্টিয়া আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে এম এল এ নির্বাচিত হন প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী

Dhaka University Institutional Repository

বদরুন্নেসা আহমেদ। সে বছরই জারি হয় কুখ্যাত ৯২ (ক) ধারা। দেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়। এই অশুভ অন্যায় আচরণ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি কুষ্টিয়ার বস্ত্রকল মোহিনী মিলের শ্রমিকদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন ও সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কেন্দ্রীয় কারাগারে দেড়মাস কারাবন্দি অবস্থায় থাকেন। ১৯৭৩ সালে তিনি তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য তিনি এবং নূরজাহান মুরশিদ বাংলাদেশের একই কেবিনেটের সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী।

প্রণতি দাশ (দস্তিদার)

১৯১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের সাতকানিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা নগেন্দ্র কুমার দাশ তৎকালীন সময়ের একজন খ্যাতিমান আইনজীবি ছিলেন। বাবা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাড়িতে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন আবার নিয়ে যেতেন। এছাড়া তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৯৫১ সালে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা শরবিন্দু দস্তিদারের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি প্রায় সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মীতে পরিণত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন বেড়ে যায়। পুলিশ লিফলেট রাখার দায়ে তাকে গ্রেফতার করে। প্রায় এক মাস হাজতে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় আবার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তার জেল হয়। পুলিশের চোখে তাঁর অপরাধ ছিল তিনি কমিউনিস্ট

Dhaka University Institutional Repository

পার্টির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থী সুধাংশু দত্ত ও পূর্নেন্দু দস্তিদার বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। নির্বাচনের সময়ে সুধাংশু দত্ত আন্ডার গ্রাউন্ডে ছিলেন এবং পূর্নেন্দু দস্তিদার জেলে ছিলেন। তাঁদের নির্বাচনের কাজে প্রণতি দস্তিদার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়ার পর তিনি তৃতীয় দফা পুলিশ গ্রেফতার করে। এক মাস চট্টগ্রাম জেলে রাখার পর তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি এক বছর ছিলেন। ১৯৫৫ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি পান।

আরতি (দাশ) দত্ত

আরতি দত্ত ২২ জুলাই ১৯২৪ সালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার নলুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আরতি দত্ত ১৯৩৮-৪০ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন এবং পরবর্তী সময় থেকে নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালে বিএ এবং ১৯৬৪ সালে বি এড পাস করেন।

রাজনীতি করতে যেয়ে আরতি দত্তকে বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। জেলে থাকতে হয়েছে। তিনি বেশ কিছু সময় আত্মগোপন অবস্থায় কাজ করেছেন। ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পূর্বে তিনি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনের প্রচারণা দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে আরতি দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং তিনি দু'মাস কারাবন্দী অবস্থায় থাকেন। ছাড়া পাওয়ার পরে ৯২ (ক) ধারা জারী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জোৎস্না নিয়োগী

১৯২৫ সালে বিক্রমপুর জেলার নয়না গ্রামে জোৎস্না নিয়োগী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা রবি নিয়োগীর সাথে জোৎস্নার বিয়ে হয়। ১৯৪২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় জোৎস্না নিয়োগী কর্ণা বক্সী ও আরো দুজন গারো মেয়ে সহ পুলিশের দমননীতি উপেক্ষা করে আত্মগোপন অবস্থায় নলিতাবাড়ি, হালূয়াঘাট, সুসং দূর্গাপুর প্রভৃতি এলাকায় মহিলাদের মধ্যে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে টংক আন্দোলন চলাকালে পলাতক অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন। জোৎস্না নিয়োগীকে সে সময় ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৯৫২ সালে জোৎস্না নিয়োগী কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৫৪ সালে ৯২ (ক) ধারা জারী হলে জোৎস্না নিয়োগীকে আবারও পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি কারাবরণ করেন। আট মাসের শিশুপুত্র কাজলকে সাথে নিয়ে ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কারা নির্যাতন ভোগ করেন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুথান - গ্রেফতার এবং পুলিশী হেফাজতে নারী

সামরিক আইন ভঙ্গ করে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম সৃষ্টি হতে হতে আসে ১৯৬৯ এর গণজাগরণ। '৬৯-এর ১৯ জানুয়ারি ছাত্রীদের ওপর লাঠি চার্জ করে পুলিশ। ২০ জানুয়ারী আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ২২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে যে বিরাট শোক মিছিল সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল, তাতে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা সমাজ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অংশগ্রহণ করে। ২৪ জানুয়ারি সুফিয়া কামালের বাসায় অনুষ্ঠিত মহিলাদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঐ দিনই সন্ধ্যা ৬ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে মশাল মিছিল বের করে সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০ টায় হাজার হাজার বোরকা পরা মহিলা শহীদ মিনার থেকে শুরু করে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নওয়াবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে যায়। ইতিমধ্যে,২৪ জানুয়ারির হরতালে ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা সামনে নিয়ে রাস্তার পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করেন এবং তাতে হাজার হাজার জনতা যোগ দিয়ে পল্টন ময়দানে চলে আসে। ১০ ফেব্রুয়ারী সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, ফওজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস, মুনিরা আক্তারের মতো ছাত্রী নেত্রীরা ছিলেন প্রধান। এ সময়ে রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করে যারা বিভিন্ন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন তাদের মধ্যে মিসেস তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া), রেবেকা মহিউদ্দিন, সারা আলী, আজীজা ইদ্রিস,বেলা নবী উল্লেখযোগ্য। দুঃসাহসী কার্যকলাপ ও অগ্নিঝরা বক্তৃতার জন্য ছাত্র নেত্রী মতিয়া চৌধুরীকে অগ্নিকন্যা উপাধি দেওয়া হয়। ৬৯ এর ১৯ জানুয়ারী পুলিশ ছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করে। অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী সহ আরো অনেককে পুলিশ গ্রেফতার করে তাদের হেফাজতে রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আমল

পুলিশ হেফাজতে শিরীন আখতার (১৯৭৫)

শিরীন আখতার ১৯৫৪ সালের ১২ এপ্রিল পৈত্রিক নিবাস ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রফিকুল আনোয়ার মজুমদার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সামাজিক কর্মকান্ড ও সংগঠনের সাথে জড়িত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে সম্মান ও এম এস এস পাস করেন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের জন্মলগ্ন থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই দল গড়ে তোলার শুরুতেই অনেককে অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। অনেককে আত্মগোপন অবস্থায় থাকতে হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমে মমতাজ বেগম, লুৎফা হাসান রোজী, ফেরদৌসী, কাজী শীনু, রওশন জাহান সাথী, সালেহা বেগম, আফরোজা হক রীনা, মিথুন, বানু, আমেনা সুলতানা বকুল, উম্মেল ওয়ারাসহ আরো অনেকে আত্মগোপন করেছিলেন কিংবা গ্রেফতার হয়েছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি রংপুরে আত্মগোপন করেন।

১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে জাসদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন হলে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তিনি অস্ত্র রাখার মিথ্যা অভিযোগে রংপুর শহর থেকে গ্রেফতার হন। তাকে কোতয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় রাত ১১ টায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর দেহ তল্লাশীর নামে তার শাড়ি খুলে ফেলা হয় এবং কোমরে দড়ি বেধে দেয়া হয়। সকালে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ, কিছুই

Dhaka University Institutional Repository

তার মুখ থেকে বের করতে না পেরে তার হাত উপরে তুলে কাধ থেকে পা পর্যন্ত মোটা লাঠি দিয়ে পেটানো শুরু হয়। শরীরে কালশিরা পড়ে যায়, যে কারণে দীর্ঘদিন পরে ও ব্যথা অনুভব করেন তিনি। তাকে বলা হয় যে, আঙ্গুলে সূঁচ ফোটানো হবে। গরম সেদ্ধ ডিম যোনিপথে প্রবেশ করানো হবে। একদিন পর তাকে রংপুর কারাগারে পাঠানো হয়। কিছুদিন পর তাকে জেলারের রুমে ডাকা হয়। আর্মির লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। নেতা-কর্মীরা কে কোথায় আছে জানার জন্য শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদের পালা। তিনি কোন তথ্য না দেয়ায় তাকে বীভৎস দুজন লোকের হাতে তুলে দেয়ার হুমকি দেয়। তার দু হাতে বৈদ্যুতিক তার বেধে দেয়া হয়। চোখে পট্টি বাধা হয়। পর পর দুবার তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। প্রায় পনের দিন মাথা তুলতে পারেননি। এভাবে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জাসদের ছাত্র সংগঠক হিসেবে কারাবন্দি থাকেন তিনি।

বেলা নবী (১৯৮০)

বেলা নবী ১৯৩৬ সালের ৯ ডিসেম্বর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম ফাতেমা খাতুন, পিতার নাম মোঃ আমিনুল্লাহ। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি। একই আদর্শে বিশ্বাসী স্বামী মোহাম্মদ নবী দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে কঠোর সামরিক শাসনের মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন বেলা নবী। গুলশান এলাকা থেকে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি ১৯৮০ সালের ১ এপ্রিল মোহাম্মদ ফরহাদ, মনিসিংহ সহ গ্রেফতার হন।

Dhaka University Institutional Repository

সাহারা খাতুন (১৯৮৩)

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম এবং নবম জাতীয় সংসদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলায় এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯৬৯ সালে মহিলা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ ছিলেন মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ছিলেন সাধারণ সম্পাদিকা। আর সাহারা খাতুন ছিলেন তেজগাঁও পশ্চিম ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা এবং আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা।জীবনে তিনি অনেকবার পুলিশী গ্রেফতার ও জেল জুলুমের শিকার হন। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে হত্যার প্রতিবাদে ১৫ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের প্রস্তুতি নিতে ওইদিন সকালে ডঃ কামাল হোসেনের বেইলি রোডের বাসভবনে এক মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। মিটিং শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ সারাবাড়ি ঘিরে ফেলে বহু নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে। সভানেত্রী শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী, এবং সাহারা খাতুন এই তিনজনকে গ্রেফতার করে জেলখানায় না নিয়ে হেয়ার রোডের মার্শাল ল কোর্ট এজলাসে নিয়ে যায়। তাঁদের তিনজনকে এক রুমে (এজলাসে) ঢুকিয়ে এক দরজা খোলা রেখে বাকি সব দরজা জানালা বাইরে থেকে পেরেক লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। সারাদিন তাদেরকে কিছু খেতে না দিয়ে রাত্রে তিনজনকে মোটা চালের ভাত, দুটুকরা আলু খেতে দেয়া হয়। রাত্রে শোয়ার জন্য দুইটি করে কম্বল দেয়া হলে ব্যাগ মাথায় দিয়ে মেঝেতে ঘুমাতে হয়। দুইদিন

Dhaka University Institutional Repository

ওইঘরে থাকার পর ১৭ ফেব্রুয়ারী মিন্টু রোডের এক বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখা হয়। এই সময় তাঁদেরকে বাইরের কোন খবরাখবর দেয়া হতো না। সারাক্ষণ বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে মানসিক নির্যাতনের মধ্যে রাখা হতো। অবশেষে ১ মার্চ তাঁরা ছাড়া পেয়ে বাসায় ফিরে আসেন।

১৯৮৪ সালে সভানেত্রী শেখ হাসিনা অন্তরীন থাকা অবস্থায় ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে দলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে গেলে হঠাৎ পুলিশ তোফায়েল আহমেদ এবং তাঁদের দুজনকে বেদম প্রহার করতে থাকে। এসময় তিনি এবং মতিয়া চৌধুরী পুলিশের মুখোমুখি হন। অতঃপর পুলিশ তাঁকে সহ মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, মোঃ নাসিম, জোহরা তাজউদ্দিন, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান ও রওশন আরা রহমানকে গ্রেফতার করে সাভার থানায় নিয়ে যায়। সারাদিন থানায় বসিয়ে রেখে সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেয়।

মতিয়া চৌধুরী

বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ১৯৪২ সালের ৩০ জুন মাদারীপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের মাহমুদ কান্দা গ্রামে। মা নূর জাহান বেগম, বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বাবা পেশায় পুলিশ অফিসার ছিলেন।

ইডেন কলেজের ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে মতিয়া চৌধুরী ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে এম এস সি ক্লাসে ভর্তি হন তিনি। ষাটের দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে প্রবল রূপ ধারণ করে। সেই

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তিনি। ১৯৬৩-৬৪ সালে রোকেয়া হলের ভিপি নির্বাচিত হন ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে এবং ১৯৬৪ সালে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একটি প্যানেলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ডাকসু ভিপি রাশেদ খান মেনন, যেটা পরিচিত ছিল চীনপন্থী হিসাবে। সোভিয়েত পন্থী প্যানেল হিসেবে পরিচিত অংশে ডাকসু, জিএস মতিয়া চৌধুরী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে মোনায়েম খাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে না দেওয়ার কারণে মতিয়া চৌধুরীর নামে ওয়ারেন্ট জারী হয়। ফলে ক্লাস করতে পারতেন না। এম এস সি পরীক্ষাও দিতে পারেননি। এ বছর রাজনৈতিক সহকর্মী ও সাংবাদিক বজলুর রহমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি।

পুলিশের আইজি তাঁর বাবাকে মোনায়েম খানের কাছে নিয়ে গিয়ে নানান ভাবে শাসান, “যদি মেয়েকে কন্ট্রোল করতে না পারেন তবে আপনার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেয়া হবে।” এভাবে বিভিন্ন রকম হয়রানি করায় তাঁর বাবা অকালে অবসর নিতে বাধ্য হন। ছাত্র আন্দোলন শেষে কমিউনিষ্ট পার্টি নারী আন্দোলনে জড়িত হওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি ন্যাপ এর ব্যানারে কাজ করেন এবং সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে পুলিশ কয়েকবার তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি গ্রেফতার হয়েছেন আবার ছাড়াও পেয়েছেন। ১১ দফার গণঅভুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকেই বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু তিনি সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শুরু করে নিঃশর্তভাবে সকল মামলা তুলে নিতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হলে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালে মতিয়া চৌধুরী বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে যান তিনি। এ সময় তাঁর গ্লান্ড টিবি হয়। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। এক মাস ২০ দিন চিকিৎসা শেষে বাসায় এলে ১৯৭৬ সালের ১৯ নভেম্বর আবার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ১৯৭৯ সালে মতিয়া চৌধুরী আওয়ামীলীগ এ যোগ দেন। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের নয় বছরের শাসনকালে তিনি আটবার পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে জেল খেটেছেন। কিন্তু আপোষহীন অগ্নিকন্যা থেমে থাকেননি। এই আপোষহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনগণের ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় সন্তান শেখ হাসিনা। ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম বেগম ফজিলাতুননেসা। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাস করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি প্রখ্যাত পরমানু বিজ্ঞানী ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দুটি সন্তান। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনা আজিমপুর গার্লস স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। ১৭ সেপ্টেম্বর স্কুলে ধর্মঘট করে ছাত্রী মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় এস. এম হলের কাছে পুলিশের তাড়া খেয়ে রোকেয়া হলে আশ্রয় নেন। আর এটাই তার রাজনীতিতে আগমনের ক্ষেত্রে প্রথম ছাত্র মিছিল। ১৯৬৬ সালে তিনি ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রী থাকাকালে কলেজ ছাত্রী সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে ছাত্রলীগের রোকেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হল শাখাকে সংগঠিত করেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনাকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকবার পুলিশ গ্রেফতার করে। যেমন ১৯৮৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ৩০ জন দলীয় নেতাসহ গ্রেফতার হয়ে ১ মার্চ মুক্তি লাভ করেন। ২৯ নভেম্বর আবার গ্রেফতার হয়ে মুক্তি লাভ করেন ১২ ডিসেম্বর। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের শেখ হাসিনাসহ অন্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার এবং নির্বাচনের পর মুক্তি দান করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর গৃহবন্দী হয়ে তিনি ১০ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান চলাকালে পুনরায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এ ধরনের রাজনৈতিক জুলুম ও অত্যাচার শেখ হাসিনাকে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ও সহনশীল করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৯০ এর দশক এবং পুলিশ হেফাজতে নারী

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৯০ এর দশক এবং পুলিশ হেফাজতে নারী

পুলিশ

বলা হয় পাঁচটি ইংরেজী শব্দের আদ্যক্ষর নিয়েই "পুলিশ" শব্দটি গঠিত। যেমন "পোলাইট" (অর্থ ভদ্র) থেকে "পি", ওবিডিঅ্যান্ট (বাধ্যগত বা কর্তব্য পরায়ন) থেকে 'ও', 'লয়েল' (অনুগত) থেকে 'এল', "ইনটেলিজেন্ট" (বুদ্ধিমান) থেকে 'আই' 'কারেজিয়াস' (সাহসী) থেকে 'সি', এবং 'এফিসিয়েন্ট' (দক্ষ) থেকে 'ই'। কিন্তু এসব মাহাত্ম্যপূর্ণ শব্দ বাংলাদেশের পুলিশের সঙ্গে আদৌ কি মানায়?

পূর্বে পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগ করার সময় বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে দেখা হতো। পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করার জন্য যার বিষয়টি বিবেচনা করা হতো সে চোর, ডাকাত বা সমাজাবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত কিনা সে বিষয়ে তো খোঁজ খবর নেয়া হতোই এমনকি তার বংশে ও ইতিপূর্বে কেউ এ ধরনের কাজ করেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হতো। কিন্তু এখন আর এসবের বালাই নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ মাত্র সাড়ে তিন বছর এবং তার ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ দ্বিতীয় দফায় পাঁচ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বুঝে-শুনে পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপক হারে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালে অফিসার পদে যেসব মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, বি.এন.পি জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার তাদের আওয়ামী লীগার হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্তি দেখিয়ে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে আবার স্বাভাবিক কারণেই অনেকের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছরের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কখনো সামরিক পোশাকে, আবার কখনো বেসামরিক পোশাকে সে প্রায় ২৫ বছর ধরে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। অতীতের সামরিক শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরন করে ক্ষমতা দখলকে আইনানুগ করার উদ্দেশ্যে তারা সেনা ছাউনিতে বসে রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। এসব রাজনৈতিক দলের পিতৃপরিচয় ভিন্ন হলেও মাতৃপরিচয় এক। অতএব কর্মকান্ডও প্রায় অভিন্ন। তাদের সুদীর্ঘ শাসনামলে (২৫ বছরে) পুলিশসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব লোক নিয়োগ করা হয়েছে, সে সংগে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনীতির লোকই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়ে যার পরিবারে স্বাধীনতা বিরোধী লোক আছে, তাকে নিয়োগ দেয়ার উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য সরকারী চাকরিতে প্রায় অবহেলিত ছিল।

দুই সামরিক শাসক এবং তাদের বাইপ্রডাক্ট রাজনৈতিক সরকারের আমলে যারা সরকারী বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীতে চাকরী পেয়েছেন, তারা প্রমাণ করে চলেছেন যে, তারা মনে প্রানে আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধু বিরোধী। বিগত বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলে পুলিশ দিয়ে পেটানো হয়েছে বিভিন্ন সরকার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দদের, নৃশংসভাবে নারী নেত্রীদের ওপর বর্বর হামলা চালানো হয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাদের উপর চালানো হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। মহিলা পুলিশ দিয়ে মহিলাদের গ্রেফতার সহ তাদের হেফাজতে রাখার কথা। কিন্তু মহিলাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে জোট সরকারের মদদপুষ্ট পুরুষ পুলিশ মহিলা নেতা-কর্মীদের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ও তাদের নির্যাতন কৌশল থেকে বাদ যায়নি। রীতিমতো তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে ব্লাউজ ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্বাস পর্যন্ত টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছে নারী কর্মীদের যা বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় দেখেছে জনগণ। এ সরকারের আমলে প্রকাশ্য রাজপথে নারী কর্মীদের নিগ্রহ অসভ্যতার সকল সীমারেখা অতিক্রম করেছে। উপমহাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিষ্ট নেত্রী ইলা মিত্রের উপর নিষ্ঠুর বর্বর নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি করেছে জোট সরকার।

দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে একাধারে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, অপহরণ, ডাকাতি, দূর্নীতি, ধর্ষণ, জমি ও বাড়ি দখল এবং টাকা লুটসহ গুরুতর অভিযোগের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। একের পর এক প্রকাশ হয়েছে এসি আকরাম, এসপি মোফাজ্জল, সার্জেন্ট আসাদুজ্জামান ও জুলফিকার আলীদের মতো দূর্নীতিবাজ ও অপরাধী পুলিশ সদস্যের নানা অপকর্মের খবর। গত আড়াই বছরে (২০০৫ সালের রিপোর্ট) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ৪০ হাজার সদস্যকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও নারী কেলেংকারীসহ নানা ধরণের অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এবং প্রমাণও মিলেছে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন

পুলিশ বাহিনী এবং এর অন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলো যথা সি আই ডি, এসবি এবং ডিবি, দুটি নিরাপত্তা সংস্থা যথাক্রমে এন এস আই এবং ডিজি এফ আই এবং আধা সামরিক বাহিনী একত্রে সমগ্র দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের সময়

Dhaka University Institutional Repository

আসামির ওপর অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং নিপীড়ন একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে।

আটক কালে নিপীড়ন দ্বারা ভীতি সঞ্চার করে আসামি বা তার পরিবারের নিকট হতে স্বীকারোক্তি বা উৎকোচ আদায় এখন একটি প্রচলিত ধারা। একইভাবে সন্দেহভাজন আসামিকে গ্রেফতারের সময় বা গ্রেফতার কার্যকর করার পূর্বে প্রহার করাও নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে। খবরের কাগজ থেকে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ২০০১ সালে আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের দ্বারা ৫৪ জন হত বা আহত হয়। এর মধ্যে রয়েছে পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী ও সামরিক বাহিনী। মৃত ব্যক্তিদের অনেকেই মিছিল বা মিটিংয়ে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর বেপরোয়া গুলি বর্ষণের ফলে নিহত হয় ; অন্যদের মৃত্যু হয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংঘর্ষ বন্ধ করার সময়।

পুলিশের বিরুদ্ধে অমানবিক নির্যাতনের অভিযোগ

(৩০ মার্চ ২০১১, প্রথম আলো।)

রংপুরের বদরগঞ্জ থানার পুলিশের দুই কর্মকর্তা ও দুই সদস্যের (কনস্টেবল) বিরুদ্ধে রংপুর বিচারিক হাকিমের আদালতে অভিযোগে দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ দাবি ও অমানবিক নির্যাতনের অভিযোগটি করেন উপজেলার মুন্সিপাড়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক শংকর কুমার সরকার (৩২)। আদালত অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য রংপুরের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শংকর কুমার সরকার তার অভিযোগে উলেখ করেন, একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলায় থানার উপপরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম তাকে ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ বিকেলে গ্রেপ্তার করেন । একপর্যায়ে ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাকে শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন । তার চিৎকার ও আর্তনাদ মুঠোফোনে বড় ভাইয়ের স্ত্রী রত্না সরকারকে শোনান এবং তার কাছে ৪০ হাজার টাকা দাবি করেন পুলিশের ওই কর্মকর্তা । বিনিময়ে শংকর কে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন । পরে রত্না সরকার পুলিশের ওই কর্মকর্তাকে ১০ হাজার টাকা দেন । টাকা কম দেওয়ায় সিরাজুল ইসলাম ক্ষিপ্ত হয়ে রত্নাকে চড় মারেন ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন । অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়,১১ ফেব্রুয়ারী রাত একটার দিকে ওই পুলিশ কর্মকর্তা একদল পুলিশসহ শংকরের বাড়িতে হানা দেয় । বাড়ির লোকজনকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘরে ঢুকে তল্লাশির নামে প্রায় ৯০ হাজার টাকার স্বর্ণালংকার নিয়ে যায় । পরের দিন ১২ ফেব্রুয়ারী সকালে থানার একটি কক্ষে শংকরকে নিয়ে আরেক উপপরিদর্শক রাজেন্দ্র, পুলিশ সদস্য মো: জাহান ও মনতেজার আলীর সহায়তায় তাকে ফের নির্যাতন করা হয় । এ সময় তার মলদ্বারে মরিচ ঢুকিয়ে চাঁদাবাজি করার স্বীকারেক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। জামিনে জেল হাজত থেকে বেরিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন চিকিৎসা নেন।

জনরোষের কবলে থানার ওসি

(৪ এপ্রিল,২০১১, প্রথম আলো।)

সাধারণত চিহ্নিত অপরাধী চক্র নিরীহ ব্যক্তিদের আটক করে মুক্তিপণ দাবি করে থাকে, আর পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু এবার চট্টগ্রাম মহানগরের কোতয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বিরুদ্ধে অভিযোগ

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে যে তিনি নিজেই খাতুনগঞ্জের এক ব্যবসায়ীকে আটক করে ২০ লাখ টাকার মুক্তিপণ দাবি করে বসেছেন। এখন কে কার বিচার করবে? এই গুরুতর অপরাধের আইনসম্মত প্রতিকারের আশায় বসে থাকার মতো ধৈর্য ব্যবসায়ীদের ছিল না। তারা দলে দলে থানা ঘেরাও করলে আটক ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

খাতুনগঞ্জের একজন ব্যবসায়ীর অপর এক ব্যবসায়ীর কাছে ৭৮ লাখ টাকা পাওনা ছিল। সময়মতো পরিশোধ না করায় তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। খাতুনগঞ্জে সাধারণত বিশ্বাসের ওপর মুখের কথায় এ রকম বড় অঙ্কের মালামালের লেনদেন হয়ে থাকে। বিরোধ দেখা দিলে আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনাতেই মীমাংসা হয়। কেউ থানা পুলিশের শরণাপন্ন হলেও আলোচনার মাধ্যমেই বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে থানার ওসির ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। তিনি পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে পাওনাদারকেই আটক করলেন।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী (র‍্যাবের)বাহিনীর চরম নিষ্ঠুরতা

(প্রথমআলো , ৬ এপ্রিল, ২০১১ ।)

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর চোখে ২০১০ সালে সবচেয়ে উদ্বেগজনক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ছিল র‍্যাব ও পুলিশের ক্রসফায়ার ও অমানবিক নির্যাতন; এ বছরের চিত্রও ভিন্ন নয়। শুধুমাত্র সন্ত্রাসী সন্দেহে ২০১১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী লিমনের বাম পায়ে গুলি করে র‍্যাব । ফলে তার বাম পা কেটে ফেলতে হয়,পঙ্গু হয়ে যায় এক সংগ্রামী কিশোরের জীবনের চলার পথ।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতন

নারী নেত্রী বা নারী আন্দোলন কর্মীরাও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর এবং পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাননি। ইতিহাসেও এ ধরণের ঘটনার অনেক নজির আছে। এর একটি জ্বলন্ত উদারহণ হচ্ছে, কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃক ইলা মিত্রের চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা। অতি সম্প্রতি পুলিশ সম্ভবত নারী রাজনীতিকদেরকে মিছিল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য বিশেষভাবে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। নারী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নির্যাতন একটি নব্য প্রবণতা হয়তো। কেননা গত দুটি নির্বাচিত সরকারের আমলে এমন সব ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। মিছিলে আওয়ামীলীগ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং সংসদ সদস্য মতিয়া চৌধুরীর উপর পুলিশী আক্রমনের বিষয়টি একটি উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বর্ণনা অনুযায়ী ২০০১ সালের ২ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগ আহূত হরতালের দিন নেতারা যখন দলীয় কার্যালয়ের বাইরে সমবেত হন মিছিল বের করার জন্য, সে সময় পুলিশ বাছবিচারহীন ভাবে তাদের পেটাতে থাকে ও আওয়ামীলীগের সিনিয়র নেতাদেরকে দলীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধ্য করে। পুরুষ এবং মহিলা পুলিশরা অন্যদেরসহ মতিয়া চৌধুরীকে ঘিরে ফেলে, যেহেতু তারা রাস্তায় বসে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। ফটো সাংবাদিকরা মতিয়া চৌধুরীর ওপর পুলিশের লাঠিপেটার দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। সে সময় তিনি রাস্তায় পড়েছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণের অধিকার হরণ করার জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৯ সালের ১১ মে হরতাল চলাকালে একই ধরণের দৃশ্য ধারণ করেন ফটো সাংবাদিকরা, যখন পুলিশ বিএনপির সংসদ সদস্যদের বেদম লাঠিপেটা করে এবং ঢাকার বিজয় নগর এলাকার একজন নারী কর্মীকে প্রায় নগ্ন করে ফেলে। ছবিতে দেখা যায় যে, মুন্নী বেগম নামের বিএনপি কর্মী যখন পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছিলেন তখন শাড়ি ধরে একজন মহিলা পুলিশ তাকে টানছিল। বিএনপি নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, মুন্নী বেগমসহ অন্যান্য নারী কর্মীর সাথেও পুলিশ দূর্ব্যবহার করেছে।

পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণ ও মৃত্যু (দিনাজপুরের ইয়াসমিন) ১৯৯৫

দিনাজপুর জেলার কোতয়ালি থানার গোলাপবাগ রামনগর গ্রামের এমাজউদ্দিনের কিশোরী কন্যা ইয়াসমিন আক্তার কাজ করত ঢাকার ধানমন্ডির একটি বাসায়। ১৯৯৫ সালের ২৩ আগষ্ট মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইয়াসমিন ঢাকা থেকে ভোররাতে দিনাজপুরের দশমাইল নামক স্থানে পৌছে। এর কিছুক্ষন পর পুলিশের একটি ভ্যান সেখানে পৌছায়। এএস আই মইনুল হক, কনস্টেবল আব্দুস সাত্তার ও ভ্যান চালক অমৃতলাল বর্মন তাকে বাড়িতে পৌছে দেবে বলে ভ্যানে তোলে। দিনাজপুর দশ মাইল নামক স্থানে তারা ইয়াসমিনকে ধর্ষণ করে ও খুন করে। দিনাজপুর শহর থেকে ৫ মাইল দূরে রানীগড় মোড় ব্র্যাক অফিসের পাশে তার লাশ পাওয়া যায়।

১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট রংপুরের বিশেষ আদালত জেলা ও দায়রা জজ আবদুল মতীন এএস আই মইনুল, কনস্টেবল সাত্তার ও ভ্যান চালক অমৃতলাল

Dhaka University Institutional Repository

বর্মনের ফাঁসির আদেশ দেন। সাক্ষ্য- প্রমান গোপন করায় বাকিদের অন্য একটি মামলায় খালাস দেওয়া হয়।

৯ বছর পর ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় ২০০৪ এর ১ সেপ্টেম্বর রাতে কার্যকর হয়। মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত দুই পুলিশ এএস আই মাইনুল হক ও কনস্টেবল আবদুস সাত্তারের ফাঁসি ১ সেপ্টেম্বর রাতে কার্যকর হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামি ভ্যানচালক অমৃতলাল বর্মনের ফাঁসি কার্যকর হয় ২৯ সেপ্টেম্বর। দিনাজপুরের ইয়াসমিন এখন নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধের একটি প্রতীক। প্রতি বছর ২৪ শে আগস্ট পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসাবে।

পুলিশ হেফাজতে চট্টগ্রামের সীমা চৌধুরী ধর্ষণ ও হত্যা

১৬ বছর বয়সী সীমা প্রেমিকের সঙ্গে তার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের মগদাই ক্যাম্পের পুলিশ তাকে ৫৪ ধারায় আটক করে (৭ অক্টোবর ১৯৯৬) সেখান থেকে রাউজান থানায় নিয়ে যায়। রাতে থানায় ওসির কক্ষে চারজন পুলিশ তাকে ধর্ষণ করে। পরে ২ ফেব্রুয়ারী '৯৭ সি আইডি পুলিশ সীমার কোনো বক্তব্য ছাড়াই চার্জশীট প্রদান করে। এর ঠিক ৪ দিন পরে ৭ ফেব্রুয়ারী অসুস্থ সীমা 'নিরাপত্তা হেফাজতে' চিকিৎসার অভাবে মারা যায়।

পুলিশী হেফাজতে জুলেখা মৃধা -২০০১

২০০১ সালের জুন মাসে জুলেখা মৃধাকে পুলিশ অত্যাচার করে এবং স্থানীয় ওয়ার্ড চেয়ারম্যান তাকে হয়রানি করে। পুলিশ জুলেখার বাসায় আটকাদেশ ছাড়াই

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ করে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, জুলেখা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পুলিশের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দিয়েছে। ফলে তার কন্যাসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশি হেফাজতে নির্যাতিতা প্রিসিলা রাজ ২০০২

বিদেশী সাংবাদিক জাইবা মালিক ও ব্রুনো সরেনটিনের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দুই দেশি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক প্রিসিলা রাজ ও সালিম সামাদকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, দুই বিদেশী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে পর্যটক হিসেবে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ এবং রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতায় নিয়োজিত থাকার অভিযোগ আনা হয়। ২০০৩ সালের ১১ জানুয়ারী ওই বিদেশি সাংবাদিকদ্বয়কে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

প্রিসিলা রাজ বিদেশী সাংবাদিকদের দোভাষীরূপে দায়িত্ব পালন শেষে ঢাকায় ফেরার পথে রাজবাড়ী ফেরীঘাট থেকে গ্রেফতার করা হয় ২৫ নভেম্বর তারিখে। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে ইলেকট্রিক শক ও অন্যায় হুমকি দেয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পুলিশী হেফাজতে থাকাকালে তার প্রতি নির্যাতনের ঘটনা ২০০২ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে দৈনিক প্রথম আলো ও জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র দুটির তথ্য মতে ....

প্রিসিলা আদালতকে জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে রিমান্ডে নেওয়া হলে, তাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। পরে তাকে

Dhaka University Institutional Repository

ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি না দিলে তাকে আবার ইলেকট্রিক শক দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

পুলিশি নির্যাতন,গ্রেফতার অতঃপর পুলিশি হেফাজতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা ২০০৩

২০০৩ সালের ২৩ জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল এর সাধারণ আবাসিক ছাত্রীরা তাদের হল প্রভোষ্টকে অপসারণ ও নতুন প্রভোষ্ট নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দিনব্যাপী হলের ভেতর অবস্থান ধর্মঘট করে এবং সন্ধ্যার পরও এ ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। সাধারণ ছাত্রীদের প্রতিবাদের মূল কারণ ছিল অপসারিত প্রভোষ্ট অধ্যাপক সুলতানা শফি (যিনি আওয়ামীলীগ পন্থী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত) হলের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েকজন নেত্রীর অবৈধভাবে সিট দখল করে থাকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। হলের মূল গেটের ভেতরে প্রায় ৩০০ ছাত্রীর অবস্থান ধর্মঘট মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। রাত তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আনোয়ারউল্ল্যাহ চৌধুরীর নির্দেশে একদল পুরুষ পুলিশ গেট ভেঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্যবাহী ছাত্রী হলের ভেতরে প্রবেশ করে এবং নির্মমভাবে লাঠি ও ব্যাটন চার্জ করে ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে থাকে। প্রাণভয়ে ছাত্রীরা যখন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে, তখন পুলিশগাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়া মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে বের করে আনে ও বুট দিয়ে লাথি মারে। এমনকি পুরুষ পুলিশরা ছাত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

রুমের মধ্যেও প্রবেশ করে এবং সেখানে থেকে ঘুমন্ত ছাত্রীদের (যারা মিছিলে যায়নি) তুলে মারধর শুরু করে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। পুলিশের ব্যাটন চার্জে এবং বুটের নির্মম পদাঘাতে অনেক ছাত্রীই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। ওই গভীর রাতেই পুলিশ আন্দোলনকারী ১৮ জন ছাত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং ভোর রাতেই তাদের গ্রেফতার করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন বীভৎস ও নারকীয় পুলিশী হামলা, তাও আবার ছাত্রীদের হলের ভেতরে শুধু নজিরবীহিন নয়, জাতির মুখে এক অমোচনীয় কলঙ্কও বটে।

এ ঘটনা পরদিন দেশের প্রায় সবকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হলে দেশব্যপী ঘৃণা ও ধিক্কারের জোয়ার বয়ে যায়। পুলিশী বর্বরতা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণে দল-মত নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। স্বৈরাচারী কায়দায় ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করেন এবং পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করা হয়-শুধু এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে, ছাত্রছাত্রীরা যেন একসাথে সমবেত হতে না পারে এবং তাদের আন্দেলন স্তব্ধ হয়ে যায়। কর্তব্যরত সাংবাদিক এবং ছাত্রছাত্রীদের সাথে সংহতি জ্ঞাপন করতে আসা কয়েকজন বিবেকবান শিক্ষকের উপরও পুলিশ লাঠিচার্জ ও বুটের আঘাত করে। বাংলাদেশের জাতীয় পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসহ বিশ্বের প্রায় সবকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের বাংলা বিভাগে এ ঘটনা পুরো সপ্তাহ জুড়ে হেডলাইন হয়ে থাকে। ঘটনাটি আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের মর্যাদাকে দারুনভাবে ক্ষুন্ন করে। ক্রমেই পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

এবং কয়েক হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষনা করে। তাদের চারদিক ঘিরে থাকে প্রায় হাজার দুয়েক দাঙ্গা পুলিশ। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের কাছে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। উপাচার্য আনোয়ারউল্ল্যাহ চৌধুরী এবং তার প্রক্টর পদত্যাগ করেন। তবে ঐ আঠারো জন ছাত্রীর নামে মিথ্যা মামলা আরো কয়েক মাস ধরে চলে এবং তারা বিভিন্নভাবে পুলিশী হয়রানির শিকার হন। অন্যদিকে যেসব পুরুষ পুলিশ বিধি ভঙ্গ করে ছাত্রী হলে ঢুকে মেয়েদের এমন নারকীয় কায়দায় নির্যাতন করে, তাদের আজ পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়নি, ভবিষ্যতেও যে হবে, সেকথা কেউ বলতে পারে না।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ ক্যাম্পে গৃহবধূ ধর্ষণ ২০০৪

যে বছর দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় কার্যকর হয় সে বছরেই অর্থাৎ ২০০৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাতে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্পে ১৪ পুলিশ এক গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে।

ঐদিন সন্ধ্যায় গৃহবধূ সদর উপজেলার ভালাইপুর মোড়ে রিকশা-ভ্যানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় হাবিলদার রোকনউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঐ গৃহবধূকে কৌশলে ভয়ভীতি দেখিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এর পর ক্যাম্পের ছাদে নিয়ে একদল পুলিশ ঐ গৃহবধূকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা হাসপাতালের ছাড়পত্র জোরপূর্বক ধর্ষিতার স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা

ধর্ষণের শিকার গৃহবধূকে ১৯ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় ৪০ ঘণ্টা পর, ২০ ডিসেম্বর দুপুরে। কেন এরকম ঘটল ? চিকিৎসকরা কি জানেন না, সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষনের অনেক আলামতই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ? বিভিন্নভাবে ধর্ষিতা গৃহবধূকে যৌনকর্মী হিসাবে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়।

শুধু তাইই নয়, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আর এম ও ডাঃ শাহীদ আনোয়ার নির্যাতিত গৃহবধূকে পেছনের তারিখের ছাড়পত্রও স্বাক্ষর করানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গৃহবধূ গণধর্ষনে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বাঁচাতে তিনি এ অপচেষ্টা চালান। এর আগে তিনি ওই গৃহবধূকে বিবস্ত্র করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে গৃহবধূ নির্যাতন প্রতিকার সংগ্রাম কমিটি আরএমওর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

ধর্ষক দারোগা ও হাবিলদার ক্লোজড

(প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৯, ২০০৪।)

ঘটনার প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলম ডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সব পুলিশ সদস্যকেই একযোগে ক্লোজড করা হয়। প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে দেখা যায়, ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন। তারা অভিযোগ করে, ৪০ ঘন্টা পর ধর্ষিতা গৃহবধূর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ জন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা ২২ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদ দেখা যায়, গৃহবধূর ধর্ষণের ঘটনার বাদী হয়ে ১৬ জন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বাদীর বক্তব্য মতে, চারজনের নামসহ অজ্ঞাতনামা আরো ১২ জনের নামে অভিযোগ করা হয়।

মানবাধিকার ও অন্যান্য সংগঠনের ভূমিকা

সংবাদ মাধ্যম পরিবেশিত তথ্যে দেখা যায় স্থানীয় ও ঢাকার বিভিন্ন সংগঠন এ ঘটনার প্রশংসনীয় প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। পুলিশী তদন্তে যে তাদের আস্থা নেই একথা স্পষ্টভাবে তারা জানিয়েছে। তারা একথাও বলেছে পুলিশের অপরাধ চাপা দিতে তাদের ক্লোজড করা হয়। গঠিত হয় গৃহবধূ নির্যাতন প্রতিকার সংগ্রাম কমিটি। ঘটনার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় (চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, বরিশাল, পটুয়াখালী, গাইবান্ধা, রাজশাহী, খুলনা, মাগুরা ও যশোর) মানববন্ধন, জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ ও সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

মামলায় রায়

(ডেইলি স্টার,০৬/০৪/২০০৮)

চুয়াডাঙ্গার গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্পে গৃহবধূ ধর্ষণ মামলায় ওই ক্যাম্পের ইনচার্জসহ পাঁচ পুলিশের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর করে কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। চুয়াডাঙ্গার

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল-২ এর বিচারক মোতাহার হোসেন আসামিদের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় দেন।

দণ্ডাদেশ প্রাপ্তরা হলেন ক্যাম্প ইনচার্জ সুবেদার মোঃ আবদুল কুদ্দুস, হাবিলদার রোকনউদ্দিন, কনস্টেবল ইফতেখারুল কবির ওরফে সাকিল, কনস্টেবল হারুনুর রশিদ ও কনস্টেবল হারুন অর রশিদ। আদেশে বলা হয় জরিমানার আদায়কৃত অর্থের অর্ধেক নির্যাতিতা ক্ষতিপুরণ হিসাবে পাবেন এবং বাকি অর্থ সরকারী খাতে জমা হবে।

কিশোরগঞ্জে থানা হেফাজতে কিশোরী ধর্ষণ

(প্রথম আলো, ২৫/৪/২০০৭)

থানা হেফাজতে আবার একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এবারের ঘটনাস্থল কিশোরগঞ্জের কমিরগঞ্জ থানা আর অভিযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছে থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এস আই) নুরুজ্জামান।

ধর্ষিতা কিশোরী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করিমগঞ্জ থানায় মামলা করে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম মামলাটি নথিভুক্ত করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, কুমিল্লার ফতেপুর এলাকার ওই কিশোরীকে তার সৎমা এক মহিলার সঙ্গে মৌলভীবাজার জেলায় তার দাদির বাড়িতে পাঠান। ৫ মার্চ, ২০০৭ করিমগঞ্জের সুজাদিয়া বাজারে মেয়েটিকে বসিয়ে রেখে ওই মহিলা পালিয়ে যান। পরদিন লোকজন তাকে করিমগঞ্জ থানায় পৌছে দেন। এরপর এস আই নুরুজ্জামান তাকে থানা এলাকার ভেতর একটি তিনতলা ভবনে নিয়ে দুই রাত আটকে

Dhaka University Institutional Repository

রাখেন। ৭ মার্চ ২০০৭ তিনি মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন। পরদিন এক পুলিশ সদস্যকে ৪০০ টাকা দিয়ে মেয়েটিকে আদালতে চালান করে দিতে বলেন নূরুজ্জামান।

ওই পুলিশ সদস্য কিশোরগঞ্জে এনে মেয়েটিকে ২০০ টাকা দিয়ে একটি থ্রি-পিস কিনে দিয়ে বাকি ২০০ টাকা তার হাতে দেন।পুলিশ ও কারাগার সূত্র জানায়, কিশোরগঞ্জ কারাগারে নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা মেয়েটির গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি ১৭ এপ্রিল কারা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এরপর একজন মহিলা কারারক্ষীর মাধ্যমে তাকে কারাধ্যক্ষের কক্ষে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সে এস আই কর্তৃক ধর্ষনের শিকার হওয়ার কথা জানায়। অসহায় এই মেয়েটিকে জনগণ থানায় পাঠিয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। থানায় নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠিয়ে জনগণ যে কতটা ভুল করেছিল, তা টের পাওয়া গেছে মাস দেড়েক পর।

মামলা এবং এস আই নূরুজ্জামান গ্রেফতার

এই ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করিমগঞ্জ থানায় মামলা হওয়ার পর নিরাপত্তা হেফাজতে ধর্ষণের অভিযোগে ২২/৪/০৭ (রোববার) এস আই নূরুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশী হেফাজতে স্বৈরাশাসক প্রেসিডেন্ট এরশাদের দ্বিতীয় স্ত্রী বিদিশা এবং পুলিশ রিমান্ড

বিদিশার জন্ম ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। পিতা আবু বকর সিদ্দিক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিদিশার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে দেয়া হয় তাকে ইংল্যান্ডের

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক পিটার উইসনের সঙ্গে। এরপর বিদিশা লেখাপড়া করেছেন ইংল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে। ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের উপর ডিগ্রি নিয়েছেন লা- সালের সিঙ্গাপুর শাখা থেকে। ১৯৯৮ সাল থেকে জড়িয়ে পড়েন তিনি সাবেক সেনাশাসক এইচ এম এরশাদের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কে। এর পরিণতিতে বিয়ে, সংসার, ২০০৫ সালে ভেঙ্গেও যায় এ বিয়ে। এরশাদের দেয়া মিথ্যা চুরির মামলায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গুলশান থানা হেফাজতে বিদিশা

এরশাদের বাড়ী প্রেসিডেন্ট পার্ক থেকে তুলে এনে পুলিশ প্রথমে তাকে ওসি নূরে আলমের কক্ষে কিছুক্ষণ রাখে। বিদিশা বলেন,

"হঠাৎ পিছন থেকে ওসি নূরে আলমের হুংকার, ঢুকাও, এক্ষুনি ঢুকাও। এতক্ষণ ঢুকাও নাই কেন ? ঢুকাও। কিসের ভিআইপি, কিসের সিআইপি, খানকি মাগির জন্য আবার এত সম্মান কী। লাইথাইয়া ঢুকাও ভিতরে (থানা হাজতে)"। "আমি উঠবো না, ওরা আমাকে টেনে তুলবে। টানাটানিতে স্যালাইন দেয়ার জন্য আমার হাতে লাগানো ক্যানুলা খুলে গেল। ফিনকি দিয়ে সেখান থেকে রক্ত বের হতে থাকলো। কিন্তু তাতে ওদের কোন ভাবান্তর দেখলাম না, আমি যেন মানুষ নই। নীচ-ইতর প্রাণী কোন। অপর হাত দিয়ে আমি নিজেই রক্ত বের হতে থাকা জায়গাটা চেপে ধরলাম।

এই সুযোগে তারা কয়েকজন (পুলিশ) আমাকে টেনে দাঁড় করালো। একজন পিঠে জোরে ধাক্কা দিল। আমি সামনের দিকে পড়ে যেতে থাকলাম। পিছন থেকে একজন টেনে ধরলো আমার ওড়নার দুই প্রান্ত। ফলে জর্জেটের ওড়নাটি আমার

Dhaka University Institutional Repository

গলায় ফাঁসের মতো করে আটকে গেল। আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, জিভ বের হয়ে গেল। আমি নড়তে পারছি না।

এরই মধ্যে একজন মোটা একটি লাঠি দিয়ে গায়ের জোরে মারলো আমার তলপেটে। তলপেটে বাড়ি খেয়ে কোমর থেকে নিচের অংশটা যেন আমার অবশ হয়ে গেল। একটা বস্তার মতো পড়ে গেলাম মাটিতে। মাটিতে পড়ে যেতেই শুরু হলো আমার উপর বুটের লাথি, বুক, পিঠ, মাথা, পেট শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে পড়েনি সেই বুটের আঘাত। তবে তলপেট এবং তার আশে পাশের সংবেদনশীল এলাকার প্রতিই যেন তাদের আগ্রহ ছিলো বেশী। পিঠে মেরুদন্ডের লাথিগুলো আমার লাগছিল বেশী। আমি জ্ঞান হারালাম।"

বোটকা গন্ধযুক্ত ও বেআব্রু থানা হেফাজত

বিদিশা বলেন, চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম। দৃষ্টিতে ধরা পড়লো পলেস্তরা খসে খসে পড়ছে। এমন একটা ছাদ। ঠান্ডা শক্ত মেঝে, অমসৃন- এবড়ো থেবড়ো, স্যাতস্যাতে ঘর, ১০ ফুট বাই ১৪ ফুট হবে। একটা মাত্র দরজা, সেখানে আবার কপাটের পরিবর্তে মোটামুটি লোহার রড দিয়ে তৈরি গ্রিল। করিডোরের ঠিক অপর পাশে একেবারে মুখোমুখি একই রকম আরো একটি গ্রিলের দরজা। একই রকম আরেকটি ঘর। সে ঘরে কয়েকজন লোক বসে আছে, তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি যে ঘরে সেখানে কোন বাল্ব নেই, করিডোরে টিম টিম করে জ্বলতে থাকা একমাত্র বিজলী বাতি থেকে ছিটেফোটা কিছু আলো আসে সেই আলোতে ঘরের অনেক কিছুই প্রথমে আমি দেখতে পেলাম না। তীব্র ঝাঁঝালো একটা বোটকা গন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

এসে আমার নাকে ঝাপটা মারলো। প্রস্রাবের গন্ধ, প্রস্রাবের সঙ্গে অনেক কিছু মিশে গন্ধটাকে করে তুলেছে তীব্র, আরও অসহ্য।

ততক্ষণ অন্ধকারটা সয়ে গেছে আমার চোখে। দেখলাম ঘরের মধ্যেই পায়খানা, প্রসাবের জন্য উন্মুক্ত একটা টয়লেট। আশে পাশে তাকিয়ে দেখি প্রচুর তেলাপোকা, টিকটিকি, আবর্জনা, কয়েকটা ইঁদুরও দেখলাম নির্ভয়ে চলাফেরা করছে। প্যানটি দেখে আমার মনে হলো অনেকক্ষণ থেকে প্রসাবের বেগ চেপে ছিলাম। ওঠার কথা চিন্তা করতেই চোখ গেল লোহার গ্রিলের দিকে। সামনের ঘরের লোকগুলো এখনো তাকিয়ে আমার দিকে। প্যানটি এমন এক জায়গায় যে, প্রস্রাবের জন্য সেখানে বসলে তা থাকবে সামনের কক্ষের লোকগুলোর দৃষ্টি সীমানার মধ্যেই।

ধারণা করলাম এটাই বোধহয় থানা হাজত ? সামনেরটা পুরুষ আসামিদের জন্য আর আমারটি মেয়েদের। পুরুষদেরটিতে বেশ কয়েকজন থাকলেও মেয়েদেরটিতে আমি একাই।

বিদিশার রিমান্ড

গুলশান থানা হাজতে এক রাত থাকার পর বিদিশাকে পরের দিন কোর্টে আনা হয়। পুলিশরা তাকে রিমান্ডে নেয়ার জন্য আবেদন করেছিলো। বিচারক পুলিশের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করে। অতঃপর তাকে জামিনে নয়, পাঠানো হয় ৩ দিনের রিমান্ডে। গ্রেফতারের পরের দিন রাত সাড়ে আটটায় তার রিমান্ড শুরু হয়। প্রায় সারারাত রিমান্ডের নামে তাকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। মোবাইল, টাকা, গয়না চুরি এবং জিনিসপত্র ভাঙচুরের মামলা হলেও বিদিশার পাসপোর্টের হদিস করতে গিয়ে রাত দুইটার সময় এক প্রকার অভুক্ত অবস্থায় তাকে নেওয়া হয় কড়া পুলিশী

Dhaka University Institutional Repository

প্রহরায় তার বোনের বাসা উত্তরাতে। সেখান তার পাসপোর্ট না পেয়ে আবার তাকে গুলশান থানায় নেওয়া হয়।

পরের দিন সকালে আবার তার রিমান্ড শুরু হয়। এবার গুলশান থানায় নয়, একটি মোটা চাঁদরে মমির মতে তাকে পেচিয়ে নেওয়া হয় বারিধারার একটি অত্যন্ত রুচিশীল অফিসে। চাঁদরটি মোটা হওয়ার কারণে কিছু দেখার প্রশ্নই আসে না। এমনকি দম নিতেও কষ্ট হয়। বারিধারার সেই অফিস কাম দোতলা বাড়িতে নেওয়ার পর তার চাঁদর খুলে ফেলা হয় এবং তাকে কিছু খাবার খাইয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা শেষে তার গায়ে জ্বর থাকা সত্ত্বেও তার রিমান্ড শুরু হয়। রিমান্ড চলাকালীন সময়ে তাকে বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য করা হয় এবং সিলিং ফ্যানে ঝোলানোর ভীতি ও দেখানো হয়। উদ্ভট ও বানোয়াট প্রশ্ন বারবার করতে করতে এক পর্যায়ে তারা তাকে শুইয়ে দেয় এবং একজন ডাক্তারকে একটা ইনজেকশন দিতে বলে। বিদিশা বলেন,

ইনজেকশনটি দেয়ার পর আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম, সারা শরীরে অসহ্য ব্যাথা। এ ব্যথা অচেনা, জীবনে কোনদিন আমি এ ধরণের ভয়াবহ ব্যথার সঙ্গে পরিচিত হইনি। বিচিত্র সব অনুভূতি হতে লাগলো আমার। একটা জ্বালা-পোড়া আর অস্থির ভাব শুরু হয়ে গেল। চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল। চোখগুলো যেন কোটর থেকে বের হয়ে যাবে। চোখের পাতা খুললে মনে হয় মরিচের গুড়া দেয়া হয়েছে। আবার পাতা বন্ধ করলে মনে হয় আগুন দিয়ে তৈরি ও দু'টি এবং ওর তাপে গলে যাবে চোখের মনি।

আমি তাকাতে পারছি না।

আমি চোখ বন্ধ করতে পারছি না।

আমার শ্বাস ভারি হয়ে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাতাসের অভাবে হাঁসফাস করছি।

আমি মরে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি মরছি না।

আমার ঘুম আসছে না।

কিন্তু আমি জেগেও থাকতে পারছি না।

আমি কথা বলতে পারছি না, জিভ ভারি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি কথা বলার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আমি সব বলতে চাই। আমি যা জানি তা বলতে চাই।

যা জানি না, তাও বলতে চাই।

যা বললে ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে।

আমি তাই বলতে চাই।

প্রশ্ন আসছে সামনে থেকে, পাশে থেকে, পিছন থেকে।

গতকাল যে সব প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছিলো মনে হলো সেই সব বিষয়ই আসছে একের পর এক। ভারতে চিকিৎসা, প্রর্ণব মুখার্জী, র' এর চিফ/ ভারতে রাষ্ট্রদূত, এরশাদের বাসায় অতিথি, ব্রিফকেস ভর্তি টাকা, পাসপোর্ট, ব্যাংক একাউন্ট, এরশাদের মেয়ে বন্ধু, এরকম আরও অনেক প্রসঙ্গ যেন স্লো মোশনের মতো। আমার মগজের ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা করলো বারবার। কে একজন ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, মহিলা তো একই কথা বলছে। এই যাও বরফ নিয়ে আসো, বরফ ঢুকাও। সব বের হয়ে যাবে।

বরফ দিয়ে কী হবে ? কোথায় ঢুকাবে ? মহিলা পুলিশদের এরপরে নিচে পাঠিয়ে দেয়া হয়। চেয়ারসহ আমাকে একটু পিছনে দিকে সরিয়ে নেয়া হলো। দুটো

Dhaka University Institutional Repository

বলিষ্ঠ হাত আমার দুই কাঁধ চেপে ধরলো। পায়ের দিকেও হাতের স্পর্শ পেলাম। স্কার্ট পরা ছিলাম বলে কোন প্রকার বাঁধা ছাড়াই পা বেয়ে সে হাত উঠতে থাকলো ওপরের দিকে সরিসৃপের মতো। হঠাৎ করেই থেমে গেল সে হাত। "কী হলো?"

কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলো। "বরফ বোধহয় দেয়া যাবে না। মনে হয় ব্লিডিং হচ্ছে"। বিষয়টি নিশ্চিত হতে কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। টের পেলাম আমার স্কার্ট নিচ থেকে তোলা হচ্ছে উপরের দিকে। ঠান্ডা, বাতাস ঝাপটা মারলো পায়ে, হাটুতে, উরুতে আরও ওপরে। অথচ ঠান্ডা হাওয়ার পরিবর্তে শ্বাপদের গরম নিঃশ্বাস যেন পুড়িয়ে দিল আমার ত্বককে। কেউ একজন বললো, 'মহিলার বোধহয় গরম লাগছে' ওপরের প্যান্টিটাও খুলে দাও'।

একজন আবার প্রস্তাব করলো বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়ার। মনে পড়ে, সেই অবস্থাতেও আমি কিন্তু শুনেছিলাম ভিডিও করার কথা। বলা হচ্ছিল ভালভাবে, খুটিনাটি ভিডিও করার জন্য। তারপর ক্যাসেটটি কাকে যেন পাঠানোর কথাও বলা হলো। হাসতে হাসতে কে একজন এমনও বললো, 'কে বলবে তিন সন্তানের মা' যে ফিগার ! তিনি এই ক্যাসেট দেখে খুশিই হবেন।

আমি জানি না কে এই তিনি ? নারীত্বের চরম অপমান দর্শনে যিনি খুশী হন, কল্পনা করতে পারি না কেমন মানব সন্তান তিনি ? জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে বারিধারার সেই বাড়ি থেকে গুলশান থানায় নিয়ে আসা হলো।

রাতে আবার নেয়া হলো বারিধারায়, জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলের সামনে। আবার রিমান্ড, জিজ্ঞাসাবাদের নামে পৈশাচিক নির্যাতন। রাতের নির্যাতনের সময় এক পর্যায়ে মনে হলো, দুপুরেই বুঝি ভালো ছিল। রাতের নির্যাতনেরও অনেক খুঁটি নাটি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা মনে আছে। অতি সাধারণ অনেক ঘটনার একটি ছিল আমার হাতের নখ উপড়ে ফেলা।

বাঁ হাতের তর্জনীর নখটি তারা হাসতে হাসতে উপড়ে ফেলেছিলো। ইনজেকশনের প্রভাবে তখনও আমার চোখ বন্ধ, কিন্তু শারীরিক অনুভূতিগুলোর সবই ছিল স্পষ্ট, নখটি তোলার সময়, তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, আমি যেন তা দেখতে পাই, তাই দুজন হাত দিয়ে আমার চোখের পাতা খুলে ধরেছিলো। আর একজন আস্তে আস্তে প্লায়ার্স জাতীয় কি একটা দিয়ে আমার নখটি উপড়ে ফেলেছিলো।

এক পর্যায়ে তারা আবার নিয়ে এলো ভিডিও ক্যামেরাম্যানকে। আমাকে বললো, স্পষ্ট করে বলুন, গত এই তিন দিনে আপনাকে কোন প্রকার টর্চার করা হয়নি। খুবই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

এটাই শেষ নয়, তারপর তারা কিছু কাগজ নিয়ে এল, বললো সই করতে। দেখলাম, কয়েকটি কাগজে কী যেন লেখা, আমাকে কোন প্রকার অত্যাচার করা হয়নি-এরকম স্বীকারোক্তি। আবার কয়েকটি একেবারেই ফাঁকা। সেখানেও স্বাক্ষর করতে হলো। বুঝলাম পরবর্তীতে প্রয়োজন পড়লে এই ফাঁকা কাগজটিতে তাদের দরকার মাফিক কিছু লিখে নেয়া হবে।

এভাবে তৃতীয় দিন রাত ২টার দিকে আমার রিমান্ড শেষ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ ঃ পুলিশ কর্তৃক শিশু ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ ৩ দিনের রিমান্ডে

(দিনকাল, ২৫ নভেম্বর, ২০০০)

আট বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের নায়েক ফরিদ হোসেন মুন্সীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উত্তরা থানা পুলিশ তিনদিনের রিমান্ডে নিয়েছে। উত্তরা থানায় উত্তরা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের নায়েক ফরিদ বুধবার দুপুরে মরহুম শামসুল হকের এতিম মেয়েকে পেপসি খাওয়ানোর নাম করে তার রুমে ডেকে নেয়। সে আট বছরের এই শিশুর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। উত্তরা আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের অদূরে একটি বাসায় একটি শিশু তার মায়ের সঙ্গে বসবাস করতো। শিশু নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়েরের পর পুলিশ নায়েক ফরিদকে গ্রেফতার করে গতকাল সি এম এম আদালতে পাঠায়। পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। দারোগা খায়রুজ্জামান এই মামলার তদন্তভার পেয়েছেন।

ধর্ষিত শিশুটি জবানবন্দিতে পুলিশের নায়েক ফরিদকে দায়ী করেছে

রাজধানীর উত্তরায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের কলোনীতে ধর্ষণের শিকার সাত বছরের শিশুটি গতকাল শুক্রবার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএম এম) আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। পুলিশের নায়েক ফরিদউদ্দিন যে তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে জবানবন্দিতে শিশুটি সে কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

ফরিদউদ্দিনকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতের হাজতখানায় আনা হয়। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠানো হয়। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে তাদের হেফাজত নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গতকাল তারা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করেন। অবশ্য আদালত শিশুটিকে তার মায়ের হেফাজতে দিয়েছে। মামলার বাদী শিশুটির মা কারো সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না। গতকাল আদালতে সাংবাদিকরা তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন, কমান্ডার ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।

এদিকে এ ঘটনা নিয়ে আমর্ড পুলিশের সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। আমর্ড পুলিশের একটি অংশ অভিযুক্ত নায়েক ফরিদকে রক্ষার জন্য উত্তরা থানা পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আর অপর অংশটি পুলিশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে নায়েক ফরিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে। উত্তরা থানায় দায়ের করা মামলায় আর্মড পুলিশেরই পাঁচজন সদস্য সাক্ষী হয়েছেন। উত্তরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, শিশুটির মেডিকেল পরীক্ষা করা হলেও গতকাল রাত পর্যন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

ধর্ষণের শিকার মেয়েটির বাবা আর্মড পুলিশের (নন ইকুইপমেন্ট ফোর্স) সদস্য ছিলেন। তিনি পুলিশের রান্নার কাজ করতেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি মারা যাওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মানবিক কারণে মা ও মেয়েকে কোয়ার্টারে থাকার সুযোগ করে দেন। শিশুটির মা হাতের কাজ করে উপার্জিত অর্থ এবং স্বামীর পেনশনের টাকা দিয়ে সংসার চালান।

গ্রেফতারকৃত ফরিদের বাড়ি গোপালগঞ্জে। প্রায় ১২ বছর ধরে সে পুলিশে চাকরি করছে। ঘটনার চারদিন আগে তারা স্ত্রী ও সন্তানরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। ধর্ষণের শিকার শিশুটির মতো তারও একটি মেয়ে রয়েছে। অবশ্য নায়েক

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সে পুলিশকে বলেছে চক্রান্ত করে তার বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ লাইনের কতিপয় সদস্য এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত বলে সে দাবি করে।

কালিয়াকৈর পুলিশ ধর্ষণ করেছে গৃহবধূকে

(আজকের কাগজ ২৪ আগস্ট, ২০০০)

১৭ আগস্ট বিকেলে কালিয়াকৈর উপজেলার টান কালিয়াকৈর গ্রামে গাজীপুর পুলিশ লাইনের পুলিশ মহর আলীর বিরুদ্ধে নিজ বাড়ির ভাড়াটিয়া এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষিতা বাদী হয়ে থানায় মামলা (১৫(৮) ২০০০) দায়ের করেছে।

গৃহবধূ জানায় বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় মহর আলী (৫৫) আনারস কেটে দেয়ার কথা বলে ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। রাতে গৃহবধূ রিকশাচালক স্বামীকে ঘটনা খুলে বললে এ নিয়ে এলাকায় তোলপাড় হয়। গ্রাম্য সালিশে মীমাংসা না হওয়ায় সোমবার (২১ আগষ্ট) কালিয়াকৈর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

লালপুর থানার ওসি'র বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা

(আজকের কাগজ, ১৮ অক্টোবর, ২০০০।)

নাটোরের লালপুর থানার ওসি'র বিরুদ্ধে এবার নারী কেলেংকারীর অভিযোগ এসেছে। আলোচিত এই ঘটনাটি বর্তমানে জেলায় টক অব দি টাউনে পরিণত হয়েছে। এমনকি বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলেও ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়েছে। ওসির লালসার শিকার হয়েছে উপজেলার আরবার গ্রামের এক বিধবা। জানা গেছে, ওই মহিলার স্বামী মারা যাবার পর সন্তানসহ

Dhaka University Institutional Repository

ভাইয়ের সংসারে বসবাস করছিলেন। এ সময় পৈতৃক ও স্বামীর সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে লালপুর থানায় ১৯৯৯ সালের ১ আগস্ট একটি অভিযোগ দায়ের করেন। থানায় যাতায়াতকালে ওসি তাকে কুপ্রস্তাব দেয় ও তার সঙ্গে রাজশাহী গেলে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সহায়তা করবে বলে জানায়। কিন্তু মহিলা এ প্রস্তাবে রাজি না হলে ওসি তাকে নানাভাবে ঘুরাতে থাকে। ১৯৯৯ এর ১০ আগস্ট ওসির ঝাড়ুদার আসমত ওসি ডাকে বলে তাকে থানায় ডেকে এনে আসমতের ঘরে বসার কথা বলে। পরে ওসি ওই ঘরে প্রবেশ করে উক্ত মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মহিলা ঘটনা প্রকাশের কথা বললে ওসি দীর্ঘদিন তাকে ঘুরাতে থাকলে ওই মহিলা গত ৮ সেপ্টেম্বর থানায় গিয়ে বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতির দাবি জানান। এতে ওসি ক্ষিপ্ত হয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে মহিলা মানবাধিকার সংস্থা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করে।

তরুণীকে ধর্ষণ চেষ্টা দিনাজপুরে পুলিশ গ্রেফতার

(সংবাদ, ২৬মে, ১৯৯৬)

দিনাজপুরে এক তরুণীকে ধর্ষণকালে গ্রামবাসী ঘেরাও করে ধর্ষণকারী দোষী পুলিশ কর্মকর্তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। দোষী পুলিশকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানানো হয়। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে দিনাজপুর সদর চাঁদগঞ্জ নামক এলাকায় অবস্থিত একটি চাল কলে এক তরুণীকে পুলিশ ধর্ষণ করছে বলে আশপাশ এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রায় হাজার খানেক লোক চালকলটি ঘেরাও করে।

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে লোকজন উত্তেজিত হয়ে ওঠে মিলের ভিতরে প্রবেশ করে অফিস ঘরের দরজা ভেঙ্গে মশিউর রহমান নামক একজন পুলিশের এ এস আইকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। আটক পুলিশ কর্মকর্তা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে কর্মরত রয়েছে।

কোতোয়ালী পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীকে ধর্ষণ নয়, আসলে ফূর্তি করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা ওই তরুণীকে শহর থেকে নিয়ে যায়। ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশের এ এস আই মশিউর রহমান ও জোবেদা নামক এই তরুণীকে ও গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। তাদের সহযোগী মজিদকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মিল মালিক আমজাদ আত্মগোপন করেছে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার নং ১৪৫৯ তাং ২৫ মে, ১৯৯৬।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ পুলিশ ও যুবদল নেতাসহ ৪ জন গ্রেফতার

(ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ১৯৯৫।)

চুয়াডাঙ্গায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে দুজন পুলিশ কনস্টেবল ও স্থানীয় যুবদলের একজন নেতাসহ মোট ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। (ইউএনবি)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাবার সঙ্গে ভেড়ামারা যাওয়ার পথে চতুর্দশী ঐ কিশোরীকে রেলস্টেশন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত ৪ ব্যক্তি নিকটবর্তী একটি ওষুধের দোকানে আটকে রাখে এবং পালাক্রমে ধর্ষণ করে। স্থানীয় লোকজন ঘটনাটি জানতে পেরে কিশোরীকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে এবং ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ধর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত ক্রুদ্ধ মানুষ বিক্ষোভ

Dhaka University Institutional Repository

মিছিল বের করে। গ্রেফতারকৃত ৪ ব্যক্তি হচ্ছে পুলিশ কনস্টেবল লুৎফর ও জব্বার, যুবদল নেতা বাচ্চু এবং শরিফ নামে অপর এক ব্যক্তি।

পুলিশকে ধর্মবাপ ডেকেও ছাড়া পায়নি আরতি

(জনকণ্ঠ,২৩ আগষ্ট,১৯৯৬)

পাষন্ড পুলিশ গৃহবধূ আরতি রানীর কোন কথাই শোনেনি। ধর্মের বাপ ডেকেও পুলিশের করুণা পায়নি হতভাগিনী আরতি রানী (২২)।সারারাত থানায় আটকে রেখে কয়েকজন নির্বোধ পুলিশ আরতির ওপর নানাবিধ নির্যাতন চালিয়েছে। চেষ্টা করেছে আরতির শ্লীলতাহানির। ফলে মুমূর্ষ স্বামীকে শেষবারের মতো এক নজর দেখতে পায়নি আরতি। এর জবাব কে দেবে ? এ ঘটনা ঘটে ৯ আগস্ট,১৯৯৬ ময়মনসিংহের ফুলপুর থানায়। গুরুতর অসুস্থ স্বামীর খবর,পেয়ে তাকে দেখতে যাচ্ছিল আরতির সঙ্গে ছিল দু প্রতিবেশী প্রদীপ ও পরিতোষ। অতি দায়িত্বশীল পুলিশ পতিতা সন্দেহে তাকে রাস্তায় আটক করে। বিভিন্ন প্রমাণ দেয়ার পরও তাদের ছেড়ে দেয়া হয়নি। টানা হেঁচড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। সঙ্গী প্রদীপ ও পরিতোষকেও তারা অন্যত্র আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে।

এই অমানবিক ঘটনার পরও উক্ত ৩ পুলিশের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে এলাকায় বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন সময় শান্তিভঙ্গ হতে পারে। ফুলপুর থানা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে নওয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে আরতি রানি প্রতিনিধিকে জানান, অসুস্থ স্বামী গিরীন্দ্র চন্দ্রকে ৯ আগস্ট, ১৯৯৬ দেখার জন্য দুজন প্রতিবেশী প্রদীপ ও পরিতোষকে নিয়ে রিক্সাযোগে নওয়া গ্রাম থেকে পাশ্ববর্তী ঢাকুয়া ইউনিয়নের

Dhaka University Institutional Repository

কন্ডলবালিয়া গ্রামে যাচ্ছিলেন। কন্ডলবালিয়া গ্রামে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে যেয়ে গিরীন্দ্র চন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

রাত ১১ টার দিকে রিক্সাটি ফুলপুর থানা সদরে পৌঁছলে বাসস্ট্যান্ডের কাছে টহলরত তিন পুলিশ কনস্টেবল সাত্তার, রফিক ও ইঞ্জিল 'পতিতা' সন্দেহে আরতিকে প্রদীপ ও পরিতোষসহ আটক করে। এ সময় আরতি রানী ঢাকুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইকরামূল হক তালুকদার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত একটি প্রত্যয়নপত্র দেখান। রাতে পুলিশী হয়রানির আশংকায় উক্ত চেয়ারম্যান ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে এই প্রত্যয়নপত্রটি দিয়েছিলেন। প্রত্যয়নপত্রটি দেখানোর পরও পুলিশ তাদেরকে টানা হেঁচড়া এবং গালাগাল করে থানায় নিয়ে যায় এবং একটি কক্ষে আরতিকে পালা করে মানসিক নির্যাতন চালায় এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ধর্মের বাপ ডেকে পায়ে পড়ে মাথা খুঁড়েছে আরতি পুলিশের কাছে। আরতির কাকুতি নিয়ে পুলিশ কনস্টেবল হাসি মশকরা আর তামাশা করেছে সারারাত। একই সাথে প্রদীপ আর পরিতোষের উপরও শারীরিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। তাদের অশ্রাব্য ও অশালীন ভাষায় গালাগাল করে।

এদিকে রাতের অন্ধকার পেরিয়ে ভোর হয়। ঘটনার সময় থানার ডিউটি অফিসার ও দারোগা প্রমাদ চন্দ্র মন্ডল থানায় ছিলেন না বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। অবশেষে সকাল বেলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে আরতিকে প্রদীপ ও পরিতোষ সহ ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ততক্ষনে সারা রাত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হতভাগ্য গিরীন্দ্র পরপারে চলে গেছেন। আরতি যখন স্বামীর কাছে পৌছেন ততক্ষণে সব শেষ। আরতি অভিযোগে আরও জানান, পুলিশ সারা রাত তাকে আটকে রাখার কারণেই স্বামীর সাথে শেষবারের মতো দেখা করতে পারেনি। আরতি ঘটনাটি বর্ণনাকালে বার বার ডুকরে কেঁদে উঠছিল। বুধবার ছিল আরতির স্বামীর শ্রাদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

দিন। আরতি জানায়, পুলিশ আর গ্রামের চেয়ারম্যান-মেম্বার-মাতব্বরদের বার বার তলবের কারণে শান্তিমত শ্রাদ্ধের কাজটিও করতে পারছি না। বার বার পুলিশ তাকে ডাকে। এদিকে ঘটনাটি জানাজানির পর ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইব্রাহিম ফাতমী এবং সহকারী পুলিশ সুপার গৌরীপুর সার্কেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পৃথকভাবে। একটি সূত্র জানায়, একটি মহল পুরো বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে কয়েকজন টাউট বাটপার।

পঞ্চগড়ে পুলিশ কর্তৃক শিশু ধর্ষণ, ধর্ষিতা নীলফামারী হাসপাতালে এখনো ডাক্তারি পরীক্ষা হয়নি

(জনকণ্ঠ ঃ ২৬/১২/১৯৯৬)

পঞ্চগড় পুলিশ লাইন মেসে পুলিশ কনস্টেবল কর্তৃক ধর্ষণের শিকার ছয় বছরের শিশু কন্যা এখন নীলফামারী সদর আধুনিক হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের ৩নং বেডে মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়নি। পুরুষ মানুষ দেখলে সে আঁতকে উঠছে।

১৭ জুন,১৯৯৬ পঞ্চগড় পুলিশ লাইনের সহকারী ম্যাচ ম্যানেজার কনস্টেবল (নং ৩০২) নাজিমউদ্দিন ছয় বছরের ওই শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করে পরে ঘটনা প্রকাশ ও মামলা না করার জন্য নাজিম উদ্দীন শিশুটির মাকে হুমকি প্রদর্শন করে। এরপর শুরু হয় পুলিশী প্রভাব বিস্তারের পালা। শিশুটিকে সংকটাপন্ন অবস্থায় পঞ্চগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশের প্রভাব এড়াতে তাকে নেওয়া হয় ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে, সেখানেও প্রভাব ফেলে পুলিশ। বাধ্য হয়ে তাকে পুনরায় পঞ্চগড় হাসপাতালে নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সিভিল সার্জন আইন শৃঙ্খলার অবনতির অজুহাত দেখিয়ে শিশুটিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেও পুলিশী প্রভাবে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয় শিশুটি। পুলিশ প্রশাসন সেখানে তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বলে শিশুটির অভিভাবকরা জানায়। এরপর শিশুটির মরণাপন্ন অবস্থা দেখে ২৩ জুন শুক্রবার অভিভাবকরা শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে আসে নীলফামারী সদর আধুনিক হাসপাতালে।

এদিকে অভিযুক্ত হাকিম জামিনে মুক্ত হয়ে এখন প্রকাশ্যে ওয়াজেদ আলীর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থাসহ স্থানীয় বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন এই ধর্ষিত কিশোরীর বিচার পাবার পরিবর্তে ধর্ষণের আলামত নষ্ট করার এবং আসামীকে ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে মামলা নষ্ট করার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে বিবৃতি দিয়েছে।

ঘটনার চারদিন পর স্থানীয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের চাপের মুখে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে এবং তদন্ত কমিটি গঠন করলেও এ যাবৎ কমিটি তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেনি এবং শিশুটির ধর্ষণের ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নীলফামারী হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ খোরশেদ আলম নীলফামারী থানাকে বিষয়টি অবহিত করলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুস সামাদ ২৪ জুন রাতে শিশুটিকে দেখার জন্য হাসপাতালে যান। তিনি পঞ্চগড় থেকে মামলার আইওকে নীলফামারীতে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়। শিশুটি ১ মিনিটের জন্যও ঘুমাতে পারছেনা। সে ডাক্তারসহ যে কোন পুরুষ মানুষ দেখলে আঁতকে উঠছে। ধর্ষিতার অভিভাবকরা স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

থানায় বিচার চাইতে গিয়ে ধর্ষিত কিশোরীর ৬ দিন হাজতবাস

(সূত্র:বাংলাদেশের মেয়ে শিশু, সেলিনা হোসেন।)

সাতক্ষীরা, ২৫ ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা) ধর্ষণের বিচার চাইতে এসে ৬ দিন হাজতবাস করতে হয়েছে কিশোরী জাহানারাকে। আর পুলিশের পিক আপ ভ্যানের তেল খরচ দিতে না পারায় ২৪ ঘণ্টা হাজতে থাকতে হয়েছে কিশোরীর পিতাকে। ধর্ষিতার মেডিকেল্ পরীক্ষা করতে না দিয়ে পুলিশ ধর্ষণকারীকে ৫৪ ধারায় চালান দেয়। ৬ দিন থানা হাজতে আটক কিশোরীকে সর্বমোট তিনবার মাত্র খেতে দেওয়া হয়েছে। এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে সাতক্ষীরা সদর থানায়।

সাতক্ষীরা সদর থানার মৃগিডাঙ্গা গ্রামের দিনমজুর ওয়াজেদ আলীর কন্যা জাহানারা (১৩)। রাস্তার পার্শ্বে সরকারী খাস জমিতে কুঁড়ে ঘরে ওয়াজেদ আলীর বসবাস। গত ১১ ডিসেম্বর রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জাহানারা বাইরে এলে প্রতিবেশী হাকিম জাহানারাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। একটি ঘরে দুবার তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ঐ রাতেই অনেক খোঁজাখুঁজির পর জাহানারা বাবা-মা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। পরদিন দিনমজুর ওয়াজেদ আলী গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ স্থানীয় বাঁশদহা ইউপি সদস্য আনোয়ার হোসেনের কাছে মেয়ে ধর্ষণের নালিশ জানান। অনেকেই ঘটনাটি চেপে যাবার পরামর্শ দেন। গ্রামে বিচার হবে না ভেবেই ওয়াজেদ আলী ধর্ষিত মেয়েকে নিয়ে ১৩ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি লিখিত এজাহার দেন।

ঐদিন থানার কর্মরত দারোগা ধর্ষিত জাহানারা ও তার বাবাকে বলেন, তাদের অভিযোগ মিথ্যা। এ কারণে মেয়ের মেডিক্যাল করানো হবে না। এই অবস্থায় দারোগা কিশোরীকে থানা হাজতে আটক রাখেন। আর মেয়ের বাবাকে বাড়ি থেকে

Dhaka University Institutional Repository

খাবার আনার জন্য চলে যেতে বলেন। পরদিন ১৪ ডিসেম্বর ঐ দারোগা মৃগিডাঙ্গা গ্রামে গিয়ে অভিযুক্ত হাকিমের বাড়িতে উঠেন। সেখানে খবর পাঠানো হয় দিনমজুর ওয়াজেদ আলীকে। ওয়াজেদ আলীকে দেখেই দারোগা বলেন, তুই থানায় যাসনি ক্যান ? এই পিক আপ ভ্যানের তেল খরচের জন্য ৩শ টাকা নিয়ে আয়।

পরদিন দিন মজুর ওয়াজেদ আলী থানা হাজতে আটক মেয়ের জন্য কিনে আনেন সামান্য মুড়ি চানাচুর। পিক আপ ভ্যানের তেল খরচ ৩শ টাকা দিতে না পারায় ওয়াজেদ আলীকে গলাধাক্কা দেওয়া হয়। তেলের টাকা দিতে না পারায় জাহানারা বাবাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় হাজতে। ২৪ ঘণ্টা হাজতে আটক থাকার পর ওয়াজেদ আলীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ধর্ষিত জাহানারা আটক থাকে ৬ দিন। ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর এই ৬ দিন থানা হাজতে আটক থাকা অবস্থায় ৩ বার ভাত ছাড়া আর কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি। থানা থেকে ছাড়া পেয়ে জাহানারার বাবা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের টেলিফোনেই জাহানারাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বগুড়ায় গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ঘটনার নায়ক পুলিশ কনস্টেবল

(দিনকাল, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০।)

বগুড়ায় পরমানু কেন্দ্রে রোগ নির্ণয়ের জন্য আসা অসহায় এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানি করেছে কোতোয়ালি থানার মুন্সী কনস্টেবল আরশাদ হোসেন। গত ২৯ আগষ্ট রাতে শহরে মোমিন আবাসিক বোর্ডিং এ ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, কিছুদিন আগে ওই গৃহবধূর থাইরোয়েড সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে তিনি রাজশাহী পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগ পরীক্ষা করতে যান। সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে তাকে গত ২৯ আগষ্ট বগুড়া পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গৃহবধূর সাথে তার মামাও ছিলেন। ওইদিন বগুড়া পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে আবারো পরদিন আসতে বলা হয়। যেহেতু তাদের বাড়ি দূরে এবং পরদিন ৩০ আগষ্ট পূর্ণদিবস হরতাল ছিল তাই তারা ওইদিন বগুড়ায় রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা শহরের কয়েকটি আবাসিক হোটেলে যায়। কিন্তু পুলিশী হয়রানির ভয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের থাকতে দিতে রাজি হয় না। তারা কোতোয়ালি থানায় আসে এবং পুলিশের সহযোগিতা চায়। তখন কনস্টেবল আরশাদ হোসেন তাদেরকে আশ্বস্ত করে হোটেল মোমিন এ ফোন করে এবং হোটেলের ম্যানেজারকে দুদিনের জন্য ওই গৃহবধূ এবং তার মামার জন্য ১১ নং রুম বরাদ্দ দিতে বলে। আরশাদের ফোন পেয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের দু'জনের জন্য ১২ নং রুম বরাদ্দ দেয়। এরপর সন্ধ্যার দিকে কনস্টেবল আরশাদ ওই হোটেলে আসে। রাত সাড়ে ১২ টার দিকে সে আবারো ওই হোটেলে যায় এবং রুমে ঘুমিয়ে থাকা ওই গৃহবধূ ও তার মামাকে ডেকে তোলে। জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে সে ওই গৃহবধূর মামাকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেন এবং গৃহবধূর রুমে ঢোকে। এরপর কনস্টেবল আরশাদ ওই গৃহবধূকে ও ভয়-ভীত দেখিয়ে তার শ্লীলতাহানি করে।

বগুড়া পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, পরদিন সকালে ওই গৃহবধুকে তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখেছেন এবং তার চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপও ছিল যা তারা আগে লক্ষ করেনি। ওই চিকিৎসা কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, গৃহবধূর মামা তাকে জানায়, পুলিশ তার ভাগ্নীর শ্লীলতাহানি করেছে। এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে ওই গৃহবধূকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, এ নিয়ে হৈ চৈ হলে তার সংসার নষ্ট হতে পারে তাই সে এ বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায় না।

হোটেল মোমিন এর ম্যানেজার জানিয়েছেন, কনস্টেবল আরশাদ হোসেনের অনুরোধেই আমরা তাদের একটি ডাবল রুম দেই। আরশাদ সন্ধ্যা ৭টার সময় একবার খোঁজ নেয় এবং গভীর রাতে তিনি আবারো এখানে আসেন। এরপর তিনি ঘুমন্ত মামা ও ভাগ্নীকে ডাকতে বলেন। এ সময় তাদের ডেকে তুললে আমাদের ও গৃহবধুর মামাকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং কিছুক্ষণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারা দুদিনের জন্য রুম ভাড়া নিলেও পরদিন সকালেই তারা হোটেল ত্যাগ করে। হোটেলের সুপারভাইজার জানান, আরশাদ প্রতিদিন রাতে শহরের ৩০/৩৫ টি আবাসিক হোটেলের খোঁজ নেন এবং সন্দেহ হলে মহিলা বোর্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এ ব্যাপারে আরশাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে সে জানায়, ওই মহিলা ও তার সাথে আসা পুরুষটির সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়ায় সে তা যাচাইয়ের জন্য ওই গৃহবধূর ঘরে ঢোকে। তবে তার শ্লীলতাহানি হয় এমন কোন আচরণ সে করেনি। বরং ওই মহিলাই তার হাত ধরেছে।

বাহাদুরাবাদ ঘাটে ট্রেনের বগিতে দৃষ্টিহীন তরুনী ধর্ষণের শিকার

(প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর, ২০০১)

রেলওয়ের আন্তনগর একতা ট্রেনের বগিতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে ঢাকা জি আরপির দুজন আনসার সদস্য এখন শ্রীঘরে। গত

Dhaka University Institutional Repository

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রেলওয়ের বাহাদুরাবাদ ঘাটে এই পাশবিক ঘটনা ঘটে। গতকাল শনিবার ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

ধর্ষিতার সঙ্গী শারীরিক প্রতিবন্ধী আব্দুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ওই দুই আনসারের অসৎ উদ্দেশ্য টের পেয়ে সে ঘাটের লোকজনকে খবর দিলে বিপুল সংখ্যক লোকজন ধর্ষিতাকে উদ্ধার এবং মিনহাজ ও মিজান নামের দুই আনসার সদস্যকে আটক করে জিআরপি থানায় সোপর্দ করে। এদিকে ধর্ষিতা জামালপুর জি আর পি ওসির কাছে দেওয়া তার জবানবন্দিতে বলেছে, যে দুই ব্যক্তি আব্দুল করিমকে ধমকিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল ওই দুই ব্যক্তিই তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। তাদের কণ্ঠস্বর আঁচ করতে পেরেছে সে।

ধর্ষণ মামলার আইও জিআরপি ওসি শামসুল হক কোনো প্রকার তথ্য জানাতে বিব্রতবোধ করেন। তিনি বলেন, ধর্ষিতা নিরাপত্তা হেফাজতে রয়েছেন। গতকাল শনিবার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় ধর্ষিতার জবানবন্দি গ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ঃ আইনের রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকায়

(যুগান্তর, ১৭ অক্টোবর, ২০০০)।

রক্ষকদের ভক্ষকের ভূমিকা পালনের উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে বাগেরহাটে। বাগেরহাটে আইনের রক্ষক পুলিশের বিরুদ্ধে ভক্ষকের ভূমিকা পালনে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও সম্প্রতি আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের মারাত্মক অভিযোগ উঠছে। খোদ পুলিশের কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধেই। এক সপ্তাহে বাগেরহাট জেলায় পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশোর্ধ্ব বানভাসি এক মহিলাসহ ২টি ধর্ষণের ঘটনা এবং একটি শ্লীলতাহানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১১ অক্টোবর,২০০০ গভীর রাতে সদর উপজেলার বারুইপাড়া বাজারে বানভাসি আশ্রিত জনৈক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণকালে স্থানীয় ডিফেন্স পার্টির হাতে ধরা পড়েছে বারুইপাড়া ফাঁড়ি পুলিশের নায়েক মোঃ মকবুল হোসেন। তাকে গণপিটুনি দিয়ে ফাঁড়ি ইনচার্জের কাছে সোপর্দ করলে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য পরের দিন তাকে চুয়াডাঙ্গা আনসার ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে বদলি করা হয়। ১০ অক্টোবর,২০০০ রামপাল উপজেলা ফয়লাহাট বাজার এলাকায় স্লুইচ গেটের কাছে দিনের বেলায় ফয়লাহাট ক্যাম্প পুলিশের ব্যাটালিয়ন ফোর্স লালমিয়া ও তার সঙ্গী নজরুল ইসলাম এক যুবতীর ঘরে প্রবেশ করে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে। এ সময় ঘটনা টের পেয়ে স্থানীয় জনতা এদের হাতেনাতে ধরে ফেললেও এক পর্যায়ে নজরুল সুকৌশলে পালিয়ে যায়। অপরদিকে ৫ অক্টোবর,২০০০ রাতে থানায় সিসি ছাড়াই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে মংলা থানার এ এস আই মজিবুর রহমানকে (পিপিএম) বাগেরহাট পুলিশ সুপার তাৎক্ষনিকভাবে বাগেরহাট পুলিশ লাইনে ক্লোজ করে।

ধর্ষণকারীকে নয় ধর্ষিতাকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ

(ভোরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)

ধর্ষণের মামলা করতে এসে উল্টো গ্রেফতার হতে হয়েছে এক ধর্ষিতাকে। সাভার থানা পুলিশ ধর্ষিতাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ৩০ অক্টোবর,২০০০ রাতে সাভারের পাথালিয়া ইউনিয়নের চারিগ্রাম এলাকার ফেরদৌস, আহম্মদ ও নূরুল হক নামের তিন যুবক একই এলাকার সৌদি প্রবাসী এক ব্যক্তির স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

দু সন্তানের জননী (৩০) মহিলাকে মুখে কাপড় চেপে ধরে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে নিয়ে ফেরদৌস তাকে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি পরদিন জানাজানি হলে স্থানীয় একজন ইউপি সদস্যের হস্তক্ষেপে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়।

এদিকে ধর্ষণকারীরা ধর্ষিতাসহ অপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে গত বুধবার বে-আইনি প্রবেশ, চুরি ও ক্ষতিসাধনের অভিযোগ এনে থানায় মামলা করে এবং ধর্ষিতাকে বিভিন্ন ভয়ভীতি প্রদর্শণ করে। উপায়ান্তর না দেখে ধর্ষিতা গত বৃহস্পতিবার থানায় মামলা করতে গেলে তাকে পরের দিন আসতে বলা হয়। গতকাল সে থানায় এলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে পুলিশ সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

ময়মনসিংহে ধর্ষণ মামলা নেয়নি পুলিশ

(আজকের কাগজ, ২৫ জানুয়ারি, ২০০২।)

ময়মনসিংহের কোতোয়ালী থানায় ধর্ষণ মামলা করতে এসে সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে ফিরে গেছে এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ। বর্তমানে ওই পরিবারটি ধর্ষণকারীদের হুমকির মুখে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, ১৭ জানুয়ারি,২০০২ রাত সাড়ে ৯ টায় রাঘবপুর ঢুলিপাড়ায় কমল ও জালাল নামের দু ব্যক্তি তৃপ্তি রাণী দাস (৪৫) কে (প্রকৃত নাম প্রকাশ করা হলো না) জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরদিন সকালে এ ঘটনায় মামলা করতে গেলে ডিউটি অফিসার তাকে পরে এসে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে মামলা করার পরামর্শ দেন। পরে ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি আবার থানায় গেলে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাকে জোরপূর্বক থানা থেকে বের করে নিয়ে আসে। এরপর আর ওই নির্যাতিতা মহিলা থানায় যেতে পারেনি।

ধর্ষণের অভিযোগে বগুড়ায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

(প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি, ২০১০।)

অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে বগুড়ায় তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তারা হলেন- জেলার শেরপুর থানার শহর উপপরিদর্শক (টিএসআই) রফিকুল ইসলাম, বগুড়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উপপরিদর্শক আব্দুস সালাম ও বগুড়া শহর ফাঁড়ির উপ পরিদর্শক মিজানুর রহমান।

উপপরিদর্শক আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে শহর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত এক গৃহপরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠায় তাকে প্রত্যাহার করা হয়। আর ওই ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে শহর ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মিজানুর রহমানকে প্রত্যাহার করা হয়। শেরপুর শহরের একটি আবাসিক হোটেলে ঢুকে মাতলামির অভিযোগে টি এস আই রফিকুল ইসলামকে ৮ ডিসেম্বর ২০০৯ পুলিশ লাইনে প্রত্যাহার করা হয়।

খুলনায় স্কুলছাত্রী ও মাকে ২ দারোগার নির্যাতন

(২৬জুলাই,২০০৬)

পুলিশের নির্যাতন কয় প্রকার এবং কি কি, পুলিশ কিভাবে নিরীহ লোকদের মামলায় জড়ায়, কিভাবে ঘুষের টাকা দাবী করে তার এই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে, খুলনার দিঘলিয়া থানার বিধবা মায়ের স্কুল পড়ুয়া মেয়ে মনিরা খাতুন। বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

পেনডিং মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করে চালান দেয়ার ভয় দেখিয়ে দিঘলিয়া থানার ও সেনহাটি পুলিশ ক্যাম্পের দারোগা বিধবা মায়ের নিকট ১০,০০০ টাকা দাবী করে। উক্ত টাকা না দিলে পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার হুমকিসহ বিধবার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে মনিরাকে প্রস্তাব দেয় তার সাথে রাত্রি কাটানোর। এতে সে রাজী হলে তার ভাইকে আটক বা গ্রেফতার করা হবে না বলেও নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু বিধবা মার পক্ষে সেনহাটি পুলিশ ক্যাম্পের দারোগা সিরাজুল ইসলাম সিরাজের দাবীকৃত টাকা দেওয়া যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি বিধবার মেয়ে মনিরাও সিরাজের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় দারোগার রোষানলে পড়ে দারোগার বেপরোয়া প্রহারে যুবতী ছাত্রী মনিরাকে ভর্তি হতে হয় খুলনা মেডিকেল কলেজে। আর তার ভাইকে মধ্যযুগীয় নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে দারোগাকে মারপিট করার অভিযোগ এনে কোর্টে চালান দিয়েছে তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

সংবাদ সম্মেলনে স্কুল ছাত্রী মনিরা দারোগার নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরে সাংবাদিকদের জানায়, ২৩ জুলাই (২০০৬) বেলা ১টা থেকে ২টার দিকে ঐ দারোগা সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ সিভিল পোশাকে তার সঙ্গে আরও ১জনকে নিয়ে আমার ভাইকে গ্রেফতারের নামে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে। ঐ সময় ঘরে আমাকে একা পেয়ে তার হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আমাকে জাপটে আমার পরিহিত জামা কাপড় ধরে টানাটানি করতে থাকে। বর্বর পশুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তার হাত কামড়িয়ে ধরে চিৎকার দিতে থাকি। আমার চিৎকার শুনে আমার বড় বোন আছিয়া আমাকে মুক্ত করতে গেলে অন্য জন আমার বোনকে দরজার উপর ফেলে দেয়। আমার বড় বোন দরজার পাশে থাকা ডাসা দিয়ে দারোগার মাথায় আঘাত করলে আমাকে ছেড়ে আমার বোনের হাতে থাকা ডাসা কেড়ে নিয়ে আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

এলোপাথাড়িভাবে মারতে থাকে। আমি এবং আমার বোন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকলে আমার ভাই রফিকসহ আসে পাশের লোকজন এসে উপস্থিত হলে আমাদের ছেড়ে দারোগা আমার ভাইকে ধরে মধ্যযুগীয় কায়দায় বেদম প্রহার করতে থাকে। তাদের প্রহারে আমার ভাই জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে গরুর দড়ি দিয়ে ভ্যানের উপর বেঁধে সেনহাটা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে তাকে বেদম প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেলে রাখা হয়। আমার ভাইয়ের উপর নির্যাতন এখানেও শেষ হয়নি। দারোগা মাকেও লাঠিপেঠা করে তাড়িয়ে দেয়। আমার ভাইকে ক্রসফায়ারে দেয়ার ভয় দেখিয়ে এস আই আনোয়ার ১০ হাজার টাকা দাবী করে। তার দাবী মত ৫ হাজার টাকা দেয়ার অঙ্গীকার করে আমার মা উক্ত টাকা দিতে দেরী করায় দারোগা আনোয়ার দিঘলিয়া থানায় ফেলে তাকে বেদম প্রহার করে, পরে আমার মা ঐ টাকা পরিশোধ করে কিন্তু ভাইকে না ছেড়ে দিয়ে ২৫ জুলাই,২০০৬ তারিখে পুলিশকে মারপিটের অভিযোগ এনে কোর্টে চালান দেয়। এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে মনিরা খাতুন দারোগা নামক দুই নরপশুর বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের উর্ধ্বতন মহলের কাছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক কঠোর ব্যবস্থা ও তার নিরাপত্তা দাবী করেছে।

পুলিশ হেফাজতে যুবলীগ কর্মী নিলুফার ইয়াসমীন

২০০৬ সালে চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে হরতালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের জের ধরে গ্রেফতারকৃত যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী নিলুফার ইয়াসমিনের একে একে চারটি মামলায় আসামী দেখিয়ে দুদফা রিমান্ডে নেয়া হয়। রিমান্ডে তাঁকে চোখ-বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ সহ মানসিক নির্যাতন করায় অসুস্থ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েন বলে অভিযোগ করা হয় (তার শরীরে প্রচন্ড জ্বর থাকে এবং তিনি অভিযোগ করেন যে, পুলিশ হেফাজতে থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।) যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদিকা অপু উকিল অভিযোগ করেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রী নিলুফার ইয়াসমিনকে হরতালের পরদিন রাতে মিরপুরের গুদারাঘাটের বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে তাকে ধানমন্ডি থানায় নেয়া হয়। হরতালে সংঘর্ষের জের ধরে দায়ের করা মামলায় প্রথমে তাঁর নাম না থাকলেও আটকের পর তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নেয়া হয়। পরে আরও তিনটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে প্রথম দফা রিমান্ডে শেষে দ্বিতীয় দফা রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে চোখ বেধে যুব মহিলা লীগের অন্য নেত্রীর গ্রেফতার করতে তাদের বাসায় অভিযান চালানো ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এতে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার গায়ে প্রচন্ড জ্বর থাকে। তিনি বলেন, নিলুফার ইয়াসমিন পুলিশ হেফাজতে থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ধর্ষণের অভিযোগে মিরপুর থানার এ এস আই গ্রেফতার

(২৩/০১/২০০৬, দৈনিক জনকণ্ঠ)

তৈরি পোশাক কারখানার এক কর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে মিরপুর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুল মান্নানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল সকালে দক্ষিণ পীরেরবাগের বাসিন্দা পোশাক কারখানার এক কর্মী (১৮) বাদী হয়ে এএসআই মান্নানকে আসামি করে মিরপুর থানায় ধর্ষণের অভিযোগে একটি মামলা করেন। এরপর মান্নানকে থানায় ডেকে এনে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার করা হয়। ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য মান্নানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর থানার কর্তব্যরত উপপরিদর্শক (এসআই) মোঃ শাহজাহান মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেফতার হওয়া এএসআই মান্নানকে আদালতে পাঠিয়ে রিমান্ডে আনা হয়েছে। নির্যাতিত তরুণীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, মা-বাবার সঙ্গে ওই তরুণী দক্ষিণ পীরেরবাগে থাকেন। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মিরপুর থানার এএসআই মান্নান দক্ষিণ পীরেরবাগে টহলে ছিলেন। এসময় ওই তরুণী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাসার বাইরে গেলে এএসআই মান্নান তাকে ডাক দেন। দারোগা তার কাছে জানতে চান, বাসায় কে কে থাকেন। এরপর তার মোবাইল ফোন আছে কিনা দারোগা জানতে চান। তিনি হাঁ সূচক জবাব দিলে দারোগা মোবাইল ফোনটি আনতে বলেন। এক পর্যায়ে দারোগার মোবাইল ফোন নম্বরটি তার মোবাইল ফোনে রেখে দেন।

অভিযোগে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ও দুপুরে দুই দফায় দারোগা তাঁর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হন, রাতে তাঁর দিনমজুর মা বাবা বাইরে থাকবেন। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে দারোগা দক্ষিণ পীরেরবাগ এলাকায় আবার কর্তব্য পালনকালে বাসার সামনে এসে তার নাম ধরে ডাকেন। তিনি বাইরে আসেন। এক পর্যায়ে দারোগা তার প্রতিবেশীদের অন্যত্র চলে যেতে ধমক দিলে তারা সরে যায়। দারোগা ঘরে নিয়ে তাঁকে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। আশপাশের লোকজন ও কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরীরা ছুটে এসে দারোগা মান্নানকে আটক করে।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করে, ঘটনার রাতে দারোগা মান্নানকে আটক করে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হলেও তিনি আমলে নেননি। অবশেষে গতকাল নির্যাতিতা থানায় গিয়ে মামলা করতে বাধ্য হন।

পাবনায় ধর্ষণ মামলা প্রত্যাহারে পুলিশের চাপ ॥ স্মারকলিপি

(জনকণ্ঠ.৩০/০১/২০০৬।)

ধর্ষিতা প্রতিবন্ধী কিশোরীর পরিবারের উপর মামলা মীমাংসার পুলিশী চাপ প্রয়োগ ও নানা টালবাহানার প্রতিবাদে রবিবার এ্যাকশন অন ডিজিএ্যবালিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এডিডি সাংবাদিক সম্মেলন শেষে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। রবিবার সকালে পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ধর্ষিতা প্রতিবন্ধী কিশোরীর বাবা ঈশ্বরদীর তারা মিয়া অভিযোগ করেছেন। ১৬ জানুয়ারী,২০০৬ বিকালে এলাকার আজাহার আলীর কলেজ পড়ুয়া ছেলে মোজাহার আলী তার কিশোরী প্রতিবন্ধী মেয়েকে (১৬) ঘরে আটকে ধর্ষণ করলে পুলিশ ধর্ষকের পক্ষ নিয়ে নানা টালবাহানা করে। ৪ দিন পর মামলা গ্রহণ করে। পুলিশ কর্মকর্তা গোসল করানোর পর মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়ে ধর্ষণের আলামত নষ্ট করে বলে তার অভিযোগ।

থানার পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টা এবং মামলা

(১৪/১১/২০১১, প্রথম আলো)

ব্রাহ্মনবাড়িয়ার কসবা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জি এম মিজানুর রহমান ১৩/১১/২০১১ রোববার চট্টগ্রামে কলেজ ছাত্রী ধর্ষণচেষ্টা মামলার আসামি হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আদালত শুনানির পর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

১২ জুলাই,২০১১ মিজানুর চট্টগ্রামের ফয়সলেক এলাকা থেকে এক কলেজ ছাত্রীকে জোর করে তার ব্যক্তিগত গাড়ীতে তুলে চকবাজারের হোটেল আলআকাবায় নিয়ে যায়। এ রাতে মেয়েটিকে সে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরদিন ১৩ জুলাই ২০১১ ভোরে মেয়েটিকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় সহযোগীতা করার অভিযোগে আবাসিক হোটেলের ব্যবস্থাপকসহ দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে মিজানুর পলাতক ছিল।

আদালত সুত্র জানায়, কলেজছাত্রী ধর্ষণচেষ্টা সংক্রান্ত ঘটনায় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ মিজানুরের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি অভিযোগ পত্র দাখিল করে পুলিশ। মূল মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে বিচারাধীন।

রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা

বাংলাদেশের পার্বত্য নারীরা শতাব্দী কাল ধরে শুধু শোষণ ও বঞ্চনার শিকারই নয় বরং তারা নিয়মিত হত্যা,ধর্ষণ ও অপহরণের ও শিকার। পার্বত্য নারীর মানবাধিকার রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক এমনকি পুলিশ হেফাজতে ও লঙ্ঘিত হয়েছে। হত্যা,ধর্ষণ ও অপহরণের যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কারোর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬

রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ২০০৯-২০১০

সহিংসতা/নৃশংসতার ধরন	নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা	বাঙ্গালী সেটেলার দ্বারা	মোট
হত্যা	০১	০৪	০৫
ধর্ষণ	-	০৪	০৫
যৌন হয়রানি	০৪	০৩	০৭
অপহরণ	-	০২	০২
মোট	০৫	১৩	১৯

২০০৯-২০১০ পিরিয়ডে কমপক্ষে ০৫ জন জুম নারী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা ও বাঙ্গালী সেটেলারদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা ও বাঙ্গালী সেটেলারদের দ্বারা ১৪ জন আদিবাসী জুম নারী ধর্ষিত ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

(সূত্র:Human Rights Report 2009-2010 on Indigenous People's in Bangladesh,Page no.146)

এএসআই কর্তৃক আদিবাসী জুম কিশোরী ধর্ষিত

১৯ জানুয়ারী ২০১০, রাঙ্গামাটি পুলিশ ষ্টেশনের এএসআই আব্দুর রহিম ১৩ বছরের জুম কিশোরীকে সেল ফোনে রাঙ্গামাটি শহরের হোটেল প্যালেসে এক কাপ চা খাওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে যায়। কিশোরীটি সরল বিশ্বাসে সেখানে গেলে এএসআই আব্দুর রহিম এবং হোটেল ম্যানেজার মো: মাসুদ তাকে ধর্ষণ করে।

(সূত্র:Human Rights Report 2009-2010 on Indigenous People's in Bangladesh,Page - no.157)

Dhaka University Institutional Repository

বরকলে বিডিআর কর্তৃক গৃহবধূ ধর্ষণের চেষ্টা

০৩ সেপ্টেম্বর ২০১০, বিডিআর ১৮ রাইফেল ব্যাটালিয়নের,মোঃ জুনায়েদ, জুম গৃহবধূ সীমা চাকমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।গৃহবধূর চিৎকারে গ্রামবাসী জুনায়েদকে ধরে ফেলে এবং পিটুনি দিয়ে ছেড়ে দেয়।

(সূত্রঃHuman Rights Report 2009-2010 on Indigenous People's in Bangladesh,Page no.159)

সেনাবাহিনী কর্তৃক চাকমা মহিলা ধর্ষণের চেষ্টা

২০০৯ সালের ০৮ নভেম্বর রাঙামাটি জেলার যমুনা চাকমা পানি আনার জন্য পার্শ্ববর্তী কুয়োর দিকে গেলে নানিয়াচর এলাকার গিলাছড়ি ক্যাম্পের আর্মি সদস্য মো: জিয়াউল তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

(সূত্রঃHuman Rights Report 2009-2010 on Indigenous People's in Bangladesh,Page no.-155)

গণধর্ষনের বিচার চাইতে গিয়ে রাজশাহীতে আদিবাসী গৃহবধূ পুলিশের ধর্ষণের শিকার

(জনকণ্ঠ,০১/০৮/২০০৫।)

গণধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে পুলিশের ধর্ষণের শিকার এক আদিবাসী গৃহবধূকে নিয়ে টানাহেচড়া শুরু হয়েছে। ইতোপূর্বে গোদাগাড়ী থানা ধর্ষণের মামলা না নিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে ধর্ষিতাকে বের করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় সংশ্লিষ্ট কাকানহাট ফাঁড়ি, পুলিশ রবিবার ধর্ষিত গৃহবধূকে মেডিক্যাল টেষ্ট করানোর নামে হাসপাতাল থেকে গোপনে অপহরণের চেষ্টা চালায়। তবে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির রাজশাহী শাখা এবং স্থানীয় সাংবাদিকদের তৎপরতায় পুলিশের অপচেষ্টা রুদ্ধ হয়ে যায়। ধর্ষিতার শারীরিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা খারাপ হওয়ায় রবিবার রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। জানা গেছে রবিবার মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা ধর্ষিত আদিবাসী গৃহবধূ খোঁজখবর নিতে গিয়ে তাকে হাসপাতালের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট বেডে পায়নি। তারা ঘটনাটি হাসপাতাল পরিচালককে জানালে সমগ্র হাসাপাতালে হৈচৈ পড়ে যায়। পরে পরিচালকের নির্দেশে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ধর্ষিতাকে কাকনহাট ফাঁড়ি পুলিশের কতিপয় সদস্যের হেফাজতে পাওয়া যায়। তবে পুলিশের সদস্যরা দাবি করে ধর্ষিতার ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে নেয়া হয়েছিল।

ভিকটিমের অভিযোগ ২৫ জুলাই রাত ১টার দিকে একই গ্রামের বেনেডিক মুর্মু (৩৫), পিতা মৃত বালাকো মুর্মু, সিমন সরেন (৪৮) পিতা মৃত সুরলী, ফরিয়ান হাসনা (৩০) পিতা-জারমান হাসদা, মুসেস সরেন পিতা-ষ্টিফান সরেন এবং মুসেস টুডু (৩০) পিতা পাউলুস টুডু তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষকরা তাকে ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ না করার জন্য হুমকি দিয়ে চলে যায়। প্রাণভয়ে ঘটনাটি একদিন গোপন রেখে ২৭ জুলাই সে মামাত ভাই ছতিশকে জানায়। ছতিশ তাকে নিয়ে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে কাকনহাট পুলিশ ফাঁড়িতে যায়। থানার দারোগা শামসুল কিছু সময় ছতিশের সামনে কথা বলে পরে ওই গৃহবধূকে নিয়ে ফাঁড়ির ভিতরের একটি ঘরে যায়। সেখান দারোগা শামসুল ওই গৃহবধুকে আগের ধর্ষকদের গ্রেফতার ও বিচারের আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ফেরার পথে রাত আনুমানিক ১১টার সময় ওই গৃহবধু তার মামাত ভাই ছতিশকে পুনরায় দারোগা কর্তৃক ধর্ষিত হবার বিষয়টি প্রকাশ করে। দু দফায় ধর্ষণের শিকার আদিবাসী গৃহবধু ২৮ জুলাই গোদাগাড়ী থানায় মামলা করতে গিয়ে আরেক দফা প্রতারণার শিকার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আট বছরের শিশু ধর্ষিত ॥ কিশোরীগঞ্জ থানা তিন দিনেও মামলা নেয়নি

(জনকণ্ঠ,০১/০৮/২০০৫।)

আট বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার হলেও পুলিশ লিখিত এজাহার নিয়ে তিনদিনেও মামলা রেকর্ড করেনি বলে ধর্ষিতা শিশু মেয়েটির মা বিধবা সাহেবানু রবিবার সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করলেন। এইসময় ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে কিশোরীগঞ্জ উপজেলার পানিয়াল পুকুর পূর্বপাড়া গ্রামে শুক্রবার।

মৃত সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সাহেবানু জানান ঘটনার দিন দুপুরে তার আট বছরের মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সিমু গ্রামের একটি বাঁশঝাড়ে ছাগল বাঁধতে যায়। এ সময় একই গ্রামের প্রভাবশালী হেছার মাহমুদের পুত্র ১ সন্তানের জনক রাজু (২৫) সিমুকে ধর্ষণ করে। মেয়েটির চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে ধর্ষক রাজুকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ধর্ষক রাজুর পরিবারের লোকজন এসে গ্রামবাসীকে মারধর করে রাজুকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সে দিন বিকালে এই বিধবা এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কিশোরীগঞ্জ থানায় উপস্থিত হয়ে একটি লিখিত এজাহার দাখিল করে মামলা করার জন্য। বিধবার অভিযোগ লিখিত এজাহার পেয়ে কিশোরীগঞ্জ থানার এএসআই মাসুদ ঘটনাস্থলে যায় এবং ধর্ষিত শিশুটিকে থানায় নিয়ে আসে। এরপর তাদের পুনরায় গ্রামে ফিরে যেতে হয়। বিধবার অভিযোগ, পুলিশ মামলা রেকর্ড না করে আসামীদের কাছ থেকে মোটা অংকর টাকা হাতিয়ে নিয়ে আমাদের ঘটনা মীমাংসা করার জন্য চাপ দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে কিশোরীগঞ্জ থানায় যোগাযোগ করা হলে সাংবাদিকদের বলা হয় ঘটনা সঠিক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু তানিয়া ধর্ষণের বিচার

পুলিশের অপরাধের তদন্ত পুলিশকে দিয়ে হয় না

(জনকণ্ঠ, ২৯/০৭/২০০৬।)

আট বছর আগে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ধর্ষিতা চার বছরের শিশু তানিয়া কোনো বিচার পেল না। জুলাই,২০০৬,মঙ্গলবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ ওই মামলার যে রায় দেন, তাতে আসামি ওবায়দুর রহমান ওরফে মরা বেকসুর খালাস পেয়েছেন। তবে মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া ভালো করে লক্ষ করা দরকার এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয় আছে। প্রথম শিক্ষা হচ্ছে পুলিশ বিভাগের কোনো সদস্য কোনো অপরাধ করলে সে অপরাধের তদন্ত ও বিচারের প্রক্রিয়া যদি পুলিশকে দিয়েই চালানো হয়, তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় না। শিশু তানিয়া ধর্ষিত হয়েছিল আদালতের পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পুলিশেরই কোনো সদস্যের দ্বারা। কিন্তু পুলিশ প্রকৃত ধর্ষণকারীকে বাদ দিয়ে গ্রেফতার করে একজন নিরীহ দরিদ্র মানুষকে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগপত্র দাখিল করে মামলা চালানো হয়েছে। ফলে এই মামলার দ্বিতীয় শিক্ষাটি হচ্ছে নিরীহ কোনো ব্যক্তিকে আসামি বানিয়ে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করা হলে সে আসামীকে আদালত শাস্তি দিতে পারেন না। তিনি খালাস পেয়ে যান। অর্থাৎ উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

শিশু তানিয়া ১৯৯৮ সালের ১০ মার্চ বেলা ৩টার দিকে ঢাকা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের পুলিশের নিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষে ধর্ষিত হয় – এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করে তার আইনানুগ শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে শিশু তানিয়া ধর্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

মামলাকে বিপথে নিয়ে যারা প্রকৃত অপরাধীকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেইসব তদন্ত কর্মকর্তাকেও আইনানুগভাবে শাস্তি দিতে হবে। পুলিশ শুধু তানিয়া হত্যা মামলায় ওবায়দুর রহমান ওরফে মরাকে আসামি করেনি, আরও দুটি ধর্ষণ মামলায় তাকে আসামি করে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ফলে এ মামলায় খালাস পেলেও অন্য মামলাটির কারণে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।

সঠিক তদন্ত না করে মিথ্যা অভিযোগপত্র দাখিল করায় আদালত মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির তৎকালীন এএসপি মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ নির্দেশের অনুলিপি পুলিশের মহাপরিদর্শকের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা দেখতে চাই পুলিশ এখন কী ব্যবস্থা নেয়।

পুলিশ বিভাগের কোনো সদস্য গুরুতর কোনো অপরাধ করলে তাকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ নামের পুরো প্রতিষ্ঠানটিই যেন তৎপর হয়ে ওঠে, আইনের স্বাভাবিক প্রয়োগ এড়িয়ে নানা কারসাজি করে মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে দুর্বলভাবে মামলার অভিযোগপত্র তৈরি করে। ফলে আদালতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না। এর আগে চট্টগ্রামের সীমা ধর্ষণ ও হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় এটা প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায় যখন পুলিশের সদস্যদের মধ্যে কেউ এ ধরনের অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে, তখন দাবি করা হয় মামলার তদন্তের ভার যেন পুলিশকে দেওয়া না হয়, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি ওঠে । এ রকম দাবি যে যুক্তি সংগত তা শিশু তানিয়া ধর্ষণ মামলার রায়ের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তানিয়া কিন্তু বিচার পায়নি

(প্রথম আলো,০২/০৮/২০০৬।)

বাংলাদেশ মানাবিধকার বাস্তবায়ন সংস্থার অ্যাডভোকেট এলিনা খান তানিয়া ধর্ষিত হওয়ার পর তার চিকিৎসা সহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি নিজে এই ধর্ষণ মামলার একজন সাক্ষীও ছিলেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন তানিয়া ধর্ষণ মামলায় একটি জয় এবং একটি পরাজয় ঘটেছে। জয়টি হলো এই মামলায় একজন নিরাপরাধ লোক বেঁচে গেছে। আর পরাজয় কিংবা একটি দুঃখজনক অধ্যায় হলো তানিয়া বিচার পায়নি। সুষ্ঠু তদন্ত হলে ও সত্যিকারের বিচার পেত। ও বলেছিল কালো ছোট ছোট চুল লম্বা লুঙ্গি পরা এক লোক তাকে ব্যথা দিয়েছে। যেহেতু ঘটনাটি পুলিশ নিয়ন্ত্রন কক্ষে ঘটেছে এবং ঘটনার সঙ্গে পুলিশ জড়িত ছিল, তাই ওই সময়েই তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে একজন পুলিশ হওয়ায় আরেক পুলিশকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছে। দূর্বল অভিযোগ পত্র দাখিলের মাধ্যমে এবং ভূয়া আসামি বানিয়ে প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো মামলায় পুলিশের কোনো সদস্য জড়িত থাকলে সে মামলাগুলোর অপমৃত্যু ঘটবে ? রাষ্ট্রের কি কোনো দায়িত্ব নেই ?

রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি অপরাধ করে তার বিচার করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। তিনি বলেন রাষ্ট্র বারবার একই ভুল করছে। ইয়াসমিন, সীমা ধর্ষণ মামলায় পুলিশ যে চেষ্টা করেছিল তানিয়া ধর্ষণ মামলায় তার পুনরাবৃত্তি করেছে।

উদাহরণস্বরূপ এলিনা খান বলেন, সীমা চৌধুরীর মামলায় (চট্টগ্রামের রাউজান থানায় পুলিশ হেফাজতে ওসির রুমে ধর্ষণ ও জেলখানায় মৃত্যু) পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তারা অপরাধী পুলিশদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। ওই মামলার রায়ে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে বিচারক একটি জায়গায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওই মামলায় অপরাধ প্রমাণ করার পরিবর্তে যাতে প্রমাণিত না হয় সেভাবে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। ওই মামলার বাদী তদন্তকারী কর্মকর্তা, সাক্ষী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই ছিল পুলিশ।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রের উচিত পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা। এভাবে একের পর এক অপরাধ করে পুলিশ যদি পার পেয়ে যায় তাহলে পুলিশ রাখার কী দরকার ? তিনি আরও বলেন, এ ধরণের ঘটনা ঘটলে প্রতিবারই কোনো না কোনো নারীনেত্রী বা মানবাধিকার সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হয়, নইলে ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। তানিয়া ধর্ষণ মামলায় এখন সর্বশেষ কী করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এখন ওই সময়ে ওই দিনে যেসব পুলিশ ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সময় রয়েছে। সেই সময়ে যে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি তেমন ভূমিকা রাখেননি। তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

গৃহবধূ নির্যাতন

পুলিশের দুই কর্মকর্তার হাইকোর্টে হাজিরা

এক গৃহবধূকে নির্যাতনের ঘটনায় হাইকোর্টে হাজিরা দিয়েছেন মাদারীপুরের পুলিশ সুপার ও রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনের সমন্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে তাঁরা হাজির হন। ওই ঘটনায় আদালত তাঁদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এ সময় প্রায় চার ঘন্টার মতো তাঁরা এজলাসকক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জানা যায় ১৫ জুলাই, ২০১০ মাদারীপুরের রাজৈর থানার বাসিন্দা ভুপেন্দ্রনাথ মল্লিক নির্যাতনের শিকার হন। এ ঘটনায় ওই বছরের ২০ আগষ্ট রাজৈর থানায় একটি মামলা করা হয়। তদন্তে অগ্রগতি না হওয়ায় একপর্যায়ে স্বামীর নির্যাতনের বিচার চাইতে গিয়ে ৫ অক্টোবর,২০১০ এসপির হাতে প্রহৃত হন তাঁর স্ত্রী শিলা মল্লিক। এ নিয়ে ১৮ অক্টোবর 'মাদারীপুরে স্বামীর নির্যাতনের বিচার চাইতে গিয়ে এসপির হাতে প্রহৃত হলেন গৃহবধূ' এমন শিরোনামে জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয় এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা চেয়ে শিলা মল্লিক হাইকোর্টে রিট আবেদন করলে ৪ জানুয়ারী আদালত এ দুই কর্মকর্তাকে ১৩ জানুয়ারী হাজির হতে নির্দেশ দেন। ঘটনা তদন্তে সাত দিনের মধ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে আইন সচিবকে নির্দেশ দেওয়াসহ রুল জারি করেন আদালত।

এ ছাড়া পুলিশের ওই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত। স্বরাষ্ট্রসচিব, আইনসচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তিন সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ

গ্রেফতার এড়াতে জনৈক ব্যক্তিকে সহায়তা করার অভিযোগে ১৭ মার্চ ২০০৮ ভোর তিনটার দিকে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার নয়াপাড়া গ্রামের মুনসুর আলী (৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে রহিমা আক্তার পুলিশ নির্যাতনের শিকার হয়। দুটি ঘটনার কোনটাতেই মামলা হয়নি।

পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণ

(দি ডেইলি স্টার,১০ অক্টোবর ২০০৮।)

বীমা কোম্পানীর মাঠকর্মীকে পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের অভিযোগে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার সহকারী সহ-পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয় ৯ অক্টোবর ২০০৮। মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায়, সহকারী সহ-পুলিশ পরিদর্শক ফারুক ফোনে ভিক্টিমকে বিরক্ত করতো এবং ঘটনার দিন বিকেলে অপর সহকারী সহ-পরিদর্শক হামিদকে নিয়ে সে ভিক্টিমের বাড়িতে যায়। ভিক্টিম তার মার সাথে থাকতো। পুলিশ পরিচয় দিয়ে ধর্ষণকারী ভিক্টিমকে ভয় দেখায় এবং ধর্ষণ করে। পরে ভিক্টিম তার মাকে ঘটনা বললে জনৈক আলমের সহায়তায় ভিক্টিমের মা ভিক্টিমকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করে। মামলা দায়েরের পর থেকে প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে উল্লিখিত এ এস আই আব্দুল হামিদ এবং তার সঙ্গী ফারুক পলাতক।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পুলিশ কর্তৃক আইনের প্রয়োগ এবং পুলিশি হেফাজতে নারী ধর্ষণ ও মানবাধিকার লংঘন

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পুলিশ কর্তৃক আইনের প্রয়োগ এবং পুলিশি হেফাজতে নারী ধর্ষণ ও মানবাধিকার লংঘন

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকারের প্রতি পুলিশ কর্মকর্তাদের সংবেদনশীলতা সৃষ্টি। বিভিন্ন ধরণের আইনী বাধ্যকতা এবং মানবাধিকার বিষয় সম্পর্কে একীভূত করেছে এই অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে "বৈষম্য" এবং "সহিংসতা"। এগুলো নারীদের বিশেষ কিছু পরিস্থিতির শিকার হওয়ার এবং অন্য ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু মর্যাদা ও প্রয়োজন মিটানোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই সমস্ত বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়ার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ব্যাপারে, যেখানে সংখ্যা ও সংস্কৃতিগতভাবে পুরুষ অধ্যুষিত সেখানে এবং সমাজের বৃহত্তর পরিসরে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। পুলিশ কর্মকর্তাদের সকল কর্মকান্ডই বৈষম্যহীনতার নীতি অনুসারে হওয়া দরকার। কোন ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের এর পরিণতি থেকে রক্ষা করার এবং এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য পুলিশের প্রয়োজন, এবং নারীদের সাথে ব্যবহারের সময় তাদের বিশেষ অবস্থানকে সম্মান দেয়া ও তাদের বিশেষ প্রয়োজনগুলো মিটানো নিশ্চিত করাও তাদের কাজ। যদি তারা এইসব প্রয়োজন বা দাবি মেটাতে পারেন তাহলে তারা কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনা না ঘটতে দিতে বা তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকার ঘটাতে কোনভাবে সক্ষম হবেনা। তারা বৃহত্তর সমাজকে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তুলবেন, এবং তারা কিছু পরিস্থিতিতে, অনেক বেশি ক্ষতি বা বিয়োগান্তক পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।

আধুনিক পেশাদার পুলিশ বাহিনীর যোগ্যতার প্রমাণ শুধুমাত্র পুলিশ কিভাবে অপরাধের শিকার নারীদের সম্পর্কে বা যারা অপরাধ করেছে সেইসব নারীদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয় তার উপরে নির্ভর করে না ; উপরন্তু তা পুলিশ বিভাগগুলো নারী পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করে তাও দেখা প্রয়োজন।

পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতনের শিকার নারী

নারীর প্রতি সকল ধরণের যৌন নির্যাতন মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন এবং গুরুতর অপরাধের একটি। পারিবারিক সহিংসতার মত এর অর্থ এই যে রাষ্ট্র এক্ষেত্রে তার আইন প্রয়োগের আওতায় একজন ব্যক্তির / ব্যক্তিদের নিরাপত্তার অধিকার এমনকি জীবনের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণে, এবং যেহেতু ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতন ফৌজদারি অপরাধ, এটা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব যে, তারা অপরাধ নির্ণয়ে এবং নিরোধে কার্যকর, নির্যাতিতের প্রতি তাদের সাড়া দেয়ার ক্ষমতা মানবিক এবং তাঁরা পেশাগতভাবে দক্ষ।

নারী নির্যাতনের এক জঘন্যতম পন্থা ধর্ষণ। কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক যদি যৌনকর্মে বাধ্য করা হয় তাহলে তাকে ধর্ষণ বলা হয়। নানা বাধা বিপত্তি এড়িয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এগিয়ে এলেও শারীরিকভাবে তারা নির্যাতিত হচ্ছে বিভিন্নভাবে, এর মাঝে ধর্ষণ অন্যতম। ধর্ষণের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু কন্যারাও ধর্ষক নামক

Dhaka University Institutional Repository

পাষন্ডদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় স্কুলের শিক্ষক এমনকি প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, মাদ্রাসার শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

পাঁচ বছরের শিশুকন্যা ঘরের বাইরে খেলতে গেলেও ধর্ষণের শিকার হতে হয় তাকে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, বোবা শিশু, অন্ধ যুবতীও রেহাই পায় না পাষন্ডদের হাত থেকে। পৈশাচিক উল্লাসে ধর্ষণকারীরা আবার ধর্ষণের ছবি ক্যামেরা বন্দী করে রাখে। সাত বছরের শিশু রজুফার ধর্ষণের শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার খবরও জানা যায়।

ধর্ষণকারী যখন হয় ডাক্তার, এ্যাডভোকেট, সেনাসদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক নেতা, অথবা সমাজপতি তখন বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে বটে। আর দুষ্টের দমন এর দায়িত্ব যাদের সেই পুলিশ যখন অপরাধ দমনের পরিবর্তে নিরীহ নারীর ধর্ষণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন এই সমাজকে ধিক্কার দেয়া ছাড়া আর কোন পথ অবলম্বন করা যায় না।

ধর্ষণের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারতো হয়ই না, ধর্ষণের মামলা না নিয়ে সাধারণ ডায়েরী করা হয় থানায়, পুলিশের সাথে যোগসাজশ করে ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়। মামলা করতে গেলে ধর্ষণকারী দেয় হত্যার হুমকি এমন ঘটে অহরহ। কখনও ধর্ষণকারী নয়, ধর্ষিতাকেই করা হয় জরিমানা। বিচার চাইতে গিয়ে ধর্ষিতাকে অনেক সময় থানায় কাটাতে হয় ৩৬ ঘন্টা। জেল থেকে জামিন পেয়ে বাদীর বাড়িতে আসামী করে হামলা, টাকা খেয়ে ধর্ষণের পর মানসিক রোগী বানানোর চেষ্টা করা হয়। ধর্ষিতা মাদ্রাসা ছাত্রীকে চেষ্টা করা হয় পতিতা বানানোর। ধর্ষকের সাথে ধর্ষিতার প্রহসনমূলক বিয়ে দিয়েও বিচারের কাজ শেষ করা হয় অনেক সময়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণের দৃষ্টান্তমূলক বিচারকাজ সমাধা হতে খুব কমই দেখা যায় তবুও তার মাঝে দু-একটি যা হয়েছে তার মধ্যে ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার রাবেয়া বেগমের ধর্ষণ মামলায় পাঁচ জনের ফাঁসির রায় ও চুয়াডাঙ্গায় মিনুয়ারা ধর্ষণ মামলায় স্বামীসহ ৬ জনের ফাঁসির রায়টি উল্লেখ্যযোগ্য। পুলিশ কর্তৃক দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য, এ ধরণের রায়ে কিছুটা হলেও ধর্ষণের ঘটনা কমতে পারে, সেই সাথে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহসী ও অনুপ্রানিত করবে অন্যদের।

বিনা বিচারে আটক নারী

Body of Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment- এর পঞ্চম নীতি অনুসারে, নীতিমালাগুলো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যসহ কোন ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকে প্রযোজ্য হতে হবে। এতে আরও বলা হয়েছে- (অনুচ্ছেদ-২ : শুধুমাত্র নারীদের এবং বিশেষভাবে গর্ভধারিনী এবং শিশু-পরিচর্যাকারিণী মায়েদের অধিকার এবং বিশেষ অবস্থান রক্ষার লক্ষ্যে আইনের অধীন যেসব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে... তা অবশ্যই বৈষম্যমূলক হবে না....)

প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তাকেই বিনা বিচারে আটক নারীদের অধিকার এবং তাদের বিশেষ অবস্থানের বিবরটি স্বীকার করতে হবে। গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় নারীরা পুরুষের মতো সব অধিকার পাবার যোগ্য। সারা পৃথিবীতে পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক নারী বন্দীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। যখন সন্দেহভাজন নারীদের পুলিশ হেফাজতে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়, বিশেষভাবে তখন পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তাদের অত্যাচারিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এটা ঘটে কারণ নারীরা দরিদ্র ও ভিন্নদেশ থেকে আগত।

১২ অক্টোবর ১৯৯৫ থেকে ২৯ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত সময়ে ধর্ষণের বিভিন্ন ঘটনা কয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে, কয়টি মামলা হয়েছে, কয়টি বিচার হয়েছে তার তালিকা ঃ

সারণী-৭

পুলিশকে জানানো হয়েছে	মামলা হয়েছে	বিচার হয়েছে	কোন কিছুই করা হয়নি।
২১টি	৩০টি	৪টি	৮টি

শিশু ধর্ষণের ঘটনা

সারণী-৮

পুলিশকে জানানো হয়েছে	মামলা হয়েছে	বিচার হয়েছে	কোন কিছুই করা হয়নি।
৪টি	৮টি	০	৪টি

সূত্র ঃ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সংবাদ, প্রকাশক ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের তালিকা

সারণী-৯

নং	শিরোনাম	এলাকা	ধর্ষিতা	ধর্ষণকারী	ধর্ষণের স্থান	কারণ
১	শিশু ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ ৩ দিনের রিমান্ডে	উত্তরা	৮ বছরের শিশু কন্যা	পুলিশ ব্যাটালিয়নের নায়েক ফরিদ	উত্তরা	পেপসি খাওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে।
২	কালিয়াকৈরে পুলিশ ধর্ষণ করেছে গৃহবধূকে	টান কালিয়াকৈর গ্রামে	গৃহবধূ	পুলিশ	টান কালিয়াকৈর	আনারস কেটে দেয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেছে।
৩।	লালপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা	লালপুর থানা নাটোর	আরবার গ্রামের এক বিধবা	লালপুর থানার ওসি	নাটোর লালপুর থানার ঝাড়ু দার আসমতের ঘরে	জমি সংক্রান্ত ব্যপারে সহায়তা করবে বলে ওসি তাকে নানাভাবে ঘুরাতে থাকে। এক পর্যায়ে ওসি তাকে কুপ্রস্তাব দেয়।
৪	তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা দিনাজপুরে পুলিশ গ্রেফতার	দিনাজপুর	এক তরুনী	এস আই মশিউর রহমান	দিনাজপুর চাঁদগঞ্জ এলাকা	ঘটনার সাথে জড়িত মশিউর রহমান ও সহযোগী জোবেদাকে

Dhaka University Institutional Repository

						পুলিশ গ্রেফতার করেছে। থানায় মামলা হয়েছে। ফূর্তি করার জন্য নিয়ে যায়।
৫	বগুড়ায় গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ঘটনার নায়ক পুলিশ কনস্টেবল	বগুড়া	গৃহবধূ	কনস্টেবল আরশাদ	বগুড়া শহরে মোমিন আবাসিক বোর্ডিং	পুলিশ থাকার জায়গা ঠিক করে দেয়ার নাম করে মহিলার কাছে সুযোগ নেয়।
৬	চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী রেল যাত্রীকে ধর্ষণ করেছে রেল পুলিশ	চুয়াডাঙ্গা	১৪ বছরের কিশোরী	রেলওয়ে পুলিশ কনস্টেবল লুৎফর ও জব্বার	অবৈধ বাড়ির দোকানে ২নং প্লাটফর্মের কাছে	ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় এলে রেলওয়ের দুইজন পুলিশ তাকে পৌঁছে দেবার নাম করে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিজ হেফাজতে রেখে ধর্ষণ করে।
৭	বাহাদুরাবাদ ঘাটে ট্রেনের বগিতে দৃষ্টিহীন তরুণী ধর্ষণের শিকার	রেলওয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট	প্রতিবন্ধী এক তরুণী	ঢাকা জি.আর.পি আনসার মিনহাজ ও মিজান	বাহাদুরাবাদ ঘাট	ট্রেন থেকে ধমকিয়ে নামিয়ে দুব্যক্তি ধর্ষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৮	পুলিশকে ধর্মবাপ ডেকেও ছাড়া পায়নি আরতি	ময়মনসিংহ ফুলফুর থানা	আরতী রানী গৃহবধূ	পুলিশ কনস্টেবল সাত্তার, রফিক, ইঞ্জিল	ফুলপুর থানা	অসুস্থ স্বামীকে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিল। আরতীর রিকসা থানার কাছে পেলে পুলিশ তাকে পতিতা বলে থানায় নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে।
৯।	চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ পুলিশ ও যুবদল নেতাসহ ৪ জন গ্রেফতার	চুয়াডাঙ্গা	এক কিশোরী	পুলিশ কনস্টেবল লুৎফর, জব্বার, যুবদল নেতা বাচ্চু ও শরিফ	ঔষুধের দোকান	পিতার সাথে ভেড়ামারা যাওয়ার পথে রেলস্টেশন থেকে ধরে নিয়ে ঔষুধের দোকানে আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

সূত্র ঃ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সংবাদ, প্রকাশক ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ।

গত ক' বছর ধরে ক্রসফায়ার ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে র‍্যাব পুলিশের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বর্তমান সরকার তাকে 'জিরো টলারেন্সে' নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে পুলিশকে। পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে নিপীড়তদের পাশে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, থানায় গেলে সহজে মামলা নথিভুক্ত করতে চায়না পুলিশ। বরং নানাভাবে হেনস্থা করে। বেশি মামলা নিলে থানার ভূমিকা নাকি নেতিবাচক হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, মামলার সংখ্যা বাড়লে কিছু যায় আসে না। নির্যাতিতরা যাতে ন্যায়বিচার পায় এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় নিম্নে পুলিশের অসহযোগিতার কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো ঃ যেমন-

ইভটিজিং রোধকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কক্সবাজারের রামু থানায় ঘটেছে তার উল্টো। উত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে বিপাকে পড়েছেন অভিযোগকারী এক কিশোরী ছাত্রীর মা। উত্যক্তকারীদের পক্ষে গিয়ে পুলিশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে উল্টো মামলা রুজু করেছে বাদীনীর বিরুদ্ধে।

(জনকণ্ঠ ১০ মে ২০১০।)

ধর্ষণের শিকার গৃহবধূর মামলা নিচ্ছে না পুলিশ

(২৯ জুন, ২০১০ প্রথম আলো।)

ভোলার চরফ্যাশনে ধর্ষণের শিকার এক গৃহবধূর (২৮) মামলা নিচ্ছে না পুলিশ। গত রোববার হাসপাতালে এ অভিযোগ করেছেন ওই গৃহবধূ। ঘটনার পর সাত দিন ধরে তিনি ভোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর মামলা না করায় চিকিৎসক তাঁর পরীক্ষাও করতে পারছেন না। চরফ্যাশন উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ধর্ষণের শিকার এই গৃহবধূ জানান, তাঁর স্বামী বিদেশে থাকেন। ২১ জুন সন্ধ্যায় তিনি মেয়েকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাজারে চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় ৮-১০ জন সন্ত্রাসী তাঁকে রাস্তা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ধরে এলাকার একটি ক্লাব ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করে। ভোর চারটার দিকে স্থানীয় লোকজন অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে। প্রথমে তাঁকে চরফ্যাশন ও পরে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গৃহবধূর অভিযোগ, ঘটনার পর তার পক্ষ থেকে মামলা করতে গেলেও চরফ্যাশন থানার পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে লোকমান, ফারুক, হান্নান ও ফরিদ উদ্দিন মামলা না করার জন্য তাঁকে হুমকি দিচ্ছে। ভোলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা, শরীফ আহমেদ জানান, ওই গৃহবধূর অবস্থা ভাল না। কিন্তু মামলা না হওয়ায় যৌন নির্যাতনের এ ঘটনায় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাচ্ছে না। এ ধরনের ঘটনার সময় অতিক্রম হলে আলামত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন মল্লিক বলেন, যে নারী ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছে, সে দুশ্চরিত্রা। স্বামীর অবর্তমানের তার প্রেমিকের সঙ্গে রাত কাটিয়ে অন্যদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। তাই মামলা নেওয়া হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১০

ধর্ষণ ঃ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ২০০৭

১ জানুয়ারী-৩১ মে

ধর্ষণের ধরণ	বয়স						গৃহীত পদক্ষেপ		
	০-৬	৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০ উর্ধ্বে	উল্লেখ নেই	মোট	মামলা	সালিশ	নিরাপত্তা হেফাজত
ধর্ষণের চেষ্টা		৬	২	১	২০	২৯	৬	২	
একক ধর্ষণ	১৬	৬৮	৬	১১	৪৬	১৪৭	৭২	১২	১
গণ ধর্ষণ	১	১৭	৮	৬	৪০	৭২	৪৯	৫	১
ধরণ উল্লেখ নেই					১২	১২	৫		
মোট	১৭	৯১	১৬	১৮	১১৮	২৬০	১৩২	১৯	২
হত্যা		৮	২	১	১৫	২৬	২০		
আত্মহত্যা	২	১				৩			

- ১ জন নারী পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছেন।
- ৫ জন নারী পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন।

সূত্র ঃ প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, সমকাল, বাংলা বাজার, ইত্তেফাক, সংবাদ, ডেইলি ষ্টার, ইনকিলাব, নিউজ, সংগ্রাম, এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা।

তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১১

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকর্তৃক মৃত্যু ২০০৭

১ জানুয়ারী-৩০ মে

বাহিনী / মৃত্যুর ধরণ	র‍্যাব	র‍্যাব ও পুলিশ	পুলিশ	যৌথ বাহিনী	মোট
ক্রস ফায়ার (গ্রেফতার ছাড়া)	৩৬				৩৬
ক্রস ফায়ার (গ্রেফতারের পর)	১৫	১	৩		১৯
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	২		৪		৬
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের পর)	২		১৪	৯	২৫
গুলি করে (গ্রেফতার ছাড়া)	৯		১৪		২৩
গুলি করে (গ্রেফতারের পর)					
মোট	৬৪	১	৩৫	৯	১০৯

তথ্য সূত্র : প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, সমকাল, বাংলা বাজার, ইত্তেফাক, সংবাদ, ডেইলী ষ্টার, ইনকিলাব, নিউজ, সংগ্রাম, এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা।

তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১২

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হত্যা ২০০৮

বাহিনী / হত্যাকান্ডের ধরণ	র‍্যাব	পুলিশ	র‍্যাব ও পুলিশ	সেনা ও যৌথ বাহিনী	বিডিআর	মোট
ক্রস ফায়ার (গ্রেফতার ছাড়া)	৬৮	৪২	১১	-	৬	১২৭
ক্রস ফায়ার (গ্রেফতারের পর)	১০	২০	১	-	-	৩১
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	-	২	-	-	-	২
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের পর)	-	৪	২	১	-	৭
অসুস্থ	৪	২	-	-	-	৬
আত্মহত্যা (গ্রেফতারের পর)	-	২	-	-	-	২
মোট	৪২	৭২	১৪	১	৬	১৭৫

তথ্য সূত্র : তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

লক্ষনীয় বিষয় যে, গ্রেফতার ছাড়া এরূপ হত্যাকান্ডের ঘটনা ২০০৭ সালে ছিল ৮১ এবং ২০০৮সালে ১২৭, অর্থাৎ দ্বিগুনের কাছাকাছি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৩

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মৃত্যু ২০০৯
জানুয়ারী-জুন

বাহিনী / মৃত্যুর ধরণ	র‍্যাব	পুলিশ	র‍্যাব ও পুলিশ	সেনা ও যৌথ বাহিনী	বিডিআর	মোট
ক্রস ফায়ার (গ্রেফতার ছাড়া)	১৪	৬	৪	২	-	২৬
ক্রস ফায়ার (গ্রেফতারের পর)	১	২	-	-	-	৩
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	-	১	-	-	-	১
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের পর)	-	৪	-	-	-	৪
পুলিশ (গ্রেফতার ছাড়া)	-	১	-	১	৭৮	৮০
আত্মহত্যা (গ্রেফতারের পর)	-	-	-	-	-	০
অসুস্থ হয়ে (গ্রেফতারের পর)	-	-	-	-	-	০
মোট	১৫	১৪	৪	৩	৭৮	১১৪

* কাজে যোগদানের পর ২৭ জন বিডিআর সদস্য মারা গেছে।

* পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ২ জন মারা গেছে। (যুগান্তর, ১৫ জানুয়ারী ২০০৯, সংবাদ ১৬ জুন ২০০৯)।

সূত্র ঃ প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, সংবাদ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ইনকিলাব, সমকাল, ডেইলি ষ্টার ও নিউ এইজ।

তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট,আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতনের আদিম রূপ

জাতীয় জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনই স্বাভাবিক। কোন ক্ষেত্রেই স্থবিরতা জীবনে কাম্য নয়। এদিক থেকে বিচার করে গণমানস পরিবর্তনবিমুখ হননি কোনকালেই। মানব জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসে দৈশিক স্তরের ও বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে। সমাজে বিভিন্নমুখী আন্তঃস্রোত প্রবাহের কারণে প্রাচীন মূল্যবোধ স্থানচ্যুত হয় নতুনকে স্থান দিয়ে। অন্যদিকে, বর্তমানকালে মানুষ আর শুধু দেশীয় প্রভাবকেই জীবনের সঙ্গী করে নেয় না, বর্হিবিশ্ব বিভিন্ন দিক থেকে জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারের কারণে জীবনের স্তরেও পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিবর্তন যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জীবনকে স্পর্শ করুক না কেন, তার সুফল জীবনকে স্বস্তি ও উন্নতির দিকে নিয়ে গেলে আক্ষেপের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু পরিবর্তন শুধু সুফলই আনে না, সুফলের পাশাপাশি এমন কতগুলো প্রভাব বিস্তার করে যা সামাজিক মূল্যবোধকে আঘাত করে সমাজে নিন্দনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের মানুষের ওপর দ্রুত পরিবর্তন রেখা অত্যন্ত সুষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে যে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষনীয় হয়ে ওঠে তা হলে নারী স্বাধীনতার প্রাগ্রসর গতি। পেশা থেকে শুরু করে সর্বত্র নারীরা অবাধ, মুক্ত চেতনা নিয়ে অগ্রসর হয়ে পুরুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়ান। শিক্ষা, পেশা সর্বত্র নারীদের অধিকার বিস্তৃত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ইনফরমেশন টেকনোলজির উন্নয়ন ও মুক্ত বাণিজ্যের কারণে সারা পৃথিবী বাংলাদেশের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে জীবনকে সম্মুখে অগ্রসরণের সঙ্গে সামাজিক চেতনারও ক্রমশ পরিবর্তন আনতে

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করে। এই সূত্রে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রসারের কারণে জাতীয় সংস্কৃতি ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়তে থাকে এবং তার স্থান অধিকার করে নেয় বিদেশী সংস্কৃতি এদেশের টেলিভিশন দর্শক যৌনাত্মক নৃত্য ও অপেক্ষাকৃত যৌন দৃশ্যবহুল চিত্রের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এর প্রধান কারণ শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত বিকল্প কোন পথ উম্মুক্ত নেই। এ কারণেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত এদেশে বীরঙ্গনা প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন কারণে তাদের নির্দিষ্ট এলাকা বন্ধ করে তাদের উচ্ছেদ করা হয় । এর ফল হয় ভয়াবহ এবং সামাজিক নীতিবোধের ওপরও আঘাত করে। দেহব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টরা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ্যে নিজেদের ব্যবসা চালাতে থাকে। যে পেশায় তারা নিয়োজিত ছিল, সে পেশা থেকে অন্য পেশায় যাওয়া সম্ভব ছিল না সামাজিক কারণেই। সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি বলেই তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়েছে, যা দৃষ্টিকটু বলে মনে হলেও বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উনিশশ সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য বাস্তহারা নারী অর্থনৈতিক কারণে পরিবারকে সহায়তার জন্যই রুপোপজীবীনীর পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সাময়িক পেশায় প্রবেশ করার পর নারীরা কলকাতা শহরের জনবহুল বিপনি কেন্দ্রের পাশে অথবা গড়ের মাঠে অবস্থান করলেও তাদের আচরণ ছিল মার্জিত। পরবর্তী পর্যায়ে এই শ্রেণীর চিত্র অনেকাংশে হ্রাস পেলেও বর্তমানে যে সম্পূর্ণ হ্রাস পেয়েছে তা নয়, তবে শোভন আচরণের পরিবর্তন হয়নি। সাম্প্রতিক কালেও অনেকে বিভিন্ন হোটেলে গেলেও কিংবা মেট্রো রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে অঙ্গভঙ্গি বা আচরণ অমার্জিত নয় বলে সাধারণ নারীর সঙ্গে কোন

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। এখানেই বাংলাদেশের এই শ্রেণীর পেশাজীবী নারীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পোশাক পরার বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখার পর বিশেষ শ্রেণীর নারীদের চিনতে কষ্ট হয় না।

ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পরবর্তীকালে স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রসারের কারণে X (এক্স) রেটেড ফিল্ম অপ্রকাশ্যে বিক্রি হতে থাকে। বিশেষ শ্রেণীর খরিদ্দাররা ষ্টেডিয়ামের দোকান থেকে এই শ্রেণীর ফিল্ম সংগ্রহ করে নিজেদের আবাসগৃহে ভিসিডিতে এগুলো গোপনে দেখতেন। সাম্প্রতিক কালে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ঢাকার নীলক্ষেতের মার্কেটের একাংশ বই মার্কেট নামে পরিচিত। দোকানে নতুন বই বিক্রি হলেও ফুটপাতে পুরনো বই বিক্রি হতো। আকস্মিকভাবে এ ফুটপাতের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাকুশাহ মার্কেটের বাইরের ফুটপাত থেকে বলাকা সিনেমা হল পর্যন্ত বর্তমানে ফুটপাতের দু'পাশে পর্ণো সিডির দোকান গড়ে উঠেছে। ফুটপাতে টেবিলের ওপর দোকানিরা উত্তেজক ছবিসহ সিডি সাজিয়ে দর্শক ও পথচারীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, ফুটপাত দিয়ে চলার সময় তারা পথচারীদের অনবরত আহবান করে সিডি কেনার জন্য। ফুটপাতের এই দৃশ্য দেখলে মনে হয় পথচারীরা পর্ণোর এক অশ্লীল জগতে প্রবেশ করেছে। আকস্মিকভাবে গজিয়ে ওঠা এই পর্ণোর দোকান ফুটপাতের দুপাশে থাকায় পথচারীদের যাতায়াতে বিরাট বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়ত, নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে এ পথে চলা ক্রমশই কষ্টকর হয়ে উঠছে। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আগে বই কেনার জন্য যেতেন, সেখানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বইয়ের পরিবর্তে পর্ণো সিডির দিকে। এর ফলে তরুণরা অশ্লীল সিডির প্রতি ঝুঁকে

Dhaka University Institutional Repository

পড়বে এটাই স্বাভাবিক। প্রকাশ্যে, কিভাবে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী নিষিদ্ধ পর্ণো বিক্রি করতে পারে তার উত্তর নগর কর্তৃপক্ষ দিতে পারবে।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরণের আক্রমন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে নীলক্ষেতের পর্ণো সিডি বাণিজ্য তা উসকে দিচ্ছে প্রতিদিন। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্রদের মধ্যে সিডি দেখার প্রবর্ণতা আরও বৃদ্ধি করবে। সাধারণ তরুণ সমাজের ওপরও এর প্রভাব অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। পর্ণো সিডির বহুল প্রচলন ও প্রকাশ্যে বিক্রির নেপথ্যে ঢাকায় সাইবার ক্যাফের অবদান কম নয়। কারণ, সাইবার ক্যাফে রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তরুণরা এখানে নিজেদের প্রয়োজনে কম্পিউটার ব্যবহারের সময় গোপনে পর্ণো সিডি ব্যবহার করতে থাকে। এক্ষেত্রে অভিভাবকরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকলেও তাদের শিক্ষার্থী সন্তানরা নিয়মিতই সাইবার ক্যাফেতে যাতায়াত করে নিজেদের স্বতন্ত্র একটি মনোভঙ্গী গড়ে তোলে। এভাবেই সাইবার ক্যাফের প্রতি তাদের একটি দূর্দান্ত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নিজস্ব কাজকর্মের পাশে পর্ণো সিডিও তার একটি নিজস্ব স্থান করে নেয়।

পাশ্চাত্য দেশে পর্ণো সিডির প্রতি সাধারণ তরুণ সমাজ বা নাগরিকের মারাত্মক আকর্ষণ অনুপস্থিত। তার প্রধান কারণ নর-নারীর প্রতি অবাধ যৌন সম্পর্কের প্রচলন। সর্বস্তরে নর-নারীর মধ্যে এ প্রথা প্রচলনের কারণে পর্ণোর প্রতি তাদের আকর্ষণ তত তীব্র নয়। তাছাড়া, শহরে নাইট ক্লাব প্রচলণের কারণেও পর্ণো ফিল্মের প্রতি আকর্ষণ মারাত্মক আকারে জনসাধারণের মধ্যে বাড়েনি। নাইট ক্লাবে নারীদের নগ্নতা প্রকাশের কারণে একশ্রেনীর বিশেষ দর্শক সময় কাটানোর জন্য

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উপস্থিত হন। তাছাড়া, পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্যও অনেক রেস্তোরা মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় টপলেস ওয়েট্রেস নিয়োগ করে থাকে।

এছাড়াও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের জন্য সুযোগ আছে প্লেবয় ও পেন্ট হাউসের মতো পত্রিকা, যেখানে অসংখ্য নারীর নগ্নচিত্র মুদ্রিত হয়। প্লে হাউস ক্লাব ও সারা পৃথিবীতে তাদের পুরুষ মনোরঞ্জন ভূমিকার জন্য বিখ্যাত। পরবর্তীকালে তাদের আদর্শ অনুসরণ করে পেন্ট হাউসও একই রকম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকায় পর্ণোচিত্র প্রদর্শণের জন্য শহরে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ আছে। এ শ্রেণীর প্রেক্ষাগৃহে কম সংখ্যক দর্শকই আগমন করে এবং অধিকাংশ দর্শকই বয়স্ক। তরুণদের প্রেক্ষাগৃহে নগ্নচিত্র দেখতে সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় না। বয়স্ক দর্শকদের এই প্রেক্ষাগৃহে আসার নেপথ্য কারণও ক্রিয়াশীল। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই দর্শকরা বিপত্নীক বা একাকী। আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহে পর্ণোচিত্র প্রদর্শণের ব্যবস্থা থাকলেও কানাডার মতো উন্নত দেশে পর্ণোচিত্র প্রদর্শণের জন্য কোন প্রেক্ষাগৃহ নেই। প্রেক্ষাগৃহ না থাকার কারণে দর্শকরা নাইট ক্লাবে যান মনোরঞ্জনের জন্য।

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো কানাডা, আমেরিকা বা ইউকের মতো নয়। আমেরিকায়ও ক্যালকাটার মতো তিন ঘন্টার নগ্ন অপেরা তৈরি করতে সক্ষম। এখানে লক্ষণীয়, অপেরার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নগ্নবেশে অভিনয় করলেও কোন ভালগারিটির প্রসার ঘটায়নি বলে দর্শকদের মধ্যে তৃপ্তিভোগের একটা আনন্দ বিদ্যমান। এলিজাবেথ টেলরের মতো অভিনেত্রীও খ্যাতি অর্জনের পর রিফ্লেকশনস অন গোল্ডেন আই- এর মতো চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে অভিনয় করলেও চিত্র পরিচালক তার দেহের কোন স্পর্শকাতর অংশই চিত্রায়িত করেননি। অভিনেত্রীর নগ্নরূপ দেখিয়েছেন তার চরিত্র ফুটিয়ে তোলার কারণে। এখানেই ন্যাকেড ও ন্যুড

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এখনও পাশ্চাত্যের অনেক দেশ নাইট ক্লাবকে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য বিস্তৃত ব্যবহার করেনি। লন্ডনে নাইট ক্লাবের ছড়াছড়ি থাকলেও এডিনবরার মতো শহরে তার প্রাধান্য নেই।

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরের অনেক পরিবর্তন হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। সরকারের অনুমোদন ছাড়া নীলক্ষেত পর্ণোর রমরমা ব্যবসা গড়ে উঠেছে। পরবর্তী পর্যায়ে শহরের অন্যত্রও তার প্রসার ঘটাই স্বাভাবিক। নীলক্ষেতে যে শ্রেণীর পর্ণো সিডি বিক্রি হয় তার অধিকাংশই উত্তেজক বলে সমাজের তরুণ শ্রেণীর ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ারই আশঙ্কা। এর ফলে সামাজিক বন্ধনের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে তাতে বর্তমানের সমাজ বন্ধন ও সামাজিক কাঠামোর বাঁধন আলগা হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের মানুষ সামাজিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। এই জীবনযাত্রা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও নষ্ট করতে পারেনি। এ কারণে পশ্চিম বাংলায়ও প্রকাশ্যে পর্ণো সিডির প্রচলন হয়নি। এ ব্যাপারে সরকার ও দেশবাসীর চিন্তা করার সময় এসেছে।

২০০৫ সালে ৮৫ লাখ নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার

নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) বার্ষিক প্রতিবেদন উল্লেখ করেছে ২০০৫ সালে সারাদেশে প্রায় ৮৫ লাখ নারী ও শিশু বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

নির্যাতনের ধরণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ধর্ষণের পর চুল, হাত, আঙুল, নাক, স্তন কেটে, কোথাও বা চোখ উপড়ে ফেলে নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। এমনকি ধর্ষিতার নগ্ন ছবি উঠিয়ে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিদিন

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে 4 জন শিশু যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পাচার করা হয়েছে অসংখ্য শিশু ও নারীকে। পাচারে ব্যর্থ হয়ে অসংখ্য শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। যৌতুকের জন্য নারীদের মারধর, গলা টিপে হত্যা, গর্ভবতী স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা, বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা, এসিডে ঝলসে দেয়া, ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা, জিহবা কেটে দেয়া সহ নানা ধরণের লোমহর্ষক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

এই পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যায়, নারী বিষয়ে মোটা দাগে দশটি ক্ষেত্রে মোট ৮৭৫৯ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদে দেখা যায়, ৫৪৯৫৪ জন নারী বিভিন্ন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। নির্যাতিতদের মধ্যে নিহত হয়েছেন ৩০৪৩ জন এবং আহত হয়েছেন আরও ২৬৩৪ জন। নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনায় মামলা হয়েছে ২২৫৭ টি এবং পূর্বের ৩৬৯টি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগে ২০১১ জনকে গ্রেফতারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণের সহায়তায় ৩৯৬ জন নারীকে বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধারের তথ্য জানা গেছে। পরিবীক্ষণের আওতায় বিবেচিত সংবাদসমূহে দেখা যায়, এ সময়ে বিভিন্নভাবে ৪১৬৫৭ জন নারী উপকৃত হয়েছেন এবং ১০৬৪৬২ জন নারী বিভিন্নভাবে অধিকার বঞ্চনার শিকার হয়েছেন।

বছর জুড়ে পরিবীক্ষণাধীন সংবাদপত্রসমূহে নারী বিষয়ে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে নারী অধিকার বা নারী অধিকার রক্ষার দাবি ততটা উচ্চকিত ছিল না। যতটা প্রতিফলিত হয়েছে নারী নির্যাতনের খবরাখবর। তাই শুরুতেই আলোচনা করতে হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার দিকগুলো।

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতনের ক্যাটাগরিভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আত্মহত্যার ঘটনা। ছয়টি বিভাগে ১১৩৯ টি আত্মহত্যা সংশ্লিষ্ট সংবাদে দেখা যায়, আত্মহত্যার শিকার হয়েছেন ১১৫০জন নারী। এদের মধ্যে ১০৪১ জনই নিহত হয়েছেন এবং বাকি ১০৯ জন আত্মহত্যায় ব্যর্থ হয়ে আহত হয়েছেন। এ সংক্রান্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ৩৫৮ টি এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ১০ জন। এ বছর আত্মহত্যা সংক্রান্ত একটি মামলার রায়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী নারী আত্মহত্যা করেছে রাজশাহী বিভাগে, যার সংখ্যা ৪২৫ জন। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ২২৯ জন, খুলনায় ২৮৫ জন, চট্টগ্রামে ১০৬ জন, সিলেটে ২৪ জন এবং বরিশালে ৮১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত হত্যার সংবাদ যাতে ১০৪০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৮৭৫ জন এবং ধর্ষণের পর আরও ১৬৫ নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এ সময়ে গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিনজন (২.৮৫) নারী ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে রাজশাহীতে ২৭৫টি। এর মধ্যে কেবল নীলফামারী জেলাতেই ধর্ষিত হয়েছেন ৩৮ জন নারী। এছাড়া যশোর জেলায় মোট ৩৭ জন ধর্ষণের শিকার হন। আর ধর্ষণজনিত হত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ঢাকা বিভাগে ৬৬টি এবং এর মধ্যে কেবল ঢাকা জেলায়ই ২৭টি ধর্ষণজনিত হত্যার ঘটনা ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে ২৯২টি যৌন নির্যাতন বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যৌন নির্যাতনের ঘটনার শিকার হয়েছেন ২৮৭ জন যাদের মধ্যে আহত ১৩৩ জন এবং নিহত ৫ জন। এসব ঘটনায় মোট মামলা হয়েছে ৯৬টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৯১ জন। এছাড়া যৌন নির্যাতন বিষয়ক ৬টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এ বছর যেখানে অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। ধর্ষণের মতো সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে রাজশাহী বিভাগে ৯৮টি। এছাড়া কেবল যশোর জেলাতে ২০টি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীরা বেশি নির্যাতিত হচ্ছেন পরিবারে। এছাড়া পথে পরিবহনে, কর্মস্থলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, আসামি গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশের দ্বারা নিজ গৃহে এমনকি হাসপাতালেও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নারীরা।

(সূত্র:এম.এম.সির প্রতিবেদন)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৪

নারী নির্যাতন চিত্র জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৫

বিষয়	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	নির্যাতনের মাত্রা		মামলা	রায়	গ্রেফতার
			আহত	নিহত			
ধর্ষণ	৯৭২	৮৭৫	৫৯৭	০	৩৭৯	৭৬	২৭৭
ধর্ষণজনিত হত্যা	১৯১	১৬৫	০	১৬৫	৫৮	১৮	৪২
যৌন নির্যাতন	২৯২	২৮৭	১৩৩	৫	৯৬	৬	৯১
এসিড নিক্ষেপ	২৫৮	১৯৫	১৮৯	৪	৬৬	২৩	৫০
অপহরণ	২০৩	১৮৪	২৫	২৫	৯৩	১৪	১১২
যৌতুক ও তালাক	১২৩৫	১০০৩	৪২৮	৫০৫	৪৬৩	৭৪	১৯৪
পাচার	১৭৬	৩২৯	০	০	০	০	১১০
সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার	৩৪০	৪৭৭	২	৪	১০৮	১৩	৪০৬
ফতোয়া	৫৪	৪৩	১৩	৪	৫	০	৯
আত্মহত্যা	১১৩৯	১১৫০	১০৯	১০৪১	৩৫৮	১	১০
গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন	৪২	৪০	১৫	২২	৭	০	৮
অন্যান্য	২১৩২	২১৬৬	৯৭৯	১১২৬	৫৪০	১৩৫	৩৫১
সর্বমোট	৭০৩৪	৬৯১৪	২৪৯০	২৯০১	২১৭৩	৩৬০	১৬৬০

সূত্র: বিচিত্রা,২০ জানুয়ারি,২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৫

শিশু নির্যাতন চিত্র জানুয়ারি ডিসেম্বর-২০০৫

বিষয়	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	নির্যাতনের মাত্রা		মামলা	রায়	গ্রেফতার
			আহত	নিহত			
ধর্ষণ / যৌন নির্যাতন	১৪১২	১৪২৭	১১৭৩	৯৬	৫৫১	১১৬	৪০৭
অপহরণ	৮৩৬	৭৭৫	১৯	২৭	২৯৮	৫৫	৫১৯
এসিড নিক্ষেপ	৫৬	৫৩	৫২	১	১০	৮	১৮
দুর্ঘটনা	২১৫০	৩০৩৫	৪৭৪	২১৭১	৯৩	০	৮
আত্মহত্যা	৫৬২	৫৬৬	৩৪	৫৩২	১০৪	১	৩
পাচার	২২৫	৪৩৫	২	৪	৪৭	২৫	১২৪
নিখোঁজ	১৫৮	২০৪	২	১৪	২১	২৫	৮
অনাকাঙ্খিত শিশু	২০৩	২২০	২	১৩১	১৩	১	৬
স্বাস্থ্য চিকিৎসা সুযোগ	৩৬৬	৩৯৫৮	৪২০	৫৮৮	২	০	৬
বাল্য বিবাহ	২০৩	১১২	০	০	৭	০	৫
মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য	৩০	১৭	১	১৪	১	১	১
অন্যান্য	৮৫২	১১০২	৫০৭	৫৩৬	১৯৪	৪৪	১৬২
সর্বমোট	৭০৫৩	১১৯০৪	২৬৮৬	৪১১৪	১৩৪১	২৫৩	১২৬৭

(সূত্র ঃ বিচিত্রা, ২০ জানুয়ারি, ২০০৬)

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশিত নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রেক্ষিতে নারীর প্রতি গৃহসহিংসতা বা পারিবারিক নির্যাতনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার কিছু চিত্র নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ-

- নির্যাতিত নারীদের মধ্যে ৭৫%-৮৪% শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে তাদের স্বামীদের দ্বারা। ঢাকা শহরের ৪০% নারীই এ ধরনের সহিংসতার শিকার।

  [তথ্যসূত্র ঃ প্রথম আলো ঃ জুন ০৮, ২০০৪]

- নির্যাতিত নারীদের মধ্যে ৫৪% নারীই স্বামী কর্তৃক বলকৃত যৌনাচারের শিকার এবং ৭%-১৬% ভাগ নারীই আত্মহত্যা করে বা চেষ্টা চালায় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হতে মুক্তি পাবার জন্য।

  [তথ্যসূত্র ঃ প্রথম আলো, জুন ৮, ২০০৩]

- UNFPA এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিশ্বে স্বামী বা ঘনিষ্ঠ পুরুষসঙ্গী দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের নির্যাতিত হবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২য় এবং এদেশে এ ধরণের সহিংসতার হার ৪৭%।

  [তথ্যসূত্র ঃ ভোরের কাগজ, জুন ০৬, ২০০৩]

Dhaka University Institutional Repository

- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে নারীর প্রতি সহিংসতার যেসব কেস চিহ্নিত করা হয়েছে তার কারণসমূহ নিম্নের চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ঃ

গ্রাফ-১

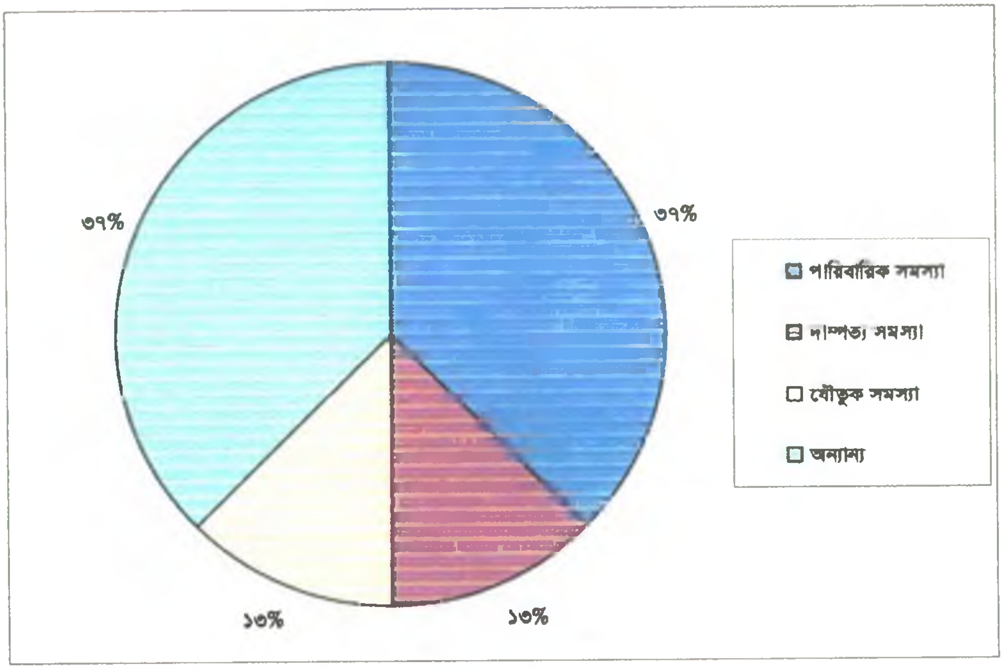

[তথ্য সূত্র ঃ New Steps, Issue 2, 2005]

দেশে প্রতিদিন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন গড়ে ২৫ জন নারী

দেশে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪ তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫ জন নারী কোনো না কোনো নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং এ সময়ে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ২ হাজার ১৪০টি ঘটনা ঘটলেও তার বিপরীতে মামলা হয়েছে ৫৭০টি এবং গ্রেফতারের সংখ্যা ৫৩৩। ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত নারী ও শিশু অধিকার লঙ্ঘনের সংবাদভিত্তিক এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২টি জাতীয় দৈনিক এবং বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত ১৫৪টি আঞ্চলিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে তৈরি এই গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় এসব ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো মামলা হয়নি, গ্রেফতার হয়েছে আরো কম।

সারণী-১৬

নারী নির্যাতন-২০০৪

বিষয়	ঘটনা	শিকার	আহত	নিহত	মামলা	গ্রেফতার
ধর্ষণ	২৯২	৩০৫	২৬৫	০০	১৬০	১০৪
ধর্ষণজনিত হত্যা	৩৭	৩৭	০০	৩৭	১১	০০
যৌন নির্যাতন	৭৪	৯৭	২০	০১	৩০	৮৮
এসিড নিক্ষেপ	৯৮	১১০	১০৮	০২	১৮	৩১
অপহরণ	৭৫	৭৬	০০	০৪	৪১	২৫
যৌতুক ও তালাক	২৪৭	২৪৮	১২৬	১২২	১২৪	৪৯
পাচার	৩০	৪৪	০০	০০	১০	৩৫
সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার	১২	২০	১০	০০	০১	২৫
ফতোয়া	২০	১৯	০০	০০	০	০০
আত্মহত্যা	৩১৯	৩৩০	১২	৩১৮	৩৩	০৩
গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন	১৯	১৯	০৯	১০	০৭	০২
অন্যান্য	৯১৭	৯৫৩	৪২৬	৫২৭	১৩৫	১৭১
সর্বমোট	২১৪০	২২৫৮	৯৭৬	১০২১	৫৭০	৫৩৩

উৎস : দেশের ১২টি জাতীয় দৈনিক এবং ১৫৪টি আঞ্চলিক পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository

এক বছরে (২০০৯) পুলিশ হেফাজতে ৩৫ মৃত্যু

দায় এড়াতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর প্রচার চালায় পুলিশ

এক বছরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে নানা নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। সর্বশেষ নির্যাতনে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন ঢাকার শাহবাগ থানায় আমিনুল ইসলাম মিন্টু। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও মৃত ব্যক্তির যথাযথ ময়নাদন্তের দাবি জানান তারা। পুলিশের গ্রেফতারের পর আসামির সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হবে উচ্চ আদালতে থেকে এরকম একাধিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কেউ তা মানছে না। থামছে না পুলিশী নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা। পুলিশও অবাধে চালাচ্ছে নির্যাতন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নেতারা বলেন, যত মানুষ মারা যায় সবারই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মারা গেছে এটা ডাক্তারও বলতে পারেন না। কিন্তু পুলিশী নির্যাতনে মারা যাওয়ার পর প্রচার চালানো হয় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া কোন কারণে বন্ধ হয়েছে, এর সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার।

সঠিক ময়নাতদন্ত ও সুরতহাল রিপোর্ট হলেই বের হয়ে আসবে কেন,কোন কারণে পুলিশ হেফাজতে নিহত ব্যক্তিটির হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। মানবাধিকার সংস্থা অধিকার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী গত এক বছরে ৩৫ ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে।এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনায় অধিকার অনুসন্ধান করেছে।এসব অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে পরিষ্কার নির্যাতন ছাড়া সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

কারো প্রাণ যায়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে মুন্সীগঞ্জে শ্রীনগরে যুবদল কর্মী জিয়াউল হককে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় গত বছর ২৮ এপ্রিল পুলিশ আটক করে। তাকে চোখ ও হাত-পা বেঁধে পুলিশ নির্যাতন করে। ১৮ জুন রাজধানীর মোহাম্মদপুর জয়েন্ট কোয়ার্টারের এফ ব্লকের মোর্শেদ শিপুকে মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেডের ১ নম্বর রোডের ৩০ নম্বর বাড়ির গেট থেকে সাত-আট জন লোক মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। ১৯ জুন কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। লাশের গায়ে অনেক প্রহারের চিহ্ন ছিল বলে শিপুর পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। পরিবারের অভিযোগ, সন্ত্রাসীরা নয়, কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা শিপুকে ধরে নিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন চালিয়েছে এবং গুলি করে হত্যার পর লাশ ফেলে রেখে গেছে।

১৪ জুলাই রাজধানীর লালবাগ থানার ১৭৮/২, বংশাল রোডের লিয়াকত আলী বাবুলকে বংশাল চৌরাস্তার কাছে পঞ্চায়েত কবরস্থান রোডের একটি দোকান থেকে র‌্যাব-১০-এর সদস্যরা আটক করে নিয়ে যায়। র‌্যাব-১০-এর ধলপুর ক্যাম্পে নিয়ে তার ওপর সারাদিন দফায় দফায় নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ২৪ আগস্ট ছাত্রদলের নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া শাখার সভাপতি মোর্শেদ হাবীব ভুইয়া জুয়েল ঢাকার আব্দুল গণি রোডের খাদ্য ভবনে যান। সেদিন সকালে শাহবাগ থানার পুলিশ জুয়েলকে গ্রেফতার করে। রাত ১০টার দিকে নেত্রকোণা মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। জুয়েলকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করতে ৩ দফায় ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়ে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১ সেপ্টেম্বর সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানার লাউয়াই এলাকার ৩ নম্বর নাদিমা হাউসের বাসিন্দা আব্দুল বাশার তুহিনকে কোতোয়ালি থানার পুলিশ সদস্যরা শহরের বাগবাড়ী ১৫৮ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করে। সারারাত নির্যাতন করার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয় অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে তুহিনের ডান পা কেটে ফেলা হয়।

২২ অক্টোবর দৈনিক নিউ এজের স্টাফ রিপোর্টার এফ এম মাসুমকে যাত্রাবাড়ীর ভাড়া বাসা থেকে আটকের পর বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে র‍্যাব সদস্যরা। ৩০ অক্টোবর গাজীপুর সদর উপজেলার ১৫৪/১৭/, উত্তর ছায়াবীথি (শ্মশানঘাট) মহল্লার পারভেজ জাকারিয়া তার লেগুনা গাড়ি মেরামতের জন্য শিববাড়ী পুরনো বাসস্ট্যান্ডের আলম অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে যান। জয়দেবপুর থানার তিন পুলিশ সদস্য পারভেজ জাকারিয়াকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে চোখ, মুখ ও হাত বেঁধে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় জাসাস নেতা আমিনুল ইসলাম মিন্টুকে গ্রেফতার করে শাহবাগ থানা পুলিশ। মিন্টুর স্বজনদের অভিযোগ ৩ দিন পর তার লাশ পাওয়া যায়। এরকম আরও অনেক নির্যাতনের ঘটনা ঠিকমত প্রকাশও পায় না। ভয়ে চেপে যান আত্মীয়-স্বজনরা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মহাসচিব এ্যাডভোকেট সিগমা হুদার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আমার দেশকে বলেন, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে। কাউকে হেফাজতে রেখে নির্যাতনের অধিকার পুলিশের নেই। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এসব মানবাধিকারের বিরুদ্ধে বড় অপরাধ। এ

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের নির্যাতনকারী পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। সিগমা হুদা বলেন, পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের পর প্রচারনা চালানো হয়, 'হার্ট অ্যাটাক বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে'। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হলে কেউ মারা যায় না। পুলিশ দায় এড়াতে এ ধরণের মন্তব্য করে থাকে। তিনি বলেন, পুলিশ হেফাজতে সব মৃত্যুরই যথাযথ ময়নাতদন্ত হওয়া উচিত।

অধিকার-এর পরিচালক নাসির উদ্দিন এলান বলেন, বর্তমান এক ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে গ্রেফতারের পর লাশ পাওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে তার মৃত্যু হলো এবং এর দায়িত্বও তারা নিতে চায় না, যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। তিনি বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আসার পর এই প্রবণতা কমছে না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সভ্য সমাজে বা আইনের শাসনে বাস করছি, এটা বলা যায় না। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী এ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে অতীতেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কায়দায় এ ধরণের অপরাধ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে অভিযুক্তরা। ডিবির হেফাজতে ইউনিভার্সিটির ছাত্র রুবেল মৃত্যুর ঘটনায় এসি আকরামের শাস্তি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাদীপক্ষকেও শক্ত হতে হয়। অভিযোগকারী যদি যথাযথ আইনের আশ্রয় নিয়ে লেগে থাকে তবে এর বিচার পাওয়া যায়। কিন্তু ভুক্তভোগীরা দুর্বল হলে এক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রতিকার পাওয়া যায় না। এলিনা খান বলেন, এ ধরনের প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের সাবেক আইজি আশরাফুল হুদা বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে কারও মৃত্যু হলে আইন অনুযায়ী এর তদন্ত করার বিধান রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ঘটনার তদন্ত যেন স্বচ্ছ ও নিবিড় হয় এবং তদন্তে প্রকৃতই যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। কেননা একটি দৃষ্টান্ত থেকে অন্যরাও শিক্ষা নিতে পারে। তা হলে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরণের অপরাধ করার সাহস পাবে না। তিনি বলেন, পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে প্রতিটি মৃত্যুর সঠিক ময়নাতদন্ত ও যথাযথ সুরতহাল রিপোর্ট হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সঠিক ময়নাতদন্ত ও সুরতহাল রিপোর্ট হলে মৃত্যুর আসল কারণ বের হয়ে আসবে।

মানবাধিকার সংগঠনের নেতারা আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে কারও মৃত্যু হলে এর দায়দায়িত্ব ওই সংস্থাকেই নিতে হবে। জীবিত ব্যক্তি তাদের হেফাজতে কীভাবে মারা গেল, পুলিশের হাজতখানায় থাকা ব্যক্তির শরীরে কিভাবে ক্ষতচিহ্ন হলো- এর জবাব পুলিশকেই দিতে হবে। অন্য কেউ এর দায়িত্ব বহন করবে না। মানবাধিকার নেতাদের মতে, পুলিশ যদি আদালতের আইন যথাযথভাবে মানত তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটত না। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে আদালতের নির্দেশনা যথাযথভাবে মানছে না।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন বেড়েই চলছে। তাদের কাছে গ্রেফতার হয়ে অনেকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বহু মানুষ। অনেকে পঙ্গু হয়ে জীবনযাপন করছে। পুলিশী নির্যাতনের শিকার হলেও কেউ সহজে মুখ খুলতে সাহস পায় না। যারা এর প্রতিকার চায় তাদের আত্মীয়-স্বজনও অনেক সময় হয়রানির শিকার হয়। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করাও সম্ভব হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে কেউ কেউ আদালতের শরণাপন্ন হয়। আদালতে মামলা করা হলেও এক পর্যায়ে এর তদন্তের দায়িত্ব আসে পুলিশের ওপর।

কারাগারেও আসামিদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মহাসচিব অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা বলেছেন, কারাগারেরও আসামিদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের শব্দ সইতে না পেরে কারারক্ষীদের বলেও কোনো কাজ হয়নি। ১/১১'র শিকার হয়ে আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে দেখেছি, একজন মহিলা আসামি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন। তিনি হয়তো কারারক্ষী নয়তো কোন কয়েদি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় ওই মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে একান্তে থাকার কোনো সুযোগ পাননি। সুতরাং কারাগারের ভেতরের কারো যৌন সংস্পর্শ ছাড়া অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সুযোগ নেই। এর বাইরেও ওই কারাগারে বিকৃত যৌনাচারের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ঘটছে নির্যাতন চালানোর ঘটনা। তিনি বলেন, দেশে এখন হরদম ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের ঘটনা ঘটছে। মামলা ছাড়াই আসামিকে আটকে রেখে মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছে। গতকাল খুলনায় অ্যাকসেস টু জাস্টিস শীর্ষক কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ্যাডভোকেট সিগমা হুদা কারাগারে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার খুলনা জেলা কমিটি এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ মঈনুল হক, মহানগর অতিরিক্ত হাকিম আবু শামীম আজাদ, সহকারী জজ মোঃ তাজুল ইসলাম, খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা ফরাজি, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হেদায়েতুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক,এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ, খুলনার জেল সুপার শাহ আলম খান, সাবেক জেলা প্রশাসক আজহারুল ইসলাম, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হালিমা ইসলাম, সাংবাদিক মামুন রেজা, মানবাধিকার কর্মী অলোকা নন্দ দাস, রসু আক্তার, জাকিয়া আক্তার প্রমুখ। সংস্থার খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি ও প্রবীণ আইনজীবী এ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল মজিদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। অতিরিক্ত দায়রা জজ মঈনুল হক বলেন, সত্য বের করার নামে রিমান্ডে নিয়ে লাঠি দিয়ে পেটানোর চিন্তাধারা বদলাতে হবে। এখন সত্য বের করার জন্য অত্যাধুনিক টেকনোলজি বের হয়েছে। আমরা তা প্রয়োগ করতে পারি। তিনি বলেন, দলীয়করণ সব সময়ই হয়ে আসছে। আমরাও রাজনীতি করে এসেছি। তিনি আরও বলেন, মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ এটি বিচারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এ্যাডিশনাল মহানগর হাকিম আবু শামীম আজাদ বলেন, খুলনার মিল-কলকারাখানা বন্ধ থাকার কারণে মাদকের ব্যাপকতা বাড়ছে। মাসে যে ক'টি মামলা দায়ের হয় তার অর্ধেকই মাদক মামলা। এ মামলায় ভালো সাক্ষী না থাকায় কারও সাজা হয় না। যে কারণে এ অপরাধ বেড়েই চলেছে। সহকারী জজ মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি এখনও প্রশ্নবোধক জায়গায় আছে। ঘটছে মানবাধিকার লজ্ঘনের ঘটনা। এগুলো উত্তরণের দায়িত্ব প্রাপ্তদের আন্তরিকতা ও নৈতিকতার পরিচয় দিতে হবে। খুলনা জেলা আইনজীবক্ষক্ষক্ষক্ষমক্ষিক্ষ সক্ষক্ষপতি গোলাম মোস্তফা কারাজি বলেন, বিচারকদের পেছন থেকে কেউ লাগাম ধরে আছে বলে মনে হয়। সরকারকেই এ লাগাম ছাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়শই আইন প্রয়োগের অমানবিক পদ্ধতি এবং আইনের শাসনের দূর্বল অবস্থার ব্যাপারে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। স্ব-স্ব হেফাজতে আটককৃত বন্দিদের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের দরুন পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষ কঠোর সমালোচনার শিকার হলেও হেফাজতে নির্যাতন পুরোপুরি কমেনি। দরিদ্র ও অসহায়, হোক সে সামান্য অপরাধী কিংবা ঘাগু অপরাধী, আইনের লম্বা হাত থেকে তার নিস্তার নেই। পুলিশী বা কারা হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা বন্দিদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন বা লাঞ্ছনাকর আচরণের প্রমাণ দেয়।

২০০১ সালে পুলিশ হেফাজতে ১৩ ব্যক্তির মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। এর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু পুলিশের অত্যাচারে, ১ জনের মৃত্যু সেনাবাহিনী দ্বারা ও ২ জনের মৃত্যু আত্মহত্যার কারণে হয় বলে জানানো হয়। এদের মধ্যে ৩ জন পুলিশ হেফাজতে বিচারাধীন ছিল। কোনো লিখিত প্রমাণাদি না থাকায় বলা মুশকিল যে, অপরাধকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় কিনা। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে এই ধরণের অত্যাচার ও পীড়নের প্রথাটি উৎসাহিত হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকাকালে পুলিশ হেফাজতে ১৯৭ দিনের মধ্যে ৭ জন বন্দির মৃত্যু হয়। কেয়ারটেকার সরকারের সময় ৮৭ দিনে ৪ জন ও চারদলীয় সরকারের আমলে ৮১ দিনে মধ্যে ২ জন বন্দির মৃত্যু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৭

ছয়টি জেলায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু

জেলা	সংখ্যা	বয়স	মৃত্যুর ধরণ
ঢাকা	5	২২-২৮	আত্মহত্যা, নির্যাতন
যশোর	৪	২২, ৩৮, ৪৫, ৬০	নির্যাতন
সিলেট	১	-	আত্মহত্যা
কুমিল্লা	১	৩৮	নির্যাতন (সেনাবাহিনী)
গাজীপুর	১	১৫	নির্যাতন
সাতক্ষীরা	১	২৭	নির্যাতন
মোট	১৩		

(সূত্র ঃ আসক মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০০১ ।)

নিম্নোক্ত সারণী- ১৮-এ দেখা যায় যে, কারা হেফাজতে আটককৃত কিংবা বিচারধীন বন্দির মৃত্যুর সংখ্যা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মৃত্যুর তিনগুণ। হেফাজতকালীন মৃত্যুর পেছনে চিকিৎসার অভাব, পুষ্টিহীনতা এবং সহিংসতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত দুই বছরের (২০০১ ও ২০০২) রাষ্ট্রীয় হেফাজতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিরাপত্তা ক্রমশই হুমকির সম্মূখীন। পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃতদের অনেকেই মুক্তিলাভের পর আটকাবস্থায় তাদের ওপর লাঠি দিয়ে হাঁটু বা পায়ে নির্যাতন, ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন। এ সময় তাদেরকে কোনরূপ ঔষুধ বা চিকিৎসা দেয়া হয়নি, এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে রাখা হয়। জামিনে মুক্তি লাভের পরও

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মামলাগুলো নিস্পত্তি / প্রত্যাহার করা হয়নি, যাতে পরবর্তীকালে প্রশাসনের ইচ্ছায় তাদের পুনরায় আটক করা যেতে পারে।

সারণী-১৮

২০০২ সালে পুলিশ ও কারা হেফাজতে মৃত্যু

বিভাগ	কারা হেফাজত		পুলিশ হেফাজত
	দণ্ড প্রাপ্ত	আটককৃত বিচারাধীন	
ঢাকা	১৫	৪০	৪
চট্টগ্রাম	১	১২	২
রাজশাহী	৫	১৭	০
খুলনা	৪	১১	১
বরিশাল	৪	৪	১
সিলেট	১	৩	১
মোট	৩০	৮৭	৯

(সূত্র ঃ আসক মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০০২ ।)

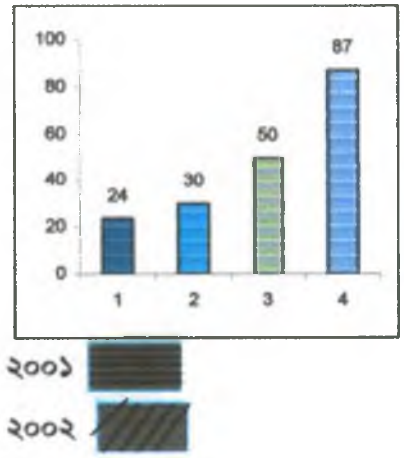

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু-২০১০ এবং আদালত কর্তৃক নির্দেশনা

(রমনা থানা, ২০১০ইং)

আইন অমান্য করতে পারেন না আইনি সংস্থার সদস্যরা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হেফাজতে আসামিদের মৃত্যু তথা বিচারবহির্ভূত হত্যা নিয়ে দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যূনতম চৈতন্যোদয় হয়নি। রাজধানীর রমনা থানায় পুলিশের হেফাজতে জুলাই, ২০১০ তারিখে মারা যান বাবুল গাজী নামের অটোরিকশা চালক। আসামির পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তার মুক্তির জন্য রমনা থানার উপ-পরিদর্শক আলতাফ হোসেন দুই লাখ টাকা দাবি করেন। ৭০ হাজার টাকা দেওয়ার পরও তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। অন্যদিকে গুলশানে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন মিজান নামের এক যুবক। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় দৌড়ে পালাতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে বাবুল গাজী এবং ছিনতাইকালে বন্দুকযুদ্ধে মিজান গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মারা যান। এদিকে মিজানুরের স্ত্রী তাসলিমা বেগমের অভিযোগ, ঘুষের টাকা না পেয়ে গুলশান থানার পুলিশ তাকে হাজতে দুই দিন আটকে রেখে পরে গুলি করে খুন করে।

(দারুসসালাম থানা, ২০১০ইং)

১লা জুলাই ২০১০ বৃহস্পতিবার দারুস সালাম থানার পুলিশ ও তাদের সোর্সরা পরিবহনকর্মী মজিবর রহমান (৪২) কে সন্ধ্যায় তুরাগ নদের

Dhaka University Institutional Repository

মোলারটেক ঘাট থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন ২ জুলাই ২০১০ সকালে মজিবর রহমানের লাশ তুরাগ নদে পাওয়া যায়।

স্বজনদের অভিযোগ মিরপুরের দারুস সালাম থানার পুলিশ ও তাদের সোর্সরা মজিবরকে খুন করে নদীতে ফেলে দেয়। অভিযোগ যথারীতি অস্বীকার করেছে পুলিশ। পুলিশী হেফাজতে কেউ মারা গেলে নানাগল্প ফাঁদা হয়। থানায় আসামিকে নেওয়ার পর উৎকোচ নিয়ে দর কষাকষির ঘটনা নতুন নয়। বাবুল গাজী বা মিজানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে ভাবার কারণ নেই। বন্দুকযুদ্ধে আহত আসামির স্ত্রীর কাছে ১০ হাজার টাকা উৎকোচ চাওয়া কি অপরাধ নয়?

পুলিশ বলছে একটি চোরাই অটোরিকশার মালিক ছিলেন বাবুল গাজী। চোরাই অটোরিকশা কেনা বা তার মালিক হওয়া নিঃসন্দেহে অপরাধ। কিন্তু তা পুলিশ হেফাজতে বাবুল গাজীর মৃত্যুর বিষয়টিকে স্বাভাবিক করে তোলেনা। ভুক্তভোগীদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা গুরুতর এবং নিরপেক্ষ সংস্থা দ্বারা তদন্ত করা প্রয়োজন।

(গুলশান থানা, ২০১০ইং)

নিরাপত্তা মূলক হেফাজতে বা কথিত বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি যে কোন মূল্যে রোধ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বা অপরাধ দমনের এটি পথ নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সদস্য বা সদস্যদের হেফাজতে আসামি মারা গেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে অজুহাত চলতে পারে না। গুলশানে বন্দুকযুদ্ধে এবং রমনা থানায় পুলিশী

Dhaka University Institutional Repository

হেফাজতে আসামির মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাই পারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইন বহির্ভূত কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখতে।

(প্রথম আলো ৩ জুলাই, ২০১০।)

আসামির প্রতি আচরণ বিষয়ে পুলিশকে আদালতের ১২ দফা নির্দেশনা

রাজধানীর তিন থানায় ২০১০ সালের পুলিশের হেফাজতে তিন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্টের তদন্ত কমিটি গঠনের আদেশের পর ঢাকা মহানগর পুলিশ রাজধানীর সব থানায় একটি নির্দেশনা পাঠিয়েছে। এতে আসামিদের সঙ্গে কী ধরণের আচরণ করা হবে, সে সম্পর্কে ১২ দফা নির্দেশনা রয়েছে।

পুলিশের হেফাজতে বিচারবহির্ভূত এসব হত্যাকান্ডের পর ৫ জুলাই, ২০১০ হাইকোর্ট সাত দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। তবে এই কমিটিতে পুলিশের কোনো সদস্য রাখা যাবে না। পুলিশের হেফাজতে তিনজনের মৃত্যুর পর আসামির সঙ্গে কী রকম আচরণ করতে হবে তা জানিয়ে ১২ দফা নির্দেশনা জারি করেছেন মহানগর পুলিশ কমিশনার। আদালতের জারি করা এ নির্দেশনা রাজধানীর সব থানায় পাঠানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে আটক ব্যক্তির মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ সচেষ্ট হবে।

নির্দেশনায় বলা হয় জিজ্ঞাসাবাদের সময় আসামিকে কোনো রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। আসামির সঙ্গে শিষ্টাচারের আচরণ করতে হবে আসামি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থা যেমন- হৃদরোগ, রক্তচাপ, মৃগীরোগ, জন্ডিস,

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগ আছে কি না তা আগে জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। হাজতে কোনো আসামি অসুস্থ হলে চিকিৎসা করতে হবে দ্রুত। বিশেষ যত্ন রাখতে হবে, যাতে থানা থেকে অসুস্থ হয়ে না পড়ে। নারী আসামিদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ও মাতৃসুলভ আচরণ করতে হবে। থানা হাজতে আটক ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের খাবারের প্রতি যত্ন নিতে হবে। অন্য কোনো সংস্থা আসামি গ্রেপ্তার করলে সেই আসামির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। কাউকে গ্রেপ্তারের সময় অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা যাবে না। হরতাল চলাকালে কোনো কর্মকর্তা-সদস্য বিধিবহির্ভূত অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করবে না। পুলিশের কোনো সদস্য আইন ভঙ্গ করলে তার দায় তাকেই বহন করতে হবে। আইন ভঙ্গকারী পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, তদারককারী কর্মকর্তারা থানাফাঁড়ি ও পুলিশ লাইনে গিয়ে এ ব্যাপারে বাহিনীর সদস্যদের অবহিত করবেন।

পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুতে মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ

বিচারবহির্ভূত হত্যা ও পুলিশের হেফাজতে মানুষের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ। আইনের যতটুকু সুযোগ আছে, তা প্রয়োগ করে মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা থাকবে বলে আইনমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মিজানুর রহমান বলেন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নিখোঁজ নাগরিকের সন্ধান দিতে না পারা, পুলিশের হেফাজতে মানুষের মৃত্যু এসব বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, নাগরিক নিখোঁজ থাকবে আর তার পরিবার পরিজন কমিশনের সামনে কান্নাকাটি করবে, বিচার চাইবে- এটি সভ্য সমাজের লক্ষণ নয়। এটি মানা যায় না। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনাই সহ্য করা হবে না। সরকার যদি উদ্যোগ না নেয়, তবে কমিশন এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী উদ্যোগ নেবে।

মানবাধিকার ও পুলিশ

সারা বিশ্বের পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য মানবাধিকারকে বিবেচনায় দেয়া ক্রমবর্ধিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুলিশ মানবাধিকারের রক্ষক, জনসাধারণের জন্য এ অধিকার নিশ্চিত করাই তাদের কাজ। অন্যদিকে, পুলিশ সমাজের এমন একটা অবস্থানে রয়েছে যেখানে জবাবদিহিতার কোন নিয়ম না থাকলে মানবাধিকার অপব্যবহার অনায়াসে হতে পারে। মানবাধিকারকে সম্মান করার সংস্কৃতি গড়ার উপযুক্ত চর্চার মাধ্যমে এই পদ্ধতির সূচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানদন্ডের কাঠামোর অধীনে সকল পুলিশ আচরণ সংঘটিত হয়। ক্রমবর্ধিত হারে এটা আশা করা হয় যে পুলিশ কর্মকর্তারা এসব মানদণ্ড ও আচরণবিধি জানবে এবং সেগুলো তাদের নিয়মিত কর্মকান্ডে প্রয়োগ করবে। যেমন-

- মানবাধিকার ধারণা এবং তার উৎস কি সে সম্পর্কে জানা ও মানবাধিকারের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল বা International Bill of Rights নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর নাম ও বর্ণনা দিতে পারবে।
- আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক (Regional) মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশনা ও মানদণ্ড এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জানা।
- মানবাধিকার সীমিতকরণ বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। কখন এবং কিভাবে পুলিশ কর্মকর্তাগণ ব্যক্তির মানবাধিকার সীমিত করতে পারেন সে সম্পর্কে জানা।

অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণা

অধিকার (Rights)

Right is to which people are entitled simply because they are human beings.

যা মানুষ অন্যের নিকট থেকে, রাষ্ট্রের নিকট থেকে ন্যায্যভাবে দাবী করতে পারে, তাকে অধিকার বলা হয়। অধিকার হল প্রতিটি মানুষের ন্যায্য পাওনা এবং তার বৈধ ক্ষমতার উপভোগ। অধিকার বিভিন্ন রকমের যেমন : ব্যক্তিগত অধিকার, নাগরিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ইত্যাদি। এসব অধিকার আইনের ভাষ্য অনুযায়ী বহুধা বিস্তৃত। কোথাও এই অধিকার এক প্রকার পাওনা। যেমন আমার চলাফেরা করার অধিকার, কোথাও এটি স্বাধীনতা যেমন কবিতা লেখা কিংবা গান গাওয়ার অধিকার / স্বাধীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও এ অধিকার ক্ষমতা আবার কোথাও বা বিশেষ নিরাপত্তাকেও অধিকার বলা হয়।

মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক থেকেই অধিকারের উৎপত্তি। অধিকার স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত, অন্য কথায় আইনগত বা নৈতিক বিধি বিধান দ্বারা সংরক্ষিত স্বার্থকে অধিকার বলে অভিহিত করা যায়।

মানবাধিকার বলতে কী বুঝায় ?

মানুষ হবার কারণে বা জন্মসূত্রে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান। মানবাধিকার হল এসব অধিকার ও মর্যাদার মূর্তরূপ। তাই সহজ অর্থে মানবাধিকার হল মানুষের অধিকার। মানবাধিকারকে কখনও কখনও মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বা বুনিয়াদি অধিকার (Basic Rights) বা প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) বলা হয়ে থাকে। কোন আইন বা সরকারী আদেশের মাধ্যমে মৌলিক (Fundamental Rights) বা বুনিয়াদি অধিকার (Basic Rights) কেড়ে নেয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানে এই অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে।

প্রতিটি ব্যক্তিরই কিছু সহজাত বা স্বভাবজাত অধিকার রয়েছে, যা তার প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights)। এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলো (Natural Rights) তাদের স্বাভাবিক গুণাবলীর কারণে প্রতিটি নর-নারীর প্রাপ্য বলে বিবেচিত। যেমন : বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, নিরাপদভাবে চলাফেরার অধিকার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার একটি ধারণা (concept) যা উপলব্ধির বিষয়। যুগে যুগে মানবাধিকারের অমোঘ বাণী প্রচার ও চর্চার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন চুক্তি, দলিল, সংবিধান, আইন ও বিভিন্ন পারস্পরিক সমঝোতা স্মারকে মানবাধিকারকে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সাধারণ মানবিক গুণাবলী সম্বলিত সকল ব্যক্তির মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার যে অধিকার তাই মানবাধিকার। এই অধিকার সকল ব্যক্তির আচরণ এবং সামাজিক ব্যবস্থার উপরে নৈতিক দায়িত্ব প্রদান করে। এই অধিকার সর্বজনীন, হস্তান্তর অযোগ্য ও অবিভেদ্য। মানবাধিকার সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

মানবাধিকারকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। যেমন : 'ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নিয়ম-নীতি যা প্রতিটি মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে মানবিক গুণাবলী হিসাবে অর্জন করে'। অথবা 'মানুষ হওয়ার জন্য নৈতিক অধিকারগুলো সকল জনসাধারণের নিকট সমভাবে প্রাপ্য, কারণ তারা সকলেই মানুষ'।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনাপত্র বা "Universal Declaration of Human Rights" -ধারা ১ অনুযায়ী, "সকল মানুষ স্বাধীনভাবে সমমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাদের উচিত বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকার এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করা।"

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের ধারায় মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল

মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার চিন্তার ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতোই পুরানো। এ চিন্তার আধুনিকতর রূপ হলো মানবাধিকারের (Human Rights) ধারণা। এ ইতিহাসের নানা রকম উৎস রয়েছে। এ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে মানব সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ধর্মে সুদৃঢ় অতীত থেকে আইন ও বিচার সম্পর্কিত ধারণার ধারাবাহিকতায় কিভাবে বর্তমান মানবাধিকার ধারণা ও মূল্যবোধ বিকশিত হয়েছে তা বুঝতে হবে।

চার হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ২০৫০ অব্দে প্রাচীন ইজিপ্টের রাজা 'উরনাম্মুর' লিখিত মানবাধিকারের সব চেয়ে পুরানো আইনি দলিল তার শাসনাধীন নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য রচিত হয়েছিল। এরও তিন শতক পরে মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় লিখিত হয় মানবাধিকারের আরেক প্রাচীন দলিল। রাজা হাম্মুরাবি রচনা করেন আইনের একটি সঙ্কলন খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৮০ সালে, যেটি এখন 'কোড অফ হাম্মুরাবি' নামে পরিচিত।

রাজা উরনাম্মু ও সম্রাট হাম্মুরাবি রচিত বিধিবিধানগুলো ছিল মূলত কিছু সিভিল, ক্রিমিনাল ও রাজস্ব আইনের সঙ্কলন। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তিও এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ কোড দুটির উল্লেখযোগ্য দিক হলো নারী, শিশু ও দাসদের জন্য সুরক্ষামূলক বিধিবিধান।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর সর্বসাধারণের জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার দেখা পাওয়া যায় পারস্য সাম্রাজ্য ও প্রাচীন ইন্ডিয়ার মৌর্য সাম্রাজ্যে। পরে আরব উপদ্বীপে ইসলামী সভ্যতার সময় ছিল প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে মানবাধিকারের সোনালী সময়।

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট সাইরাস দাস প্রথা নিষিদ্ধ করেন। সব নাগরিককে নিজ ইচ্ছামতো ধর্ম পালনের অধিকার দেয়া হয়। নারীদের পুরুষের সমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নিশ্চিত করেন তিনি। সাইরাস এসব বিধিমালা সিলিন্ডার আকৃতির ধাতব খন্ডে খোদাই করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেন। এ রকম একটি সিলিন্ডার পাওয়া যায় ১৮৭৯ সালে, যার নাম দেয়া হয় সাইরাস সিলিন্ডার', এটি এখন 'বৃটিশ মিউজিয়াম' সংরক্ষিত এবং এর একটি 'রেপ্লিকা' রয়েছে জাতিসংঘ সদর দফতরে। উল্লেখ্য যে, মেসোপটেমিয়ান সম্রাট হাম্মুরাবি তার আইনি দলিলটি খোদাই করেছিলেন পাথর ফলকে এবং সাম্রাজ্যের বড় নগরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেগুলো স্থাপন করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ছাড়া অন্য রাষ্ট্রগুলোতে মানবাধিকার সংরক্ষণের রাষ্ট্রীয় আইন ছিল। যেমন-১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা (যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যে কেউই আইনের উর্ধ্বে নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে) ১৬২৭ সালের পিটিশন অব রাইটস্, ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টেসোলিয়া চুক্তি (দাসপ্রথা বন্ধ করার চুক্তি), ১৬৮৮ সালের বিল অব রাইটস্, ১৭০২ সালে অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট, ১৭৮৯ সালের নাগরিক অধিকার বিষয়ক ফরাসি ঘোষণা (ফ্রান্স ডিক্লারেশন অব রাইটস অব মেন এন্ড সিটিজেন্স), ১৭৯১ সালে মার্কিন সংবিধানের অধিকার সংক্রান্ত বিল (বিল অব রাইটস্)। এই সব চুক্তি ও দলিলসমূহ মানবাধিকার ভিত্তির উপরে কাজ করে।

আধুনিক মানবাধিকার এবং এর মান সম্পর্কিত ধারণা পেতে হলে দাসপ্রথা নির্মূলে, দাস-ব্যবসা অবসানের জন্য প্রচার কাজে এবং দাসপ্রথা নির্মূলে সর্বসাধারণের জন্য আইন প্রণয়নে ও শিল্পায়নের যুগে শ্রমজীবিদের অবস্থার উন্নয়ন Fundamental

Dhaka University Institutional Repository

Central Human Rights অর্জনের আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ গতি অর্জন করেছিল তা জানা দরকার। একই সময়ে যুদ্ধকালীন বৈরি আচরণের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয় যার ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয় জেনেভা কনভেনশন। 'আইনের শাসনের' মতো মানবাধিকার ও মৌলিক ব্যক্তি স্বাধীনতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতি এসব দলিল থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আইনে অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা জোরদার হয়। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ হলো প্রথম আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার দলিল। এ সনদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংরক্ষণকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো এসব দেশে অন্তর্ভূক্ত জনগণ নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে সব মানুষের সমঅধিকার ও মর্যাদার প্রতি পুন:আস্থা জ্ঞাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সনদের ১, ১৩, ৫৫, ৬২, ৬৮ ও ৭৬ অনুচ্ছেদে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে।

জাতিসংঘ সনদে উল্লিখিত মৌলিক মানবাধিকারের আরও বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ দেয়ার জন্য ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ 'a common standard of achievement for all people and all nations' হিসেবে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের তুলনামূলক আলোচনা

বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ স্থান পেয়েছে। সংবিধানে বর্নিত মৌলিক অধিকারসমূহের সাথে জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ ঃ

সারণী-১৯

ক্ষেত্র	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	জাতিসংঘের অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র
গণতন্ত্র এবং সরকারের জনগনের অংশায়ন	অনুচ্ছেদ -৭ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ৫ কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। অনুচ্ছেদ -১০ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।	(ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারের অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। (গ) জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে, এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	অনুচ্ছেদ -১১ প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে ; মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে (এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে ।)	অনুচ্ছেদ -১৯ প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষন এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত প্রদান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।
মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা	অনুচ্ছেদ -১৫ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়। (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন-ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের	অনুচ্ছেদ -২৫ নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনের অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

	গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈষম্য মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধ্যকজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকারী ।	(খ) মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী । বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাহিরে জন্ম হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে ।
ন্যায় বিচার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	অনুচ্ছেদ -২২ রাষ্ট্রের নির্বাহী অংশসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথককরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন । অনুচ্ছেদ -২৬ (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই	অনুচ্ছেদ -১০ প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার আদালতে নায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

	সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।	
আইনের দৃষ্টিতে সমতা	অনুচ্ছেদ -২৭ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। অনুচ্ছেদ -৪৪ (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।	অনুচ্ছেদ -৭ আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনোরূপ বৈষম্য বা এই ধরণের বৈষম্যের কোনো উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।
ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য	অনুচ্ছেদ -২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন । (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-	অনুচ্ছেদ -২ যে কোন প্রকার পার্থক্য যথাঃ জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য, মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান।

Dhaka University Institutional Repository

	পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।	
সরকারী নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা	অনুচ্ছেদ -২৯ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদে কোনো কিছুই- (ক) নাগরিকের যে কোনো অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহার	অনুচ্ছেদ -২১ প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

	অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন-ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষনের বিধান সংবলিত যে কোনো আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী-পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	
জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	অনুচ্ছেদ -৩২ আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।	অনুচ্ছেদ -৩ প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	অনুচ্ছেদ -৩৩ (১) গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শ ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।	অনুচ্ছেদ -৯ কাউকে খেয়াল খুশিমতো গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।
চলাফেরা সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা	অনুচ্ছেদ -৩৬ জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। অনুচ্ছেদ -৩৭ জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার	অনুচ্ছেদ -১৩ (ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনে অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। ধারা-২০ (ক) প্রত্যেকেরই শান্তি-পূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। (খ) কাউকেই সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

	এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে । অনুচ্ছেদ -৩৮ জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ।	
চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা	অনুচ্ছেদ -৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল । (২) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এবং (ঘ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল ।	অনুচ্ছেদ -১৮ প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে । নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একাই অথবা অপরের সহিত যোগসাজশে ও প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান প্রচার, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত । অনুচ্ছেদ -৭ অনুচ্ছেদ -১৯ প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত

Dhaka University Institutional Repository

		প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষন এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ।
পেশা বৃত্তির স্বাধীনতা	অনুচ্ছেদ -৪০ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইন সঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে ।	অনুচ্ছেদ -২৩ (ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধ চাকরি নির্বাচনের কাজের জন্য নায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে । (খ) প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য, ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে । (গ) প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন নায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজন বোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের

Dhaka University Institutional Repository

		অধিকার রয়েছে। (ঘ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।
ধর্মীয় স্বাধীনতা	অনুচ্ছেদ -৪১ (১) আইন, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষ (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারে অধিকার রহিয়াছে ; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। (২) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে, তাঁহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদানে করিতে হইবে না।	অনুচ্ছেদ -১৮ প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একাই অথবা অপরের সহিত যোগসাজশে ও প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান প্রচার, উপাসক ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।
সম্পত্তির অধিকার	অনুচ্ছেদ -৪২ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-	অনুচ্ছেদ -১৭ (ক) প্রত্যেকেরই একাকী এবং

Dhaka University Institutional Repository

	নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে।	অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। (খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল খুশিমতো বঞ্চিত করা যাবে না।

পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহ

আন্তর্জাতিক অধিকার বিল বা International Bill of Rights ছাড়াও বর্তমানে আইন প্রয়োগ এবং ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং এর সংক্ষিপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। এই মানদণ্ড বা মাপকাঠিগুলো অত্যন্ত মৌলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে মেনে চলার বা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বাধ্যকতার উপর গড়ে উঠেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই কাঠামোত আরও যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন স্বীকৃত সংস্থার পরামর্শ, আদর্শ, ব্যবহারিক নীতিমালা এবং ঘোষণা ইত্যাদি (যেমন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ)। যদিও এইসব নির্দেশনা মেনে চলতে কেউ বাধ্য নয়, তবু এগুলো যেসব উৎস থেকে উন্নীত তাতে বলা যায়, 'এগুলো নৈতিক আন্তর্জাতিক নির্দেশনা'।

এই সব নির্দেশনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ঃ

- অত্যাচার এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং হীন আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮৪) এবং এর পরিবর্ত খসড়া (Optional

Dhaka University Institutional Repository

protocol), ২০০২ [The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), and its (Optional Protocol (2002)].

- আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ সভার প্রণীত আচরণবিধি, ১৯৭৯ [The United Nations General Assembly's Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979.]
- জাতিসংঘের তৈরি বন্দীদের প্রতি ব্যবহার এর সর্বনিম্ন মানদণ্ড সম্পন্ন বিধি [United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners].
- শক্তি এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নির্দেশিত মূল নীতিমালা [United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms.]
- যে কোন ধরণের আটকাবস্থা বা অন্তরীণাবস্থা থেকে সুরক্ষায় সকলের জন্য প্রযোজ্য জাতিসংঘ প্রণীত মূল বিধিবিধান সমূহ [United Nations Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.]

Dhaka University Institutional Repository

- অপরাধ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকারদের সুবিচারের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রণীত মূল বিধিবিধান সমূহ [United Nations Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power].
- সকল ধরণের জাতিগত বৈষম্য নির্মূলের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ১৯৬৬ [The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966].
- শিশু অধিকার বিষয়ে সনদ, ১৯৮৯ [The Convention on the Rights of the Child 1989].
- নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য নির্মূলের জন্য কনভেনশন, ১৯৭৯ [The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979].
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলে জাতিসংঘের ঘোষণা [United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women].
- শরণার্থী বা মোহাজেরদের মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশন, ১৯৫১ [The Convention Relating the Status of Refugees 1951].

Dhaka University Institutional Repository

- আন্তর্জাতিক (অপরাধ) ফৌজদারী আদালত সম্পর্কিত রোম সংবিধি, ১৯৯৮ [The Rome Statute of the International Criminal Court 1998].

এছাড়া, বেশ কিছু দেশ আঞ্চলিক (Regional) মানবাধিকার সংস্থার অংশ যেটাও অবশ্যই নির্দেশনার সর্বনিম্ন মান এবং বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে গণ্য হবে। এসবের ফলে অনুমোদন দানকারী দেশগুলো মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাগুলো যার মধ্যে আছে জীবনের অধিকার, আইন সুরক্ষা, অত্যাচার ও খারাপ ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা, সুবিচার পাওয়ার অধিকার এবং ব্যক্তির মুক্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা করার নিশ্চয়তা দিতে রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে ঃ

- মানবাধিকার ও জনসাধারণের অধিকার এর আফ্রিকান সনদ বা The African Charter on Human and People's Rights আফ্রিকার সকল কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৯৮৬ সালের ২১শে অক্টোবর থেকে এগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় কনভেনশন যা The European Convention on Human Rights এবং স্ট্রাসবার্গ ব্যবস্থা বা Strasbourg System এর মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় আদালত বা The European Court of Human Rights অন্তর্ভূক্ত আছে। কমনওয়েলথ এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তিনটি দেশ অন্তর্ভূক্ত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

- মানবাধিকারের বিষয়ে আমেরিকান সনদ বা The American Convention on Human Rights যা অন্ততঃ চারটি কমনওয়েলথ ক্যারাবিয়ান দেশ অনুমোদন দিয়েছে।
- মানবাধিকারের আরব সনদ বা The Arab Charter on Human Rights যা ১৯৯৪ সালে আরব লীগভুক্ত দেশগুলো গ্রহণ করেছে।
- মানবাধিকার সনদ এবং কমনওয়েলথভুক্ত স্বাধীন দেশগুলোর মৌলিক স্বাধীনতা বা The Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Commonwealth of Independent States যা ১৯৯৫ সালে গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে, যে ভাবে বিভিন্ন দেশের পুলিশ আভ্যন্তরীন বা আন্তদেশীয় অস্ত্র বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে সে পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের আচরণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (জেনেভা কনভেনশন) বা সনদ দ্বারা পরিচালিত ও সীমিত করা হবে।

পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

পুলিশ কর্মকর্তারা হলেন একজন 'আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা', এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য জাতিসংঘের প্রণীত আচরণবিধির ধারা-১ অনুযায়ী ঃ

"আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ সকল সময়ে আইনানুযায়ী তাদের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব এমনভাবে পালন করবেন যা তাদের পেশায় প্রয়োজনীয় উচ্চমানের দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার মাধ্যমে সমাজের সেবাদান ও বেআইনী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করা যাবে"।

Dhaka University Institutional Repository

- পুলিশ কর্মকর্তারা "আইন"- বলতে শুধুমাত্র স্থানীয় বা জাতীয় আইন মনে করবেন না ; উপরন্তু এর অর্থ একই সাথে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে জানবেন। পুলিশ কর্মকর্তারা সারা বিশ্বে একটি ঐতিহ্যগত সম্মানিত পেশার অংশ, যা সমাজে একটি অত্যন্ত অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তারা এমন লোকের সাথে কাজ করেন যারা হয়তো আইন ভঙ্গকারী এবং অন্য ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে প্রমাণিত। তারা অপরাধের শিকার ব্যক্তি এবং পরিবারদের সাথে কাজ করেন। যখন তারা সাধারণ কোন কাজ করেন অথবা যখন কোন নির্দিষ্ট মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক মানবাধিকারগুলোকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা করার এবং সমুন্নত রাখার গুরুদায়িত্বে পুলিশের প্রত্যেক সদস্যের উপর ন্যস্ত হয়।

পুলিশী কর্মকান্ডের প্রায়োগিকতা এবং ফলাফল যা মানবাধিকারের সাথে সংগতিপূর্ণ বা অসংগতিপূর্ণ, তাই বলা দরকার যে, পুলিশ কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের বৈশিষ্ট্যের কারণে শুধুমাত্র মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা করাই নয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে অসংরক্ষিত বোধ করলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও তাদের হাতে ঘটার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। পুলিশ কর্মকর্তারা যেন শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ সন্দেহভাজন বা আটক ব্যক্তিদের মানবাধিকার সম্বন্ধেই জানবেন না, উপরন্তু এই সব আইন প্রয়োগের নিয়মাবলী এবং অন্য পুলিশ কর্মকর্তাসহ সকলেই যেন কোন ব্যক্তির মানবাধিকারকে রক্ষা ও সম্মান করতে শেখে- রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

এর মানে হলো, পুলিশ কর্মকর্তাদের তাদের নিজ নিজ দেশের আইন জানা ও বুঝা ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও প্রয়োগবিধিও জানতে হবে।

- পুলিশ কর্মকর্তাদের একই সাথে অপরাধের শিকার এবং সমাজের অরক্ষিত গোষ্ঠীর অধিকার ও সম্মান রক্ষা করতে হবে। যে সমাজে তারা কাজ করেন তাকে রক্ষা ও সেবা করাই তাদের ব্রত।
- মানবাধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যার দিকে পুলিশ সংস্থাগুলোর সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত তা হল- পুলিশ কর্মকর্তারাও মানুষ, এবং সেজন্য তাদের মৌলিক মানবাধিকার আছে যাকে সম্মান ও রক্ষা করা দরকার। যেমন- পুলিশ কর্মকর্তাদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ পাওয়ার অধিকার অথবা তাদের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ভাষাগত ভিন্নতা, সংস্কৃতি বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার রয়েছে।
- মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার প্রস্তাবনা বা The Preamble to the Universal Declaration of Human Rights অনুসারে, অপূর্ণতা, সমতা ভিত্তিক উন্নয়নশীল সমাজ-যেখানে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, যা আবার জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। নাগরিক ও রাজনৈতিক আইন ভঙ্গ, সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার প্রবণতা তৈরি করে। আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের বিকশিত হবার সম্ভাবনা বেশি তাকে বাঁধা দেয়।

মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনে স্বীকৃতি থেকেই কেবল উদ্ভূত নয় । এর ফলে সাধারণভাবে অগ্রগতি এবং উন্নয়নও সম্ভবপর

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতারের সময় মানবাধিকারের বিষয়গুলো (বিবিধ) এর প্রায়োগিক অবস্থাটির সাথে সম্পৃক্ত এবং এদের সীমানা নির্দেশ করে।

যখন অধিকার সীমিত করা হয় তখন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। অধিকারের যে কোন সীমিতকরণ ঠিক ততটুকুই হতে হবে যতটুকু প্রয়োজনীয়, এবং অধিকার সীমিত করার কার্যক্রম বৈধ হতে হবে (অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন সর্বজনগ্রাহ্য আইনের দৃষ্টিতে বৈধ), এবং শক্তির যেকোন প্রয়োগ বা সীমিতকরণের মাত্রা আইনগতভাবে যা সম্ভব তার সমানুপাতিক হতে হবে। পুলিশ কর্মকর্তাদের আচরণ নৈতিকতা পূর্ণ হতে হবে এবং তাদেরকে যে নিজেদের কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হতে পারে তা বুঝতে পারাও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মানবাধিকার সীমিতকরণের সময় যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত তা মনে রাখাকে সহজতর করার জন্য প্রশিক্ষণের সময় শেখানো ইংরেজিতে এর মূল দিকগুলোর প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে তৈরী 'PLAN' বেশ কাজ দেয়।

গ্রাফ-২

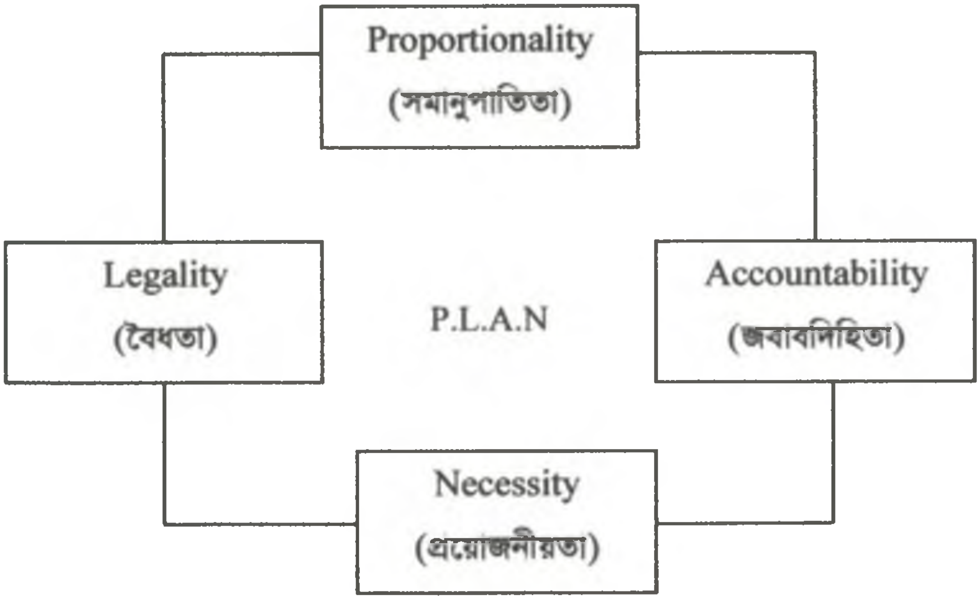

Dhaka University Institutional Repository

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য জাতিসংঘ আচরণ বিধি

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩৪/১৬৯ মোতাবেক জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একটি আচরণ বিধি গৃহীত হয় যা সারা বিশ্বের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত হয় এবং এটা প্রত্যেক দেশের জাতীয় আইন ও বিধিমালার আওতার মধ্যে থেকেই সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য দিক নির্দেশনাকারী হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেক ধারার ক্ষেত্রে মন্তব্যসহ এটাতে আটটি ধারা রয়েছে। নতুন আচরণ বিধি ও নৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে এটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। পুলিশ সম্পর্কিত সাধারণ আইন ব্যবস্থা, সাধারণ আইন, উপ-আইন, বিধি এবং প্রবিধানসমূহ যা পুলিশ আচরণ সম্পর্কিত এই বিধি।

'আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা' প্রত্যয়টি অন্তর্ভূক্ত করে সব আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, যারা নিয়োগকৃত বা নির্বাচিত, যারা পুলিশী ক্ষমতা প্রয়োগ করে, বিশেষ করে গ্রেফতার বা আটক। জেল ও পুলিশ কর্মকর্তারাও এখানে অন্তর্ভূক্ত।

নীতি, শক্তি এবং অস্ত্রের ব্যবহার

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ জনগণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা উভয়ের জন্যই সঙ্কটপূর্ণ বিবেচনার বস্তু। পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতিদিনই অসংখ্য বিভিন্ন জনবাঁধার সম্মুখীন হতে হয় এবং যখন এ রকম করতে আজ্ঞাবহ হয় তখন তাদের কর্তব্য পালনে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। পুলিশ কর্তৃক প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ এক মাত্র মানবজীবন রক্ষায় পুলিশ কর্মকর্তা

Dhaka University Institutional Repository

অথবা সন্দেহকারী ব্যক্তি কর্তৃক আক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে ব্যবহার করা উচিত।

পুলিশ কর্মকর্তাদের অবশ্যই তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান দিতে হবে- বিশেষ করে জীবন ও মর্যাদার সম্মান ও মূল্য সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ থেকেই গুরুত্ব দিতে হবে। পুলিশ কর্মকর্তাদের শক্তি এবং অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবহার সম্পর্কে পুরোপুরি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ না দিয়ে পাঠানোই নয় বরং সরকারী শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত, নৈতিক এবং মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞান না দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের চাকরীতে পাঠানো অন্যায়। সুচিন্তিত এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম ছাড়া পুলিশ অফিসারগণ মানবাধিকার নীতিমালা মেনে চলবে তা খুব কমই আশা করা যায়।

পুলিশী নিষ্ঠুরতা এবং বৈষম্য

পুলিশ সেবা কার্যক্রমে আইন সম্মত কর্তৃপক্ষ- তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। "পুলিশী নিষ্ঠুরতা" সাধারণ ভাবে অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত এবং অযৌক্তিক শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগকে বোঝায়- যা বিশেষ ভাবে গ্রেফতারের সময়, কারাগারে বন্দি অবস্থায় এবং জিজ্ঞাসাবাদারে সময় ঘটে থাকে। পুলিশী নিষ্ঠুরতা শুধু মাত্র গ্রেফতার,বন্দী বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়। এটা শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগকেও অন্তর্ভূক্ত করে। শারীরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াও পুলিশী কার্যক্রম করতে গিয়ে খারাপ আচরণ করা, ঔদ্ধত্য, শত্রুতা, অন্যকে

Dhaka University Institutional Repository

আদেশ দানের মানসিকতা অথবা কোন ব্যক্তিকে বা তার সম্পদের তল্লাশি চালানো ইত্যাদিও পুলিশী নিষ্ঠুরতার অন্তর্ভূক্ত।

পুলিশী বৈষম্যের কারণে বিভিন্ন সংস্কৃতি ভেদে এক ধরণের পুলিশী নিষ্ঠুরতা সমাজে অহরহ ঘটে থাকে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা যদি ব্যক্তিকে বিচার না করে, জাতি, বর্ণ, ধর্ম অথবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আইনের প্রয়োগ করেন তাহলে তিনি বৈষম্য করেন। নিষ্ঠুরতা এবং বৈষম্য পুলিশের মধ্যে ঘটতে পারে, যেখানে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভয় দেখানো এবং অপদস্থ করার ঘটনা ঘটে অথবা যেখানে ব্যক্তি কেবল মাত্র জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ ভেদে অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে বা খারাপ আচরণ পেয়ে থাকে।

দূর্নীতির বিরুদ্ধে নীতি এবং কার্যক্রম

যে কোন পুলিশ সংস্থার সুনামের ক্ষেত্রে পুলিশের দূর্নীতি ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। আচরণ বিধিমালার উল্লেখ আছে যে, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ কোণ ধরণের দূর্নীতি করতে পারবেন না এবং তারা অত্যন্ত কঠোর ভাবে এ সমস্ত কার্যক্রমকে বাধা দিবেন এবং এগুলো কমিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। দূর্ভাগ্যবশতঃ সারা বিশ্বে যত পুলিশ অফিসার রয়েছেন যারা দূর্নীতি করেও তাকে ন্যায়সঙ্গত বলে তাকে প্রমাণ করার সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পান। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত অজুহাত হচ্ছে পুলিশ সদস্য কম বেতন পান।

- পুলিশী দূর্নীতি তখনই ঘটে যখন একজন পুলিশ কর্মকর্তা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বিশেষ যোগ্যতা এবং তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। পুলিশী দূর্নীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘটে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

নীতি এবং নির্যাতন

নির্যাতন, পুলিশিং এর অন্য একটি দিক যা পুলিশ অফিসারদের মধ্যে নৈতিক উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে। নির্যাতন সেখানেই ঘটে যেখানে পুলিশ কর্মকর্তাগণ কথনো মনে করেন যে, সন্দেহকারীর নিকট থেকে তথ্য আদায় করতে আলাদা চাপ প্রয়োগ অথবা বেআইনী প্রক্রিয়া ব্যবহারের অধিকার তাদের রয়েছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংস্থায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এছাড়া কার্যতঃ নির্যাতন অমানবিক এবং তা সন্দেহকারীর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। নির্যাতন বন্ধের অন্য একটি কারণ এই যে, পুলিশ কর্মকর্তাগণ একটি অপরাধের প্রতিকার অন্য অপরাধ দ্বারা করতে পারেন না।

থানা হেফাজতগুলোর অবস্থা ও গ্রেফতারকৃতদের অধিকার

থানা হেফাজতগুলোর পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর এবং মানুষ বসবাসের অনুপযোগী। এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে, প্রশাসন ও জনগণ মনে করে বন্দিরা মানবাধিকার ভোগ করার যোগ্য নয়, তাদের কোনো মানবাধিকার নেই। থানা বা কারা হেফাজত গুলোকে গ্রেফতারকৃত বা কয়েদিদের সংশোধনের জায়গা বলে মনে করা হয় না, বরং মনে করা হয় যে, থানা হাজত বা কারাগার হচ্ছে একটা প্রায়শ্চিত করার জায়গা শাস্তি ভোগের প্রতিষ্ঠান মাত্র।

স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

থানা হাজতগুলো হয়ে থাকে অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাতে । অমসৃন ও এবড়ো থেবড়ো মেঝে। থানা হাজতগুলোর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে গ্রেফতারকৃত বা

Dhaka University Institutional Repository

থানা হাজতে দূর্নীতি

থানা হাজতে সুযোগ-সুবিধাদির অভাবের কারণে বন্দিদের অধিকার ও মৌলিক চাহিদাগুলো দূর্লভ পণ্যে পরিণত হয় এবং অর্থের বিনিময়ে সেগুলো পাওয়া যায়। ফলে গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত বন্দিরা তাদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয় আর শুধু ধনী ও প্রভাবশালী বন্দিরা, বিশেষত সন্ত্রাসীরা টাকার বিনিময়ে সুবিধাদি ও খাদ্য সরবরাহ পেতে পারে।

কারা পরিস্থিতি

মান্ধাতার আমলের কারা আইন, ১৮৯৪ এবং বেঙ্গল কারা বিধি, ১৯৩৭ দ্বারা এখনও পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের কারাগারগুলো। কারাবন্দিদের অধিকার বিষয়ে জনগণ এবং প্রশাসনের মধ্যে খুব একটা সচেতনতা নেই। মনে করা হয়, প্রত্যাবাসন নয়, শাস্তিই দণ্ডপ্রাপ্তদের পাওনা। এই ক্রমবর্ধমান অবহেলার কারণেই কারা পরিস্থিতির এই দুর্দশা এবং দন্ডিত ও বিচারাধীন কারাবন্দিদের প্রতি এত অবজ্ঞা। এজন্যে কোনো সংস্কার কর্মসূচীতে এখনও হাত দেয়া হয়নি, যদিও ১৯৮০ সালে বিচারপতি মুনিম সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বেশ কিছু প্রস্তাব ছিল। কারাগারগুলিতে এখনও কমসংখ্যক স্টাফ ও অপ্রতুল সরঞ্জামের মধ্যে অত্যধিক কয়েদির ভিড়, তদুপরি রয়েছে কর্তৃপক্ষের অবহেলা। স্বল্প বরাদ্দের বাজেটের ফলে সেখানে সবকিছুই দুস্প্রাপ্য, যা কর্মচারীদের দূর্নীতি আর অনিয়ম করতে প্ররোচিত করে। খাদ্যে পুষ্টির স্বল্পতা, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার ফলে যক্ষ্মা, জন্ডিস ও চর্মরোগের মতো অসুখ-বিসুখ এখন সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে। জনবহুল খোপগুলোতে কয়েদিরা পালা করে আলাদা আলাদা সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমাতে বাধ্য হয়। এই অত্যাধিক ভিড়ের অনেকটাই হয়ে থাকে আদালতে মামলাগুলোর বিচার ঝুলে থাকার কারণে। শতকরা ৬৫.৫৮ ভাগেরও বেশি সংখ্যাক বন্দি এখনও বিচারের অপেক্ষায় আছে ; প্রকৃতপক্ষে তাদের অনেককেই আটক করা হয়েছিল ছোট ছোট অপরাধের কারণে এবং তারা হয়তো তাদের সম্ভাব্য দন্ডের মেয়াদের বেশি সময় ইতোমধ্যেই কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছে। বিদেশী বন্দিদের চলমান আটকাবস্থার ফলেও এই সংখ্যাটি বেড়েছে, যে বিদেশিরা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সহযোগিতা কিংবা আইনের মনোযোগ পায়নি।

সারণী : ২০ বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে বন্দিদের অবস্থা (২০০২)

ক্রমি নং	কারাগারের নাম	ধারণ ক্ষমতা			কারাগারে বন্দি						প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় থাকা বিদেশী বন্দির সংখ্যা		মোট বন্দি		সর্বমোট
					সাজা প্রাপ্ত		বিচারাধীন		আটক						
১০টি কেন্দ্রীয় কারাগার		পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
১.	ঢাকা	২,৫৪৮	৮৪	২,৬৩২	২,০০২	৫৩	৮,১৭৪	৩০১	১,১৩৮	০৭	১৪	০৩	১১,৩৪৮	৩৬৪	১১,৭১২
২.	কাশিমপুর	৩৫০	-	৩৫০	১,০৫৭	-	৫৪	-	০৭	-	-	-	১,১১৮	-	১,১১৮
৩.	ময়মনসিংহ	১,১১৮	১৪	১,২০২	১,২৬৪	৪৬	১,০৯১	৩০	৯৬	০২	০১	০১	২,৪৫২	৭৯	২,৫৩১
৪.	রাজশাহী	১,২৩৬	৪১	১,২৭৭	১,৮১১	৫৬	৯৬৬	৪০	৮২	-	৩১	-	২,৮৯৩	৯৬	২,৯৮৯
৫.	রংপুর	১,০০৬	১৩	১,০১৯	৮৯৯	৪৩	৮০৫	২৬	৮১	-	০১	-	১,৭৮৬	৬৯	১,৮৫৫
৬.	কুমিল্লা	১,৭৯৪	২২	১,৮১৬	১,৬৮১	৫৫	১,২৮৪	৫৮	১৬৯	-	১৭৩	-	৩,৩০৭	১১৩	৩,৪২০
৭.	চট্টগ্রাম	১,০১০	৩৭	১,০৪৭	৫৬৬	০৮	৪,৭৫২	১০২	২৭১	-	০৩	-	৫,৫৯২	১১০	৫,৭০২
৮.	সিলেট	১,১৮৫	২৫	১,২১০	১,০৫৭	১৩	১,৩৩৪	৪০	৫৬	-	৪৮	-	২,৪৯৫	৫৩	২,৫৪৮
৯.	যশোর	১,৮৭৪	৪৫	১,৯১৯	২,৪২৯	৯৬	১,১৬৭	৫৮	১৫২	-	৩৩	০৫	৩,৭৮১	১৫৯	৩,৯৪০
১০.	বরিশাল	১,১১০	২২	১,১৩২	৯৬৩	২৪	৫৭৪	১৭	৯৭	-	-	-	১,৬৩৪	৪১	১,৬৭৫
	মোট	১,৩৩০১	৩০৩	১৩,৬০৪	১৩,৭৪৯	৩৯৪	২০,২০৪	৬৭২	২,১৪৯	০৯	৩০৪	০৯	৩৬,৪০৬	১,০৮৪	৩৭,৪৯০
	৫৫টি জেলা কারগারে মোট	১০,৩২৩	৬১১	১,০৯৩৪	৫,৬৪৮	১২৫	২৭,৪৯৭	৮৯৭	৩,০৪৯	২৯	৩৯১	০৯	৩৬,৫৮৫	১,০৬০	৩৭,৬৪৫
	১৬টি উপজেলা কারাগারে মোট	৪০০	৮০	৪৮৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৮১ কারাগারে মোট	২৪,০২৪	৯৯৪	২৫,০১৮	১৯,৩৯৭	৫১৯	৪৭,৭০১	১,৫৬৯	৫,১৯৮	৩৮	৬৯৫	১৮	৭২,৯৯১	২,১৪৪	৭৫,১৩৫

সূত্র : তথ্যসংরক্ষণ ইউনিট (আসক)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

কারাগারে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি

বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা এবং কারাগারগুলোর দুরবস্থার একটি অন্যতম কারণ হলো ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্তসংখ্যক বন্দির অব্যাহতভাবে কারাগারে অবস্থান। ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে দেশের কারাগারগুলোতে মোট বন্দির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮ হাজার, যেখানে কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭,৩৬৮ জন, তখন কারাবন্দিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬ হাজার জনে ছাড়িয়ে পড়ে। ঘুমানোর স্থান সংকটের কারণে বন্দিদের, এমনকি নারী বন্দিদের পর্যন্ত সময় ভাগ করে পালাক্রমে ঘুমাতে হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতা ২,৬৪২ জনের স্থলে তিনগুণের বেশি, প্রায় দশ হাজার বন্দি রয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ১,৫০৭ জনের ধারণক্ষমতার বিপরীতে চারগুণ অর্থাৎ ৬,৪৬৮ জন বন্দি রয়েছে। 'গনগ্রেফতারের' সময়ে কারাগারের সাধারণভাবে থাকা ক্ষমতাতিরিক্ত বন্দি সংখ্যার মাত্রা আরো ব্যাপকতর হয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮ এর ২৮ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১,৬৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়, ২০০৭ সালের মে-জুনে এ সংখ্যা ছিল ১,২৯১। অব্যাহতভাবে বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং খাদ্য, স্থান ও সুবিধাদির সঙ্কট কারা প্রশাসনের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, কারাগারে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে কমপক্ষে ১৩০ জন কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক (চাকুরিচ্যুতি) ব্যবস্থা নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী:২১

কারাগারে অতিরিক্ত বন্দি (জানুয়ারী ২০০১- জানুয়ারী ২০০৮)

মাস/বছর	ধারণক্ষমতা	বন্দিসংখ্যা
জানুয়ারী ২০০১	২৩,৯৪২	৬০,৮৮৭
জানুয়ারী ২০০২	২৪,৯৯৭	৬২,৪৮৬
জানুয়ারী ২০০৩	২৫,০১৮	৭৫,১৩৫
জানুয়ারী ২০০৪	২৫,৩৯৬	৬৯,৫১৯
জানুয়ারী ২০০৫	২৬,১৫৭	৭৪,৭১০
জানুয়ারী ২০০৬	২৭,১১২	৭২,৮৩৬
জানুয়ারী ২০০৭	২৭,২৫৪	৬৮,২৭৮
মে ২০০৭	২৭,২৫৪	৮৫,৯৪১
জুলাই ২০০৭	২৭,৪৫১	৮৭,০১১

(সূত্র:'সরভিসড ইনটু প্রিজনস' দি ডেইলি স্টার,২৬ জুলাই ২০০৮ ।)

Dhaka University Institutional Repository

কারাগারে নারী বন্দি

৭ আগস্ট ২০০৮ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে অন্তত ৩,৪৮০ জন নারী অবস্থান করছে। কারাবিধিতে নারীদের পুরুষ থেকে পৃথকভাবে রাখার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও জানা গেছে একজন বিচারাধীন নারী বন্দি কারাগারে গর্ভবতী হয়েছে এবং ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে কারা কর্তৃপক্ষ একজন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে এবং সে এ ঘটনার জন্য দায়ী বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এ বছরে (২০০৮) নারীদের জন্য তৈরী একমাত্র কারাগারটি, যা গত ২০০৭ এ নির্মিত হয় সেটি চালু হয় এবং অত্যধিক বন্দি ভারাক্রান্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নারী বন্দিদের সেখানে স্থানান্তর করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পুলিশ হেফাজত বনাম নিরাপদ হেফাজত, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পুলিশি হেফাজতে নারী ও পুরুষ এবং পুলিশের ধরা-ছাড়া বাণিজ্য

'এক পিঁড়ি করে দারোগাগিরি

বইসা বইসা খায় দশ পিঁড়ি'- প্রবাদ

(এক পুরুষ দারোগাগিরি করলে দশ পুরুষ বসে খাওয়ার মতো অর্থবিত্ত সঞ্চয় করতে পারে ।)

প্রবাদটির জন্ম ব্রিটিশ আমলে। ভারত উপনিবেশ শাসন করার জন্য ব্রিটিশরাই চালু করেছিল পুলিশী ব্যবস্থা, স্থাপন করেছিল থানা। প্রণয়ন করে পেনাল কোড। এই কোডের ফাঁক ফোকরের মধ্যেই ছিল অবৈধ অর্থবিত্ত অর্জনের সুযোগ। সেই সুযোগ কাজে লাগানো যায় এবং লাগানো হতো বলেই প্রবাদটির জন্ম। এ সুযোগ ব্রিটিশ আমলে যেমন ছিল, পাকিস্তান আমলেও তেমনি ছিল এবং এখনও তেমনি আছে। তবে তার ধরণ পাল্টেছে এই মাত্র।

ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলেও থানাকে নিয়ে এক ধরণের বাণিজ্য ছিল, এখনও আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সেই চিত্র পাল্টায়নি। থানার ধরা-ছাড়ার বাণিজ্য আছে ; পুলিশের 'সামারি' বাণিজ্য আছে, চার্জশিট হালকা পাতলা করার বাণিজ্য আছে, ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে বছরের পর বছর হাজত খাটানোর কাহিনী আছে। আছে আরও অনেক কাহিনী। ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ এর জ্বালা বোঝে না। থানা পুলিশ সম্পর্কে যাদের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাদের সবাই জানেন এগুলো হয়। অথচ প্রকাশ্যে কেউ এর সাক্ষ্য দেন না। পুলিশ এই সুযোগটাই নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিরীহ একটা লোককে পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে এল আত্মীয়-স্বজন টাকা খরচ করে তাকে ছাড়িয়ে আনল। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করলে সেই ব্যক্তি বা তার আত্মীয় স্বজন কেউই টাকা লেনদেনের কথাটি স্বীকার করবেন না। অর্থাৎ এই বাণিজ্যে টাকার লেনদেন আছে, তবে কোনও রসিদ নেই, সাক্ষী নেই।

বলা হয়ে থাকে ব্রিটেনের পুলিশ-প্রশাসন সবচেয়ে চৌকস এবং প্রায় দুর্নীতিমুক্ত। অথচ এই ব্রিটিশই ভারত উপমহাদেশে এমন পুলিশ প্রশাসন কায়েম করে গেছে যা সবচেয়ে দূর্নীতিপরায়ণ। তার জের আমরা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি। দেশের থানাগুলো সেজন্য এখনও দূর্নীতির অন্যতম উৎসস্থল। সরকারি-বেসরকারি হিতোপদেশ, পুলিশ সপ্তাহের পর সপ্তাহ পালনের পরও তাই পরিস্থিতির তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। থানাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে থানার দালাল। এদের কাজই হচ্ছে থানা থেকে অর্থের বিনিময়ে আসামি (ধরে নেওয়া ব্যক্তি অর্থে) ছাড়িয়ে আনা, বাণিজ্যের জন্য ছুতোনাতায় নিরীহ লোককে আটক করতে পুলিশকে প্রলুব্ধ করা। এতে দু-পক্ষেরই লাভ।

থানায় 'ধরা-ছাড়া'র এই বানিজ্যে আছে এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তি, আবার আস্থাভাজন ব্যক্তি, গডফাদার, রাজনৈতিক দলের নেতা, পুলিশের আত্মীয়স্বজনের কেউ কেউ এবং পুলিশের সোর্স নামে পরিচিত একশ্রেণীর লোক।

মহানগরী ঢাকার থানাগুলোতেও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে থানা ভেদে বাণিজ্যের হেরফের আছে। যে থানা এলাকায় ক্রাইম বা অপরাধ বেশী, সেখানে বাণিজ্যের পরিমাণ ও বেশী। বিএনপি আমলে দেখা গেছে ধরে আনা লোক ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে থানার ভেতরেই কথাবার্তা হতো, লেনদেনও হতো প্রায় প্রকাশ্যেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর সেই রেওয়াজে ভাটা পড়ে। বর্তমান আমলেও সেই

Dhaka University Institutional Repository

ভাটার টান, এখন টাকা পয়সা লেনদেনের কথাবার্তা হয় মোবাইল ফোনে বা রেস্তোরায় বসে। অর্থ হস্তান্তরের কাজটিও হয় সঙ্গোপনে।

রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকা ঘুরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হলে দিতে হয় সন্দেহভাজনক আসামির ক্ষেত্রে ৫ হাজার থেকে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মোবাইলে এই পরিমাণ টাকার ফ্ল্যাক্সিলোড, আবার কখনও বা এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট। 'ধরা ছাড়া' বাণিজ্যের ব্যাপারে কয়েকটি থানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, আগে যেমন ছিল এখনও প্রায় তাই। সরকার দলীয় নেতা, এমপি, মন্ত্রী বা তাদের এপিএস ফোনে তদবির করেন। স্থানীয় নেতারাও আসেন, আসেন সরকারি দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতারাও। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কোনও লেনদেনের বিষয়টি তারা এড়িয়ে যান অথবা অস্বীকার করেন।

থানায় 'ধরা-ছাড়া'র বাণিজ্য যে কিভাবে চলে তার একটি উদাহরণ ২৩ জুন, ২০০৯ রাত ৮ টায় কাফরুল থানায় গিয়ে দেখা যায়, সেনপাড়া থেকে ধরে আনা নির্মান শ্রমিক পান্নাকে (২৪) ডিউটি অফিসারের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। মোবাইল কেনার বিরোধের সূত্র ধরে থানার এস আই মোস্তাক সকাল ৮ টায় তাকে ধরে আনলেও থানা হাজতে রাখেনি। রাত ৮ টা পর্যন্ত থানা হাজতের বাইরে এভাবে রাখার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, হাজতে রাখলে রেজিস্ট্রার খাতায় এন্ট্রি করতে হবে, ছেড়ে দিলে অন্য অফিসারকেও ভাগ দিতে হবে। ঘুষের টাকা একাই ভোগ করার এটি সহজ কায়দা। ধৃত পান্নার স্বজন আলিমের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, 'দারোগা বাইরে, ১০ নম্বরের এক ভাই কথা বলেছে, ৫ হাজার টাকা দিতে হবে, ছেড়ে দেবে" এই ভাই স্থানীয় যুবলীগ নেতা।

Dhaka University Institutional Repository

নগরীর প্রায় সব থানাতেই চলছে আসামি ধরা- ছাড়ার বাণিজ্য। এর মধ্যে মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল, বিমানবন্দর, দক্ষিণখান, তেজগাঁও- এই ছয় থানায় বাণিজ্য অর্থ বেশী। পুলিশ সোর্স ও সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে চলে পুলিশের এই আসামি ছাড়ার ব্যবসা।

অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন থানা সোর্সদের সোর্সমানি না দেওয়ায় তারা আসামিদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে সংসার চালায়। এসব সোর্সের অনেকে নিজেরাই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত। প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে এদের জুড়ি নেই। এ সব কারণে ডিএমপি পুলিশ সমালোচিত হয়েছে।

পুলিশী হেফাজতে খুলনার ময়না (পুলিশের বাণিজ্য, নিরাপরাধের যাবজ্জীবন)

পুলিশের আসামি ছাড়িয়ে আনার বাণিজ্যের শিকার অনেক নিরীহ মানুষ। টাকার বিনিময়ে অপরাধীকে যেমন ছাড়িয়ে আনা যায় তেমনি টাকা না দিলে অনেক নিরীহের ভাগ্যে জোটে যাবজ্জীবন কারাবাস। তেমনি একটি ঘটনা ঘটে খুলনার দৌলতপুরে। মাত্র ৫ হাজার টাকার সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসাবে ময়নাকে আদালতে চালান করে দেন দৌলতপুর থানার তৎকালীন এস আই মোক্তার হোসেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৪ সালের ২৯মে দৌলতপুর থানার এস আই মোক্তার গভীর রাতে ময়নাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। পুলিশ তার কাছে নাম জানতে চাইলে সে তার নাম ময়না খাতুন বলে জানায়। তখন পুলিশ তাকে ধমক দিয়ে বলে তোর নাম কোহিনুর। ময়না খাতুন পুলিশকে কাকুতি-মিনতি করেও বোঝাতে সক্ষম হয়নি যে,

Dhaka University Institutional Repository

সে কোহিনুর নয়। এক পর্যায়ে পুলিশ তাকে ৩ দিন আটকে রাখে। পরে ময়নার স্বামী আবদুল কাদেরকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়। তাদের কাছে দারোগা মোক্তার হোসেন ৫ হাজার টাকা দাবি করেন। দাবিকৃত টাকা দিলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান। দূর্ভাগ্য, হত দরিদ্র কাদেরের পক্ষে দাবিকৃত টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে পুলিশ ৩০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত কোহিনুর বেগম হিসেবে ময়নাকে আদালতে চালান দেয়। আদালতও ময়নার কোনও জবানবন্দি গ্রহণ করেনি। এরপর থেকে শুরু হয় ময়নার কারাভোগ। যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে (কয়েদি নম্বর ২৯৩) দীর্ঘ তিন বছর জেল খাটে। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে ব্লাস্টের সহায়তায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে সে মুক্তি পায়।

ঘটনার খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোহিনুর গংয়ের বিরুদ্ধে ২০০২ সালের ১০ অক্টোবর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের খুলনা থানা মামলা নং ২১৯/০২-এ ৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল হয়। কোহিনূরের স্বামীর নাম আঃ কাদের। বাড়ি খুলনার দৌলতপুর এলাকায়। পলাতক অবস্থায় কোহিনুরের ৩০ বছরের সাজা হয়। রায়ের পর ময়নার স্বামীর নামে মিল থাকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই থেকে বিনা অপরাধে ময়না আসামি কোহিনূরের স্থলে ২০০৪ সালের ২৯ মে থেকে কারাভোগ করে ২০০৭ এর নভেম্বর পর্যন্ত। অন্যদিকে আসামি কোহিনুর এখনও পলাতক। জানা যায়, কোহিনূরের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খেয়ে স্বামীর নামে মিল থাকায় পুলিশ নিরাপরাধ ময়নাকে আদালতে চালান দেয় যাবজ্জীবন সাজার আসামি হিসাবে।

পুলিশ এ ধরণের দূর্নীতিতে কেন জড়িয়ে পড়ে এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। তবে সবাই মনে করেন যে, এ জন্য প্রয়োজন পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার,

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের বেতন কাঠামো পরিবর্তন, সেবামূলক মানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচলিত কিছু আইনের সংস্কার। তারা আরও বলেন, এসব করা না হলে পুলিশ সপ্তাহ পালন করে ও 'পুলিশ জনগণের বন্ধু' বলে প্রচার চালিয়ে কোনও লাভ হবে না, কমবে না সাধারণ মানুষের দূর্গতি।

নিরাপদ হেফাজত বনাম পুলিশ হেফাজত

'সেফ কাস্টডি' বা 'নিরাপদ হেফাজত' এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনে নিরাপদ হেফাজতের উল্লেখ নেই, এমনকি জেল কোডেও নিরাপদ হেফাজতের উল্লেখ নেই। ফলে জেলখানায় এই উদ্দেশ্যে আলাদা কোন সেল নেই বা হেফাজতীদের পৃথক রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এটা হচ্ছে কয়েক দশকের উদ্ভুত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অস্থায়ী ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নারী ও শিশুকে তাৎক্ষনিক বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আইনের বিধান ব্যতীতই 'নিরাপদ হেফাজত' বা 'সেফ কাস্টডি' ব্যবস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে। আইনে না থাকলেও আদালত তার নিজস্ব এখতিয়ার বলে বা Judicial Discretion অনুযায়ী নিরাপদ হেফাজতের আদেশ দিয়ে থাকেন। কোন কারণে কেউ অবস্থার শিকার হয়ে অথবা জীবনের নিরাপত্তাজনিত কারণে অথবা বিচার সংক্রান্ত কারণে কারাগারে আটক থাকলে তাকে নিরাপত্তা হেফাজতি বন্দী বলা যায়। যে বন্দীকে আদালত কারাগারে পাঠানোর সময় পরোয়ানায় 'ভিকটিম' বা 'জুডিশিয়াল কাষ্টডি' লেখা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাকেই নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী বলা হয়। নিরাপত্তা হেফাজতি হাজতি বন্দীদের মতোই সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ সালে রাধিকা কুমারস্বামী জাতিসংঘে প্রদত্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের সেফ কাস্টডি নিয়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রকাশিত হয়। যে সকল নারী ও শিশু অপরাধের শিকার হয় অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কোথাও যাবার পথ থাকে না 'সেফ কাস্টডি' নামক নির্ধারিত ব্যবস্থাটি তাদের রক্ষার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। আর এভাবেই ভিকটিমদের কারাগারে রাখা হয়। বাংলাদেশে যাদের সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়, তারা হলো ঃ

(১) যে সকল মেয়েরা অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করে অথবা অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করে ;

(২) ধর্ষণের শিকার নারী বা মেয়ে ;

(৩) পতিতালয় থেকে উদ্ধারকৃত নারী ও মেয়ে শিশু ;

(৪) পারিবারিক নির্যাতনের কারণে পরিবার থেকে বিতাড়িত নারী বা মেয়ে ;

(৫) পাচারকারীদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত নারী, মেয়ে ও শিশু ;

(৬) হারিয়ে যাওয়া অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন নারী, মেয়ে বা শিশু।

আইনগত ভিত্তি

প্রচলিত ফৌজদারী কার্যাবিধির ধারা ৪৬৬ (২) এবং ধারা ৪৭১ (১) এ নিরাপত্তা হেফাজত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ধারাগুলো প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা হেফাজত সম্পর্কে বিধান এসেছে সম্প্রতি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ। এ আইনের ধারা ৩১-এর বিধান অনুযায়ী ভিকটিমদের কারাগারে না রেখে বিকল্প কোনো আবাসনে রাখতে বলা হয়েছে। কারাগারে নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা, ওয়ার্ড কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

সেল নেই। কারা বিধি অনুযায়ী তাদের রাখার কোনো বিধানও নেই। ফৌজদারী কার্যবিধিতে বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলেও আদালত তার বিচার এখতিয়ার বলে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে প্রকৃতপক্ষে কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। নিরাপত্তা হেফাজত এখন রীতিতে পরিণত হওয়ায় এর আইনগত ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সরকার মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগে পুরুষ-নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু নিরাপদ হেফাজতের নামে কারাগারে থাকা অনেক প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে সক্ষম কিন্তু তারপরও তাকে শুধু মহিলা এ কারণে নিরাপত্তার নামে আটক রাখা হয়েছে।

আইনের একটা সাধারণ নীতি হলো, একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে যদি কোনো অপরাধী বেঁচেও যায় তবুও কোনো নিরাপরাধীকে আটকানো যাবে না কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশে তথাকথিত 'নিরাপরাদ হেফাজত'-এর নামে আমাদের আদালতগুলি কোনো অপরাধ করেনি এমন নারী ও শিশুকে কারাগারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উপরন্ত দেখা যায়, অপরাধী নয় তবুও তাদের হাতে হাতকড়া পরানো হচ্ছে।

১৯৯৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী, বেতাগীর একটি মেয়ে, নাম তার সুফিয়া, তাকে নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় যে, "বেতাগীর চান্দখালীর সুফিয়া বেগমের গোপন অঙ্গ হতে দুটি মার্বেল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশনের পর আদালতের নির্দেশে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ তাকে বরগুনা হাসপাতাল ভর্তি করা হয়, কিন্তু হাসপাতালের বেডে তার ঠাঁই হয়নি। সে মেঝেতে কাতরাচ্ছিল, সেই অবস্থায় সুফিয়াকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখা হয়েছিল, একটি বেডের সাথে হ্যান্ডকাফ আটকানো ছিল", অথচ সুফিয়া মামলার বাদিনী।

১৯৯৮ সালের ১৫ মে দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল "হাসপাতালের বিছানায় নিরাপত্তা হেফাজতি মহিলার হাতে আবার হাতকড়া" খবরটি হচ্ছে- "পাখির পায়ে শিকল বেঁধে রাখাও একটা অমানবিক ব্যাপার। কিন্তু পাখি নামের এই মেয়েটির হাতে হাতকড়া বেঁধে রাখা হয়েছে হাসপাতালের বিছানায়। যদিও কোনো অপরাধ মামলার মামলায় তিনি বাদিনী"।

পুলিশ হেফাজত থেকে নিরাপত্তা হেফাজতে নারীকে যে ধরণের বৈরি পরিবেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে

নিরাপত্তা হেফাজতের নামে ভিকটিম নারী যখন বন্দী হয় এবং কারাগারে প্রেরিত হওয়ার পরে ভিকটিমকে একটি বড় ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। এ পরিবেশের সাথে ভিকটিম পরিচিত নয়। কারাগারের পরিবেশ অনুযায়ী ভিকটিমকে নোংরা অপরিষ্কার জায়গায় অবস্থান করতে হয়, ফলে ভিকটিম সীমাহীন কষ্ট পায়। সেখানকার পরিবেশ এমনই অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা যাতে করে ভিকটিম মানসিকভাবে অস্থির হয়ে ওঠে। মশা আর মাছির অত্যাচারে জীবন অতিষ্ট করে ফেলে। সেখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য কোন বিছানা থাকে না। রাতে ঘুমানোর জন্য একটা নিম্নমানের কম্বল দেয়া হয় এবং সেটি নোংরা, অপরিষ্কার।

Dhaka University Institutional Repository

একটি ঘরের মধ্যে সার্বক্ষনিকভাবে তালাবদ্ধ থাকতে হয় এবং সে ঘরে রাতে সারাক্ষন বাতি জ্বলতে থাকে চোখের উপর। কোন মশারী দেয়া হয় না। পায়খানা এবং গোসলখানা সীমাহীনভাবে খারাপ। একটা পায়খানা ঐ ওয়ার্ডের সকলের জন্য। অত্যন্ত অপরিষ্কার ও নোংরা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও একই রকম। নিম্ন মানের খাবার খেতে হয়। স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন করা হয় না বললেই চলে। এছাড়া যে খাবার দেয়া হয় তাতে একজন মানুষের চাহিদা পূরণ হয় না। কাজেই তারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে প্রায় সকলেরই চর্ম রোগ লেগে থাকে। এতো গেল পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত দিকের কথা। অন্যদিকে নিরাপত্তা হেফাজতে ভিকটিম নারীদের ও অন্যান্য জেল হাজতি ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের সঙ্গে একই কামরায় রাখা হয় যা দেশের প্রচলিত ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। জেল হাজতও সাজাপ্রাপ্তদের সঙ্গে থাকতে গিয়ে ভিকটিমদের নানা ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা বিভিন্ন অপরাধ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বিধায় তাদের ব্যবহার ও আচার-আচরণ সম্পূর্ণ আলাদা বা সাধারণের সঙ্গে খাপ খায় না। এছাড়া একই কামরায় এক সঙ্গে অনেকের থাকার কারণে সেখানে বিশ্রাম ও নিদ্রাযাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক লোক থাকার কারণে সেখানে অক্সিজেন কম এবং প্রচন্ড গরম থাকে। কাজেই বন্দীরা সর্বদা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দিন-রাত কাটায়। নিরাপত্তা হেফাজতের ভিকটিম কোন মামলার বাদী বা আসামী নন অথচ তাকে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে কারাগারে প্রেরণ করে নিদারুন কষ্ট দেওয়া হয় যা সম্পূর্ণভাবে বে-আইনী, মানবাধিকার ও প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের লংঘন। শুধু লংঘনই নয় ভিকটিম নারীদের উপর অমানবিক আচরণ ও অমানুষিক নির্যাতন করা হয়, যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং পীড়াদায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা হেফাজতের নামে বন্দী জীবনে নারীর ক্ষতির দিকগুলো হল

নিরাপত্তা হেফাজতের নামে বন্দী জীবনে নারীর ক্ষতির কোন শেষ নেই। সর্ব বিষয়ে সর্বদিকে নারীর ক্ষতি হয়ে থাকে।

১। নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী অবস্থায় একজন ভিকটিম নারীর ক্ষতি অপরিসীম যা অন্য কোন ভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। প্রধানত ঃ একজন ভিকটিম নারী মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। একজন ভিকটিম নিরাপত্তা হেফাজতে কারাগারে বা আশ্রয়কেন্দ্রে বন্দী হলে সামাজিক দিক দিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। ভিকটিমকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। তাকে সমাজ বিনষ্টকারী হিসেবে দেখানো হয়।

৩। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।

৪। পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয়।

৫। পারিবারিক স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়।

৬। পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

৭। নিরাপত্তা হেফাজতে কারাগারে বা কোন আশ্রয় কেন্দ্রে বন্দী থাকাতে ভিকটিমকে ধরে নেওয়া হয় তার এখন আর স্বাভাবিক জীবন নেই। সে এখন অপরাধ এবং অপরাধের সঙ্গে যুক্ত যে কারণে তাকে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

৮। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ভিকটিম নারী চূড়ান্তভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কর্মরত ভিকটিম-নারী তার চাকরি বা পূর্বের কাজ-কর্ম হারায় এবং পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

নতুন চাকরি বা কাজকর্ম পায় না। ফলে সে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯। লেখা-পড়ার সঙ্গে যুক্ত এমন ভিকটিম নারীর ক্ষতির কোন অন্ত নেই। তার চরম থেকে চরমতর ক্ষতি হয়। নিরাপত্তা হেফাজতে ভিকটিম কারাগারে বা কোন আশ্রয় কেন্দ্রে যে কতদিন বন্দী থাকবে তার কোন নির্দিষ্ট হিসেব নেই। গড় হিসাব অনুযায়ী ৩/4 বছর কারাগারে অথবা আশ্রয় কেন্দ্রে বন্দী থাকতে হয়। ফলে এই ৩/4 বছর তার পড়াশোনা সম্পূর্ণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ভিকটিম কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না বা কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বা অন্য কোনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। বছর গড়িয়ে যাওয়াতে ভিকটিম পরবর্তী পর্যায়েও কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করা থেকে বঞ্চিত হয় নিয়ম থাকার কারণে। ফলে লেখাপড়া থেকে ভিকটিম আক্ষরিক অর্থে বাদ পড়ে। ভিকটিম যত মেধাবী বা পূর্বের লেখা-পড়ার রেকর্ড যত ভাল হউক না কেন এগুলো তার পক্ষে কোন প্রভাব ফেলে না। এ ব্যাপারে আমরা ভিকটিম তানিয়া মোস্তফার লেখা-পড়ার বিষয়টি লক্ষ করতে পারি। তানিয়া মোস্তফা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিল। এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি নেওয়ার পরও নিরাপত্তা হেফাজতে কারাগারে আটক থাকার কারণে ভর্তি পরীক্ষায় হাজির হতে না পারায় তার আর মেডিকেল পড়ার সুযোগ হলো না। পরবর্তীতে আড়াই বছর পর যখন নিরাপত্তা হেফাজত থেকে বন্দী জীবনের অবসান ঘটলো তখন তার পক্ষে আর কোথাও পড়াশোনার জন্য ভর্তি হওয়ার সুযোগ রইল না। কারণ ইতোমধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে। অবশেষে ল' এন্ড সোসাইটি ট্রাষ্ট বাংলাদেশ (এলএসটিবি)-র সহযোগিতায় তানিয়া মোস্তাফার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাইভেট কলেজে আইন বিষয়ে পড়া-শোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

১০। সামাজিক মেলা-মেশার ক্ষেত্রে তাকে লাঞ্চনার শিকার হতে হয়। সকলেই ভিকটিমকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে তার কাছে নানা ধরনের এমনকি আপত্তিকর প্রশ্নও করা হয় ফলে ভিকটিম মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন দেওয়া হয়।

১১। ভিকটিমের স্বাভাবিক চলাফেরা করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। চলাফেরা করার ক্ষেত্রে ভিকটিমকে এলাকার বাসিন্দারা নানা ধরণের কটুক্তি করে, ফলে চলাফেরা করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়।

১২। ভিকটিম কোথাও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাকে কোথাও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ-দেওয়া হয়না। তার বক্তব্যকে কখনও মূল্যায়ন করা হয় না।

নিরাপত্তা হেফাজতে আটক নারীদের আইনগত প্রতিকার ও সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১। আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ এবং আইনজীবীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব।

২। দেশের প্রচলিত আইন ও বিচার বিভাগ গতানুগতিক নজির ও প্রথা প্রতিপালনে অভ্যস্ত। তাই দীর্ঘদিনের প্রথাগত আদেশ আদালতগুলো নজির হিসাবে বিবেচনা করে আদেশ প্রদান করে থাকে। যার ফলে নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

হেফাজতে ভিকটিম নারীদের অপরাধ ছাড়াই বিনা কারণে বে-আইনীভাবে কারাবাস করতে হয়।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান যথাযথভাবে অনুধাবন, প্রতিপালন ও প্রয়োগ না হওয়ার কারণে প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৪। সরকারের আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গতিশীল নয় বা সংশ্লিষ্টরা মনে করেন না যে নিরাপত্তা হেফাজত বিষয়ে ভিকটিম নারীদের আইনগত প্রতিকার দেয়া দরকার। ফলে ভিকটিম নারীদের আইনগত প্রতিকার ও সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৫। নিরাপত্তা হেফাজতকে কেন্দ্র করে যাবতীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আইনসিদ্ধ নহে। সম্পূর্ণ বে-আইনী, মানবাধিকার বিরোধী ও সংবিধান পরিপন্থী। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতন নয় বিধায় ভিকটিম নারী কোন প্রতিকার পায় না।

৬। এনজিও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নিরাপত্তা হেফাজত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে নিরাপত্তা হেফাজতে যে সকল অপপ্রয়োগ হয় তার প্রতিকার নিতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী নারী ভিকটিম যারা এ ধরনের একটি আইনি লঙ্ঘন অর্থাৎ বে-আইনী, মানবাধিকার বিরোধী, মৌলিক অধিকার খর্বকারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদেশের বিরুদ্ধে রীট করে ভিকটিমকে আইনি প্রতিকার দেওয়া তাদের পক্ষে আর হয়ে উঠছে না।

৭। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন কোন মনিটরিং ব্যবস্থা নেই যে, নিরাপত্তা হেফাজত কতজন ভিকটিম নারী কারাবাস করছে তার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষিতে আইনী প্রতিকার দেওয়া। ফলে এদের সংখ্যা সব সময়ের জন্য অপ্রকাশিত থাকছে। সরকারের এমন কোন নীতিমালা নেই যে, সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যারা নিয়মিত এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করবে। ফলে যে কোন সংগঠন, ব্যক্তির পক্ষে ভিকটিম নারীদের আইনগত প্রতিকার দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না।

৮। একজন নারী যখন ভিকটিম হয়ে নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী থাকে তখন তাকে সহায়তা দেবার মত কেউ অবশিষ্ট থাকে না। কাঠামোগতভাবে ভিকটিমকে ভিন্ন করে রাখা হয়। অথচ ঐ সময় তাকে সব থেকে বেশী সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ভিকটিম আইনী কোনো রকম সহায়তা পায়না সে কারণে তাকে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে বছরের পর বছর কারাগারে বা আশ্রয় কেন্দ্রে বন্দী থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে বিষয়টি যদি সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে আসে এবং পত্রিকায় সংবাদ হয়। সেক্ষেত্রে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যদি উদ্যোগ নেয়। তাহলে আইনি সহায়তা পেয়ে থাকে ফলে ভিকটিম নারীর আইনগত সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়।

নিরাপত্তা হেফাজতে আটক ভিকটিম নারী আইনগত সহায়তা পেতে পারেন

১। নিরাপত্তা হেফাজতে আটক ভিকটিম নারী আইনগত সহায়তা পেতে পারেন। আইনগত সহায়তায় ভিকটিম নারী নিরাপত্তা হেফাজত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

২। নিরাপত্তা হেফাজতে আটক থাকার কারণে ভিকটিম-এর যে সকল ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ আদায়ে আইনগত সহযোগিতা পেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী থাকার কারণে ভিকটিমের লেখাপড়ার যে ক্ষতি হয় সে বিষয়ে ভিকটিমকে শিক্ষা সুবিধা পূরণে সচেষ্ট হওয়া এবং এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া।

৪। নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী থাকার কারণে ভিকটিমের স্বাস্থ্যগত যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার থাকবে।

৫। নিরাপত্তা হেফাজতে বন্দী থাকার কারণে ভিকটিম সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে যে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত তার ফলে ভিকটিম এবং তার পরিবার-এর যে ক্ষতি হয়েছে সে ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সকল প্রতিকার পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করা।

৬। নিরাপত্তা হেফাজতে আটক ভিকটিমদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সমকালীন গ্রহণযোগ্য প্রশিক্ষণ (যেমন-কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ, টেলিভিশন ও রেডিও মেরামত প্রশিক্ষণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা।

৭। নিরাপত্তা হেফাজতে আটক ভিকটিমদের স্বাবলম্বী করার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা।

৮। নিরাপত্তা হেফাজতে আটক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিকটিমের নিজ পায়ে দাঁড়াবার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরি অথবা যে কোন কাজকর্ম পাওয়ার ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেসি করা এবং ভিকটিমদের নিশ্চিতভাবে কাজ কর্মের বা চাকরির ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ নিরাপত্তা হেফাজত বিষয়ে ভিকটিমদের যে ধরনের সংগঠন সহযোগিতা দেয়

নিরাপত্তা হেফাজত বিষয়ে সহযোগিতা দেয় এমন সংগঠন নেই বললেই চলে। নিরাপত্তা হেফাজত বিষয়ে দেশে প্রচলিত কোন আইন নেই অথচ প্রথাগত ভাবে ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকগণ ভিকটিম নারীদের নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখার আদেশ প্রদান করেন কোনো কিছু বিবেচনা না করেই। আর এ বিষয়ে অধিকাংশ সংগঠনের স্বচ্ছ ধারণা নেই বললেই চলে। ফলে পুলিশ হেফাজত বা নিরাপত্তা হেফাজতের নামে যে নারীর মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে, মানবাধিকার ও সংবিধান লঙ্ঘন হচ্ছে তা অনেকাংশে সংগঠনগুলোর নজরের বাইরে পড়ে আছে। নিরাপত্তা হেফাজত বিয়ষটিতে যেখানে চলাফেরা করার অধিকার বিনষ্ট হচ্ছে এ বিষয়ে রাষ্ট্র, সরকার, কর্তৃপক্ষের কোন অনুভূতি বা এ বিষয়ে প্রতিকার দেওয়ার ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ বা নৈতিক ইচ্ছা নেই। ফলে বলতে গেলে এ বিষয়ে ভিকটিমদের সহযোগিতা দেওয়ার কেউ নেই। তবে লক্ষ করা যায় নিরাপত্তা হেফাজত বিষয়ে হাতে গোনা কিছু এনজিও মানবাধিকার সংগঠন কাজ করে, তবে ভিন্ন দর্শনে। সংগঠনগুলোর ধারণা নিরাপত্তা হেফাজতে ভিকটিকমে কারাগারে অন্যান্য- আসামী এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে না রেখে আলাদাভাবে রাখলে ভাল হয়। সেই মর্মে তারা বিকল্প কারাগার তৈরি করে আশ্রয় কেন্দ্র নামে।

তাই সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো ভিকটিমদের সরকারি কারাগার থেকে নিজেদের কারাগারে রাখতে পছন্দ করে। অবশ্য সরকারি কারাগারের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর থাকা এবং খাওয়ার মান তুলনামূলকভাবে ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা হেফাজতে থেকে মুক্তি পাবার পর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক পূর্নবাসনের কর্মসূচী

একজন ভিকটিম নারী নিরাপত্তা হেফাজত থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে পূর্নবাসন করার কোন কর্মসূচী বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারি, বে-সরকারি অথবা এনজিও কর্মকান্ডে বিদ্যমান নেই। শাহানা আকতার (মেয়েটি বোবা) যখন চট্টগ্রাম কারাগারে দীর্ঘ দিন যাবত নিরাপত্তা হেফাজতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কারারুদ্ধ ছিল তখন ঐ আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট করা হয়।

শাহানা আক্তারের বাবা অনেকগুলো বিয়ে করায় মেয়ের প্রতি কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করত না। ফলে পিতা কোন খোঁজ-খবর ও নিতনা। ভিকটিম শাহানার মা জীবিত নেই। তাকে দেখা শোনারও কেউ নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে ভিকটিম মুক্তি পাবার পর কেউ যখন তার দায়িত্ব নেওয়ার নেই তখন তাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে পূর্নবাসন করা প্রয়োজন দেখা দেয় ভিকটিম শাহানাকে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে দেবার। এ ব্যাপারে ভিকটিম এর পূর্ণবাসনের জন্য সরকারি, বে-সরকারি, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা কামনা করা হয়। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এ ব্যাপারে এগিয়ে এসে ভিকটিম শাহানাকে নিজ পায়ে দাঁড়াবার জন্য সহযোগিতা করতে পারেনি। এ বিষয়ে এলএসটিবি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ করেও চূড়ান্ত পর্যায়ে ভিকটিম শাহানাকে পূর্ণবাসন করা যায়নি। অথচ শাহানার সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজন। তাকে মানসিকভাবে সবল করা প্রয়োজন। তার প্রয়োজন নিজ পায়ে

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়াবার। প্রয়োজন একটি চাকরির। যাতে করে সে স্বাবলম্বী হতে পারে। এ ব্যাপারে তার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণে সে ভাল দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রশিক্ষকরা জানিয়েছিল ভিকটিম বোবা হলেও সে ছিল বুদ্ধিমতী। যে কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান সে দ্রুত আয়ত্ত করতে পারতো, অথচ ভিকটিম নিজ পায়ে দাঁড়াবার জন্য, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সরকারী-বেসরকারী বা এনজিও প্রতিষ্ঠানে একটি চাকুরি পেল না। কাজেই এ থেকে উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। নিরাপত্তা হেফাজত থেকে মুক্তি পেলে যার পূর্নবাসনের প্রয়োজন এবং নিজ পায়ে দাঁড়াবার দরকার তাদের জন্য সকল ধরণের ব্যবস্থা রাখা যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে এবং নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে।

বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের কোন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই এ ব্যাপারে বিশেষ করে সরকার এবং এনজিওদের এগিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র আশ্রয় কেন্দ্র খুললে চলবে না বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ালেও চলবে না বা এ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ালেও চলবে না। প্রয়োজন তাদের নিজ পায়ে দাঁড়াতে শেখানো এবং সে ব্যাপারে তাদের অব্যাহত সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা যা তাদের প্রয়োজন মেটাবে।

নিরাপত্তা হেফাজতের নামে পুলিশের স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার

২০০১ সালেও আগের মতোই নারী ও শিশুদের 'নিরাপত্তা হেফাজতে'র নামে গ্রেফতার করে কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলখানায় রাখা অব্যাহত ছিল। আইনে নিরাপত্তা হেফাজতের বা কোন জায়গাটিকে নিরাপত্তা হেফাজত বলা হবে তার কোন

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। তার মানে হচ্ছে, একই জেল হাজতের মধ্যেই এবং সাধারণ কয়েদিদের সাথেই নারী ও শিশুদেরও রাখা হবে। আর পরিতাপের বিষয়টি হচ্ছে জেল বা হাজতের ভেতরে সাধারণ হাজতি কয়েদিরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পায়, সেগুলো থেকেও নিরাপত্তা হেফাজতের নামে রাখা নারী শিশুদের বঞ্চিত করা হয়।

নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা নারী ও শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন

৫ জানুয়ারি, দৈনিক সংবাদ রিপোর্ট করে, ভারতে পাচার হওয়ার পথে ১৯৯৮ সালের ২১ মার্চ যশোর জেলা পুলিশ ২৭ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে গ্রেফতার করে এবং তাদের 'নিরাপত্তা হেফাজতে' প্রেরণ করে। পরিশেষে ২০০১ সালে 'সারভাইভার' এবং 'হিউম্যান রাইটস' নামের দুটি মানবাধিকার সংগঠনের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে তারা তিন বছর জেলে থাকার পর মুক্তি পায়।

দি ডেইলি স্টার, ২৮ এপ্রিল জানায় ২০০০ সালের ২৭ মে নারায়নগঞ্জ বন্দর পুলিশ, থানার পার্শ্ববর্তী এক এলাকার রাস্তা থেকে সাত বছর বয়সী একটি বোবা মেয়েকে তার সন্দেহজনক ঘোরাফেরা'র জন্য গ্রেফতার করে এবং হাজতে পুরে রাখে। মেয়েটিকে পরদিন আদালতে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট তার বাবা-মা অথবা পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে মেয়েটিকে তাদের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের হদিস না পাওয়া পর্যন্ত মেয়েটিকে নারায়নগঞ্জ জেলের 'নিরাপত্তা হেফাজতে' রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। এরও এক বছর পর মেয়েটিকে ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউকে মেয়েটিকে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পাধীন একটি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এভাবেই শেষ হয় অসহায় মেয়েটির 'নিরাপত্তা হেফাজতে'র নামে দূর্বিষহ কারাবন্দি জীবনের অধ্যায়।

২০০১ সালের ১১ অক্টোবর, দৈনিক ইত্তেফাক জানায়, ময়মনসিংহে দুই কিশোরী, 'নিরাপত্তা হেফাজতে' অবস্থান করছিল। প্রথম ঘটনায় প্রকাশ, সুমাইয়া খাতুন নাম্মী এক কিশোরী ২৩ এপ্রিল, ২০০১ তারিখে কয়েকজন মাস্তান কর্তৃক অপহৃত হয়। পরে স্থানীয় জনতা তাকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দিলে সোনাতলা থানা পুলিশ এসে তাকে 'নিরাপত্তা হেফাজতে' নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন তাকে জেলেই রাখা হয় এবং পরে ময়মনসিংহ থেকে বগুড়া জেলে স্থানান্তর করা হয়। বছরের শেষ দিন পর্যন্ত মেয়েটি জেলেই ছিল। ইত্তেফাকে বর্ণিত অপর ঘটনায় প্রকাশ, সুমী খান নামে আট বছর বয়সী এক মেয়ে তার মায়ের কাছ থেকে হারিয়ে যায় এবং কিছু সন্ত্রাসী তাকে ধরে একটি ট্রেনে তুলে নিয়ে যায়। বহু কষ্টে সে পালাতে সক্ষম হয়। সোনাতলা পুলিশ স্টেশনে এসে সে পুলিশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে পুলিশ তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠায়।

বাংলা বাজার পত্রিকায় ১৩ জানুয়ারি, ২০০১ প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ৯ জন মহিলা তাদের শিশুসহ ভারতে পাচার হওয়ার প্রাক্কালে খুলনা জেলা পুলিশের মাধ্যমে উদ্ধার হয়। আদালতে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে খুলনা জেলা কারাগারের 'নিরাপত্তা হেফাজতে' পাঠায়। ৯ মাস পরও তারা জেলরূপী 'নিরাপত্তা হেফাজত' থেকে মুক্তি পেয়েছে এমন কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখের জনকণ্ঠ রিপোর্ট করে, কক্সবাজার পুলিশ ৩৩ জন মহিলাকে গ্রেফতার করে এবং 'নিরাপত্তা হেফাজতের' নাম করে কারাগারে পাঠায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এই তেত্রিশ জন মহিলাকেই একটি ঘরে রাখা হয়,

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে মাত্র দুজনের স্থান সংকুলান হওয়ার কথা। তাদের প্রত্যেকেরই দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব ছিল না। খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানো কীভাবে হয়েছিল তা একমাত্র তারাই বলতে পারবে। বছরের শেষ অবধি তারা জেলের মধ্যেই অবস্থান করছিল।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে দেখা যায়, বছরের (২০০১) প্রথম ছয় মাসে মোট ২৫৮ জন নারী এবং ৯৭ জন শিশু বিভিন্ন জেলখানায় / হাজতে তথাকথিত নিরাপত্তা হেফাজতের নামে আটক ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিগত বছরে গ্রেফতার হয়ে ২০০১ সালের জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত বন্দি অবস্থায় দিনযাপন করেন। 'নিরাপত্তা হেফাজতে' এই সব নারী শিশুদের সাধারণ অপরাধীদের সাথে একই বাথরুম ব্যবহার করতে এমনকি একই বিছানায় ঘুমাতে পর্যন্ত দেয়া হতো।

গ্রেফতারকৃত নারী ও শিশুদের বেশির ভাগই হয় দরিদ্র পরিবারের অথবা পরিবারহীন কিংবা ভবঘুরে হওয়াতে তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। অনেককে বিনাবিচারে দীর্ঘদিন কারাগারেই নিমর্ম জীবন যাপন করতে হয়। এ বছর (২০০১সাল) কারা অভ্যন্তরে ধর্ষণের কোন রিপোর্ট পত্রিকায় আসেনি। তবে সারা বছরজুড়ে দেশের বিভিন্ন জেলে নারী ও শিশুদের দুর্বিষহ জীবনের কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পুলিশে সংস্কার (প্রস্তাবিত আইন)

খসড়া পুলিশ আইন

পুলিশের জবাবদিহিতা ও সেবার মান বৃদ্ধি করতে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের পরিবর্তে নতুন পুলিশ আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে এবং সরকারের ওয়েব

Dhaka University Institutional Repository

সাইটে দেয়া হয়েছে জনসাধারণের মন্তব্যের জন্য যা নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

খসড়া অধ্যাদেশটির দ্বিতীয় অংশে সাধারণ জনগণের প্রতি পুলিশের কর্তব্য, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নশীল হওয়া, কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত না হয় এবং নিরাপত্তার বোধ যেন মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে কাজ করে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। খসড়া আইনে ধর্মের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার রক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের অধীনে অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত করার জন্য একটি বডি বা কমিটি গঠিত হবে। পুলিশের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এই খসড়া আইনে কিছু নেই। যারা প্রস্তাবিত আইনটির ওপর মন্তব্য করেছেন তারা পুলিশ প্রশাসনে ওপর থেকে নিচে কর্তৃত্বের স্তরবিন্যাস এবং সদর দপ্তরের বাইরে যেসব পুলিশ সদস্য কাজ করেন তাদের ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিবরন থাকা আবশ্যিক বলে মনে করেন। এই খসড়ার ওপর বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের মতামত সংগ্রহ এবং সেগুলোকে পুলিশ প্রশাসনের সংস্কারে কাজে লাগানো এখনো বাকি। পুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক ক্ষমতা কার হাতে যাবে এ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধের ফলে খসড়াটি প্রণয়ন দীর্ঘ বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ত খসড়া অধ্যাদেশটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সরকারি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন পাস হচ্ছে না পুলিশ অধ্যাদেশ

প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশটি কেন পাস করা হচ্ছে না, তার কারণ কেউ জানেন না। অদৃশ্য কোনো শক্তি এই অধ্যাদেশকে আটকে রেখেছে বলে মনে করছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। তাদের অভিযোগ, অদৃশ্য সেই শক্তিহলো প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা। তাদের বিরোধীতার কারণেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ। নতুন এই অধ্যাদেশ চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে পুলিশ প্রশাসনের ওপর রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের আর কোনো প্রভাব থাকবে না। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে পুলিশ।

বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৭০ হাজার মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ নিয়ে। সবাই মত দিয়েছেন পুলিশ অধ্যাদেশ পাস করার পক্ষে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কোনো অধ্যাদেশই জনমত যাচাই করে হয়নি। পুলিশ অধ্যাদেশ পাস না করতেই কালক্ষেপণের জন্য জনমত' যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছিল। আমরা সে কাজটিও করে দিয়েছি। সারাদেশের চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় রাজনীতিকসহ সাধারণ নাগরিকদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে। সবাই পুলিশকে স্বাধীন করার পক্ষে মত দিয়েছেন"। এরপরও আটকে রাখা হয়েছে এই অধ্যাদেশ। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আসল উদ্দেশ্য এবার পরিষ্কার হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ওই কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ প্রস্তুত কমিটির সভাপতি সাবেক আইজিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান, দৈনিক সমকালকে বলেন, আগে পুলিশের কাজ ছিল জনগণকে শাসন করা। আমরা যে নতুন অধ্যাদেশটি প্রস্তুত করেছি তাতে পুলিশকে জনগণের সেবক করা হয়েছে। আইনের

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল বিরোধী অভিযানে গর্ভবতী মহিলাকে (শান্তাকে) পুলিশের বেধড়ক মারধর

সম্প্রতি হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বারবার রাজপথে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের নৃশংসভাবে দমন করতে গিয়ে পুলিশ নারী কর্মীদের ওপর নির্মম পীড়ন ও শ্লীলতাহানির মতো ভয়াবহ অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে।

২০০৬ সালের ১৪ মার্চ রাজপথে হরতাল বিরোধী অভিযানে পুলিশ একজন গর্ভবতী মহিলাকে যেভাবে বেধড়ক মারধর করে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে, তা দেশের বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোর সচিত্র রিপোর্ট দেখে এবং সংবাদপত্রে পড়ে মানুষ শিউরে উঠেছে। অজান্তেই মন দ্রোহ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে- এ কোন বর্বর রাষ্ট্র ? সত্যি কি এখানে গণতন্ত্র আছে ? আছে সভ্যতা বলে কিছু ? থাকলে এ ধরণের ঘটনা ঘটার পরতো পুলিশ আর সরকারের ভেতরে ও তোলপাড় হয়ে যাবার কথা। কারণ এ নির্যাতন গোপন কোন বিষয় ছিল না। প্রকাশ্য সে নির্যাতনের চিত্র পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও টিভি নিউজে বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু না, কোন রকম তোলপাড় হয়নি পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে বা সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে। নির্যাতনে অংশগ্রহণকারী পুলিশদের কোন রকম কৈফিয়তও তলব করা হয়নি। নারকীয় সেই পুলিশী নির্যাতনের নির্মম বিবরণ দিয়ে গৃহবধু শাহীন সুলতানা (শান্তা) আদালতে মামলা করেছেন। সর্বাঙ্গে পুলিশের নৃশংস নির্যাতনের সেই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ঢাকার সি এম এম কোর্টে হাজির হয়ে পুলিশের দুই উপ-কমিশনারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। কিন্তু সেই নালিশী মামলার

Dhaka University Institutional Repository

ঝালমুড়ি

চোখে-মুখে-নাকে শুকনো মরিচ বেটে দেয়ার নাম হচ্ছে ঝাল মুড়ি। আসামির দুই চোখ, নাক ও মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় বাটা শুকনো মরিচ।

টানা

লম্বা করে ঝুলিয়ে পায়ের পাতা সহ বিভিন্ন স্থানে পেটানোর নাম টানা।

বাতাস

সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে নির্যাতন করার নাম হচ্ছে বাতাস পদ্ধতি। নানা পদ্ধতি থাকলেও পুলিশ ওয়াটার থেরাপি, বোতল থেরাপি এবং ডিস্কো ড্যান্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে বেশি। কারণ এই পদ্ধতিগুলো খুবই নৃশংস নির্যাতনের পদ্ধতি হলেও এতে কোনো চিহ্ন থাকে না। আদালত অথবা অন্য কোন সমস্যা হলে চিহ্ন না থাকায় পুলিশ সহজেই পার পেয়ে যায়।

রিমান্ডে নেয়া আসামিদের মামলার অপরাধ বুঝে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ডাকাতি, ছিনতাই বা হত্যা মামলার আসামিদের বেলায় কঠিন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পুলিশ। সাধারন আসামিদের ক্ষেত্রে হালকা পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তবে আসামি যদি প্রভাবশালী অথবা অর্থশালী হয় তাহলে রিমান্ডের ভাষাও বদলে যায়।

বিত্তশালী কোনো আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে পুলিশের 'ডিমান্ড' পূরণ হলে ওই আসামি পায় জামাই আদর। তখন আর নির্যাতন নয়, থানার ওসির রুমে বিছানা বালিশ দিয়ে আসামিকে জামাই আদরে রাখা হয়। খাবার দেয়া হয় তার পছন্দমত। তবে রিমান্ডে এমন জামাই আদরের সৌভাগ্য খুব কম আসামিরই হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ হেফাজত বা পুলিশ রিমান্ড নিয়ে আলোচিত অভিযোগগুলো

রিমান্ড মানেই কি নির্যাতন ? জিজ্ঞাসাবাদের নামে অভিযুক্ত কাউকে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে বর্বর পন্থায় স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা ? প্রশ্নগুলো অনেক দিন থেকেই উচ্চারিত হয়ে আসছে এবং বিগত কয়েক বছরে আরো জোরালো হয়ে উঠেছে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও শিক্ষকের ওপর রিমান্ডে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে। আগে এ অভিযোগ কেবল পুলিশের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এর সীমানা বেড়েছে। পুলিশ আদালত থেকে কোনো আসামিকে রিমান্ডে আনলে সে আসামি পুলিশের হেফাজতে থাকছে না। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ বা নির্যাতন করছে অন্য কোনো সংস্থা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিষয়টি আলোচিত।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়ার্চ' সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং তা বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়। ভুক্তভোগী বিশিষ্টজনদের মধ্যে রিমান্ড বিষয়ে সাম্প্রতিক আলোচিত অভিযোগটি হচ্ছে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের। তিনি তার কারগারে বসে লেখা বই 'লাইফ ইন প্রিজন'-এ বর্ণনা দিয়েছেন সে নির্যাতনের। এছাড়া উচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, শুধু আমাকে নয় বিএনপির নেতাদের নয়, আওয়ামীলীগের অনেক প্রবীণ নেতাকেও নির্যাতন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

২০০৮ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ঘোষণা করেন। সরকারের এ ঘোষণাকে সাধারণভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতিবাচক সাড়া জাগায়। নারীর সম অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে '৯৭ সালে ঘোষিত প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকার ২০০৪ সালে 'গোপনে' নতুন একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার, সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্ব, জমি, উত্তরাধিকার, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ- এই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে নারীর সমান অধিকার ও অংশগ্রহণের বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে নারীর সমান অধিকার ও অংশগ্রহণের বিষয়কে সঙ্কোচিত করে আনা হয় ২০০৪ সালের নীতিতে।

২০০৮ সালে ঘোষিত নীতিমালা কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ১৯৯৭-এ গৃহীত নীতিমালার অনুরূপ। নতুন সংযোজন হিসেবে এসেছে ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিদেশে শ্রমবাজারে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি, জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া এই বিষয়গুলো। ১৯৯৭-এর নীতিতে উত্তরাধিকার এবং জমির ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিষয়গুলো উল্লেখ থাকলেও ২০০৮ সালের ঘোষিত নীতিমালা থেকে এ বিষয় দুটি বাদ দেয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়গুলো নীতিমালা থেকে বাদ দেয়ায় নারী অধিকার আন্দোলন কর্মীরা এর তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ জানায়। এর ঠিক বিপরীত অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ইসলামি দলগুলোও নীতিমালার বিরোধিতায় রাস্তায় নামে। ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮-কে তারা 'ইসলাম বিরোধী' আখ্যা দিয়ে এবং উত্তরাধিকার আইনে নারী পুরুষের সমান অংশীদারিত্বের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত না করার জন্য দাবি জানায়। এ প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ সরকারের আইন উপদেষ্টা ঘোষণা করেন যে, 'ইসলাম বিরোধী' আইন পাসের কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই। ২৭ মার্চ ২০০৮ নীতিমালায় 'ইসলামি আইন বিরোধী কিছু আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে এবং এরকম কিছু থাকলে তা নীতিমালা থেকে বাদ দিতে নজিরবিহীনভাবে সরকার ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে। কমিটি যখন তার পর্যালোচনার কাজ শুরু করেছে, তখন নারীনীতি বিরোধীরা মসজিদে সমবেত হয়ে রাজপথে সহিংস প্রতিবাদ চালায়। ১১ এপ্রিল শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে তারা ঢাকার বায়তুল মোকাররম এলাকায় ইট পাটকেল ছোঁড়াসহ লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও তারা এসব সহিংস কর্মকান্ড চালায়। অপরদিকে এর কিছুদিন আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করতে গেলে সম্পূর্ণরূপে তা দমন করা হয়। ১৭ এপ্রিল,২০০৮ গঠিত পর্যালোচনা কমিটি ঘোষিত নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা পরিবর্তন করে তার স্থলে নারীর জন্য 'ন্যায্য অধিকার' কথাটি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করে। নারী উন্নয়ন নীতিতে মৌলবাদী কয়েকটি ইসলামি দলের বিরোধিতার প্রেক্ষিতে সরকার যে অবস্থান নেয়, তা নিঃসন্দেহে নারীর অগ্রযাত্রার জন্য বিপজ্জনক। ইসলামি দলের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সরকারের আইন উপদেষ্টার 'উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো আইন সংশোধন করার মানসিকতা সরকারের নেই'- এ ধরনের ঘোষণা এবং

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে অন্তর্ভূক্ত না করে ঘোষিত নীতি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করাসহ নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে সরকারের এ ধরণের ভূমিকা পরে মারাত্মক বিতর্কের জন্ম দেয়।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান বাংলাদেশ সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ - এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

- বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলা।
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।

Dhaka University Institutional Repository

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।
- নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।
- নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারীপুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ - গোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
- বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের নানাবিধ সমস্যা

আবাসন

ডিএমপির বর্তমান জনবল ২৪ হাজার ৪০৮। ডিএমপি বিধিমালা অনুযায়ী কমিশনার থেকে এএসআই পর্যন্ত ১০০ ভাগ আবাসন সুবিধা পাওয়ার কথা। হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবল ৬০ শতাংশ এবং মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ১০০ ভাগ আবাসন সুবিধা পাবেন। কিন্তু সংকটের কারণে মোট জনবলের মাত্র ৩ শতাংশ আবাসন সুবিধা ভোগ করছেন। পুলিশ কমিশনারের জন্য একটি বাসা বরাদ্দ থাকলেও ৩ জন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ৫ জন জয়েন্ট কমিশনার, ২৫ জন উপ-পুলিশ কমিশনারের জন্য কোনো আবাসন সুবিধা নেই। ২২৪জন এডিসি ও এসির জন্য বাসা রয়েছে ৪৯টি, ৩৪৩ জন পুলিশ পরিদর্শকের জন্য ৮টি, ২ হাজার ২৬২ জন এস আইর জন্য ১৯৯টি, ১ হাজার ৩৫০ জন এ এস আইর জন্য ৭৩টি বাসা রয়েছে। এক হাজার ২১৮ জন হেড কনস্টেবলের থাকার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। ১৮ হাজার ১৬৮জন কনস্টেবলের জন্য মাত্র ২৬১টি বাসা রয়েছে। এদিকে ডিএমপির ২৯০ জন মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফের জন্য ১০টি, ৫১৯ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য ৩৬টি বাসা রয়েছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ৬ হাজারের বেশি সদস্য থাকেন। পুলিশ লাইনের ব্যারাকগুলোর প্রতিটি তলা ৬০-৬৫ জন বসবাসের উপযোগী হলেও বসবাস করছেন ১৫০ থেকে ১৬০ জন।

তবে পুলিশ সদস্যদের আবাসন সংকট শিগগিরই দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের আবাসন সংকট নিরসনে সায়েদাবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

মিরপুর পুলিশ কমপ্লেক্স ও নিউমার্কেট থানা কমপ্লেক্স এসআইদের জন্য ২০ তলা ৩টি, এএসআইদের জন্য সায়েদাবাদে ১৫ তলা একটি এবং মিরপুর পুলিশ কমপ্লেক্সে ২০ তলা একটি ভবন নির্মান হচ্ছে। এছাড়া মিরপুর পুলিশ কমপ্লেক্সে হেড কনস্টেবলদের জন্য ২০ তলা একটি ভবন নির্মানাধীন।

ডিএমপির যানবাহন ও আবাসন সংকট

যানবাহন

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে (ডিএমপি) যানবাহন ও আবাসন সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। সারাদিন লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ি নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন তারা। রাজধানীর প্রতিটি থানায় ৭ থেকে ৮ টি গাড়ির প্রয়োজন হলেও এখন রয়েছে গড়ে দুটি বা তিনটি গাড়ি। ওইসব গাড়ির একটি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ব্যবহার করেন। আবার অনেক থানায় ওসির গাড়ি নিয়েই পুলিশ সদস্যরা টহলে যান। তাই গাড়ি সংকট নিরসনে পুলিশকে প্রতিদিন গড়ে ২০ গাড়ি রিকুইজিশেন করতে যাচ্ছে। ডিএমপি সদর দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা জানান, যানবাহন চেয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে একাধিক প্রস্তাবনা পাঠানো হলেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

ডিএমপির ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট শাখার তথ্য অনুযায়ী নগরীর ৪০ থানা, ডিবি, ডিএমপি সদর দপ্তর ও ট্রাফিক বিভাগের জন্য ১ (এক) হাজার ৬১২টি গাড়ির প্রয়োজন। কিন্তু গাড়ি রয়েছে মাত্র ৬১২টি। এর ২৮টি আবার ভিআইপিদের নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হয়। থানাগুলোর জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১৩১টি গাড়ি। কিন্তু থানার ওসিরা বলছেন, ওইসব গাড়ির অধিকাংশের অবস্থা লক্কড় ঝক্কড়। ওই

Dhaka University Institutional Repository

গাড়িগুলো হঠাৎ রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায়। আসামি ধরা বাদ দিয়ে রাস্তায় গাড়ি ধাক্কা দিতে হয়। আর নষ্ট গাড়ি বারবার মেরামত করে চালাতে গিয়ে গুনতে হয় বাড়তি টাকা। ডিএমপি ডিসি (সদর দপ্তর) হাবিবুর রহমান বলেন, ডিএমপির ৬শ গাড়ির মধ্যে ৩শ ব্যবহারের একেবারে অনুপযোগী।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে মেরামত কারখানায় প্রতিদিন ৪-৫টি নষ্ট গাড়ি পড়ে থাকে। ডিএমপি পুলিশের একটি সূত্র জানায়, ডিএমপির চাহিদাপত্রে ২৩৮টি জিপ, ১ হাজার ২২০টি পিকআপ ও ১৫৮টি কার চাওয়া হয়েছে। সর্বশেষ পাঠানো প্রস্তাবে ২টি হেলিকপ্টারের কথাও বলা হয়েছে। ডিএমপি ডিসি (পরিবহন) মোসলেহ উদ্দিন আহমদ যানবাহন সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, সম্প্রতি ৭টি পিক আপ ভ্যান, ২টি মাইক্রোবাস, ৪টি জলকামান, একটি রেকার ও ৫টি জিপ পাওয়া গেছে। তবে এ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

ভাড়া বাড়িতে ঝুঁকি নিয়ে চলছে ১৩ থানা

ভাড়া বাড়িতে চলছে রাজধানীর ১৩ থানার কার্যক্রম। এছাড়া আরও ছয়টি থানার নিজস্ব ভবন নেই। এর মধ্যে তিনটি থানা করা হয়েছে পরিত্যক্ত বাড়িতে। আর অন্য তিনটি থানা চলছে সরকারি জমিতে অস্থায়ী ঘর তুলে। এসব থানায় পুলিশী সহায়তা নিতে গিয়ে মানুষকে যেমন দূর্ভোর্গ পোহাতে হচ্ছে, তেমনি সেবা দিতে গিয়ে পুলিশ সদস্যরাও পড়ছেন বিপাকে। ওইসব থানার পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, তারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাজধানীর ৪০টির মধ্যে কামরাঙ্গীরচর, আদাবর, শাহআলী, পল্লবী, কাফরুল, হাজারীবাগ, দক্ষিণখান, উত্তরখান, দারুস সালাম, কদমতলী, রামপুরা, বংশাল ও

Dhaka University Institutional Repository

কলাবাগান থানার নিজস্ব ভবন নেই। পরিত্যক্ত বাড়িতে চলছে ধানমন্ডি, গুলশান ও মতিঝিল থানার কার্যক্রম। আর সরকারি জমিতে অস্থায়ী ঘর তুলে চলছে ডেমরা, বিমানবন্দর ও শেরেবাংলা নগর থানার কার্যক্রম। এসব থানার কর্মকর্তারা বলেছেন, নিজস্ব ভবন না থাকায় তারা অনেক সমস্যার মধ্যে প্রতিদিনের কাজ চালাচ্ছেন। থানা ভবনের নিচ এবং উপরতলায় অন্য প্রতিষ্ঠান থাকায় সেখানে সারাদিন চলে মানুষের অবাধ যাতায়াত। এরই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে থানা হাজতে রাখতে হচ্ছে গ্রেফতার হওয়া দাগি সন্ত্রাসী ও আসামিদের।

বংশাল থানা স্থাপন করা হয়েছে ফজলুর করিম কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলায়। ভবনটির নিচ তলায় স্টিলের আসবাবপত্রের দোকান এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় চলছে কমিউনিটি সেন্টারের কার্যক্রম। এ থানায় সেবা নিতে যাওয়া সাধারণ মানুষের বসার কোনো জায়গা নেই। এমনকি পুলিশ কর্মকর্তাদের টেবিলও গাদাগাদি করে বসানো। থানার অপারেশন্স অফিসার গৌতম রায় সমকালকে বলেন, "এখানে অনেক সমস্যা। থানার ৭০ জন পুলিশ সদসের জন্য কোনো ব্যারাক বা বিশ্রামের জায়গা নেই। নিচ তলায় দোকান থাকায় হাজতখানাও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা না থাকায় ব্যস্ত রাস্তায় সব গাড়ি রাখতে হয়। তিনি বলেন, 'কমিউনিটি সেন্টারে কোনো অনুষ্ঠান থাকলে হৈ-হুল্লোড়ের কারণে থানায় টেকা যায় না। এ সময় সিড়ি দিয়ে অনেক লোকজনের যাতায়াতের কারণে থানার নিরাপত্তাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। শুধু থানা নয়, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে রাজধানীর ৫২টি পুলিশ ফাঁড়ির ১১টির কাজ চলে ভাড়া বাড়িতে এবং পরিত্যক্ত বাড়িতে চলছে ২৭টি (সাতাশ) ফাঁড়ির কার্যক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে ডিএমপি কমিশনার একে এম শহীদুল হক বলেন, ‘পরিত্যক্ত ও ভাড়া করা যেসব বাড়িতে থানা করা হয়েছে, ওই ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া থানার জন্য নিজস্ব ভবন দরকার এবং এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে শুধু আশ্বাসই পাওয়া যাচ্ছে।

পুলিশ কী খায় ?

কী খায় পুলিশ ? প্রশ্নটি করা হলে যে কেউ মজা করে উত্তর দেবেন- যা পায়, তাই খায়, অথবা অবৈধ কিছু। আসলে কী খান আমাদের সেবাদানকারী ব্যারাকের পুলিশ। পরিবারহীন তাদের জীবন যাত্রায় তাদের খাওয়া দাওয়া কেমন ? যে পরিমাণ পরিশ্রম তারা করেন তার বিপরীতে সেই পরিমাণ খাবার কি তারা পান ? প্রতিদিন তারা প্রায় ধরাবাঁধা খাবার খান। সে খাবারে সন্তুষ্ট নন কোনও পুলিশ সদস্য। তারা চান খাবারের মান ভালো হোক। একই সঙ্গে পুষ্টির ব্যাপারটিও যেন দেখা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কিছু সদস্য জানান, “ভাইরে আমরা আসলে বেঁচে থাকার জন্য খাই। পরিশ্রমের তুলনায় খাবারের মান ভালো নয়। তিন দিন মাংস দিলেও সে মাংসের টুকরা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সেই টুকরার সাইজও ছোট, আবার ২টা। মাছের তরকারির অবস্থাও ভীষণ বাজে। মাছের সাইজ দেখে বোঝা যায় না ছোট মাছ নাকি বড় মাছ। প্রায় দিনই দেওয়া হয় তেলাপিয়া না হয় রুই মাছ। রান্নার আগে এসব মাছ ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না। দুপুরের খাবার আর বাইরে সেই খাবারগুলো খাওয়া শুরু হয় ১১টার পর থেকেই। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালনরত পুলিশ সদস্যরা সে খাবারগুলো খান। পুলিশ ভ্যান এবং কিশোররা সেই খাবারগুলোর বাহক। পুলিশ খাওয়ার পর যেগুলো

Dhaka University Institutional Repository

বাড়তি থাকে সেগুলো বিক্রি করা হয়। রাজধানীর রিকশাওয়ালারাই মূলত এর ক্রেতা। এ ছাড়া কিছু ছিন্নমূল মানুষও অল্প দামের এই খাবার খায়। বিক্রি করে কিছু কিশোর। এরা কেউ থাকে মিরপুর পুলিশ ফাঁড়িতে। যারা মাছ দিয়ে খাচ্ছেন তাদের প্লেট ১৫ টাকা। আর যারা শুধু ডাল দিয়ে খাচ্ছেন সেই প্লেট ১০ টাকা। এভাবেই চলে পুলিশের খাবার বেচাকেনা।

পুলিশের ত্যাগও অনেক

২০০৯ এর ১৮ ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জের ভৈরবে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমানকে হত্যা করে। এ ঘটনায় আরও চার পুলিশ সদস্য আহত হন। তারা হলেন এসআই মিজানুর রহমান, হাবিলদার রুহুল আমিন, কনস্টেবল আবদুল্লাহ আল মামুন ও সিয়াম হোসেন। ওইদিন সন্ধ্যায় হাবিলদার রুহুল আমিন ও কনস্টেবল আল আমিন সাদা পোশাকে হাঁটতে বের হন। ভৈরবপুর মনামারা সেতু এলাকায় সন্ত্রাসী মামুন তাদের ছুরিকাঘাত করে। সহকর্মীদের আহত হওয়ার খবর শুনে এসআই মোস্তাফিজুর রহমান, মিজান ও কনস্টেবল সায়েম সন্ত্রাসী মামুনকে গ্রেফতার করতে অভিযানে বের হন। তারা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সিরাজনগরে মামুনকে পেয়ে জাপটে ধরেন। মামুন কোমর থেকে ছুরি বের এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে। তার সঙ্গে আরও সন্ত্রাসী যোগ দেয়। খবর পেয়ে ভৈরব থানা পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে এসআই মোস্তাফিজ মারা যান।

এ ঘটনার কিছুদিন আগে ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারী রাত ৮টার দিকে রাজধানীর দক্ষিণখানের আশকোণায় টহল দিচ্ছিল পুলিশের একটি দল। হঠাৎ

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে শুরু হয় গোলাগুলি। টহল দলটি এগিয়ে যায় ঘটনাস্থলের দিকে। পুলিশের ওই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন দক্ষিণখান থানার এস আই হারুন-অর-রশিদ। সামনে এগোতেই একটি গুলি তার বাঁ হাতে লাগে। পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি আসে তার দিকে। সরে গিয়ে প্রাণে বাঁচেন তিনি। পরে জানা যায় চাঁদার দাবিতে এক বাড়িওয়ালার লোকজনকে গুলি করে পালিয়ে যাচ্ছিল সন্ত্রাসীরা। এস আই হারুন-অর-রশিদ বলেন, ২৭ বছরের চাকরি জীবনে অনেক ঝুঁকির মধ্যে কাজ করেছি। ওই দিনটি ছিল একেবারেই ব্যতিক্রম। মরতে মরতে বেঁচে গেছি। বৃদ্ধাঙ্গুলের ওপর দিয়ে গেছে। অনেক সময় অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে পারেন না।

রাজধানীর শ্যামলীতে ২০০৯ সালের ১৯ মে বাস চাপায় ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট আবদুল বাছেদ তালুকদার নিহত হন।

২০০৭ সালে ২৭ অক্টোবর রাজধানীর কাঁটাবন এলাকায় পুলিশ কনস্টেবল জামাল উদ্দিন ছিনতাইকারীর গাড়িচাপায় গুরুতর আহত হন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ২০০৮ সালের ২৬ জুলাই তিনি মারা যান। জামালের বড় ছেলে কাওসার আহমেদ বলেন, “পেশার জন্য আমার বাবা প্রাণ হারিয়েছেন। তার মৃত্যুর পর পাঁচ ভাইবোনের সংসার নিয়ে বড় কষ্টে দিন পার করছি”।

এভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেক পুলিশ সদস্য। সন্ত্রাসীদের হামলায় কেউবা পঙ্গু হয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ সালে দায়িত্ব পালনকালে সারাদেশে ২৭ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ছয় সদস্য। ওই সময় ডিএমপির ২৪ সদস্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গুরুতর আহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের এআইজি (কল্যাণ, পেনশন ও ক্রীড়া) হাসানুল হায়দার বলেন, "পুলিশ সদস্যরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাদের ঝুঁকি ভাতা খুবই সামান্য। দায়িত্বপালন করতে গিয়ে যারা মারা যান, নিয়ম অনুযায়ী তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। কিন্তু এটিই যথেষ্ট নয়। কারণ যারা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন দেন, তাদের ওই ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণ হওয়ার নয়"।

নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

এক সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মহিলাদের সার্বিক কর্মকান্ড পরিবারের মধ্যেই সীমিত ছিল। শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করে মহিলাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের অযোগ্য ও নেতৃত্ব প্রদানে অপারগ বলা হতো। কেবল সন্তান ধারণ, জন্মদান ও লালন-পালনই ছিল সনাতন সমাজে নারীর উপযুক্ত কাজ। ফলশ্রুতিতে, প্রথাগত ভূমিকার গন্ডী পেরোনো তাদের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু জৈবিক পার্থক্যের বিচারে পুরুষের চেয়ে মহিলারা দৈহিক শক্তিতে দূর্বল হলেও গর্ভধারণ, জন্মদান আর সন্তান লালন-পালনের বাইরে সুযোগ পেলে তারাও যে পুরুষের সমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশী দক্ষ ও যোগ্য হতে পারে, তা যেন আজ বিশ্বব্যপী নারীর অগ্রযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপেই সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জনের সাথে সাথে পারিবারিক শাসন ও গোড়া সামাজিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করে ঘর-গেরস্থালীর সীমানা পার হতে শুরু করে এদেশের নারীসমাজ। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নারীরা সমাজের সকলস্তরে তথা প্রশাসন-ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষাক্ষেত্র, রাজনীতি ও চ্যালেঞ্জিং পেশা সামরিক বাহিনীতে নিজেদের পারদর্শিতা ও যোগ্যতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ রাখছে। পাশাপাশি সরকারী-বেসরকারী বিবিধ পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ও সাফল্যগাঁথা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আজ বহির্বিশ্বেও সমাদৃত ও প্রশংসিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বর্তমান সরকারের আগমনের পর নারীসমাজের এই অগ্রযাত্রায় নিঃসন্দেহে সংযোজিত হয়েছে গতিময়তা। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, সংসদ উপনেতা, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদ নারী নেতৃত্বাধীন, এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সত্যিই বিরল। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য যেখানে মাত্র ১৫টি আসন সংরক্ষিত ছিল, সেখানে বর্তমানে এতগুলো নীতি নির্ধারণী পদে মহিলাদের অবস্থান নিঃসন্দেহে এ দেশের নারী সমাজের অগ্রগামীতারই চিত্র।

১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম মহিলারা এদেশের পুলিশ বাহিনীতে এবং ২০০০ সালে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করেন। এদেশের নারীসমাজের অগ্রগণ্যতার সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি ঘটেছে এবছর ২০১১, মে মাসে হাইতিতে পরিচালিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে মহিলা পুলিশের একটি পূর্ণাঙ্গ কন্টিনজেন্ট প্রেরণের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের ফর্মড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) হিসেবে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ পুলিশের একটি সুসজ্জিত পূর্ণাঙ্গ মহিলা ইউনিট প্রেরণের ঘটনা নিঃসন্দেহে বিশ্ব দরবারে এদেশের নারী জাগরণের প্রতিচ্ছবিটি উপস্থাপন করবে। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে এবং মহিলা পুলিশ প্রেরণকারী মুসলিম দেশ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে সেনাবাহিনীর ২০ জন, নৌবাহিনীর ০১ জন, বিমানবাহিনীর ০৪ জন এবং পুলিশ বাহিনীর ২৬ জনসহ সর্বমোট ৫১ জন মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য কর্মরত আছেন। তাছাড়া এ অবধি সেনাবাহিনীর ৩৫ জন, বিমানবাহিনীর ০৩ জন এবং পুলিশ বাহিনীর ৬০ জনসহ সর্বমোট ৯৮ জন মহিলা সদস্য মিশন সম্পন্ন করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যমতে বর্তমানে জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত এবং মিশন সম্পন্নকারী মহিলা সদস্যের সর্বমোট সংখ্যা ১৪৯ জন যার মধ্যে সেনাবাহিনীর ৫৫ জন, নৌবাহিনীর ০১ জন, বিমানবাহিনীর ০৭ জন এবং পুলিশ বাহিনীর ৮৬ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। সুনামের সঙ্গে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করায় জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের নারীরা এক অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

সূত্র: প্রথম আলো,২১ নভেম্বর ২০১১

নিরাপদ হেফাজত ব্যবস্থা

নিরাপদ হেফাজতে রাখা নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধনে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। নারী ও শিশুদেরকে নিরাপদ হেফাজতের জন্য জেলখানায় রাখা হবে না- এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দেয় ঢাকার জেলা প্রশাসককে এবং মুখ্য মহানগর হাকিমকে (সিএমএম)। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে ঢাকার লালমাটিয়ায় একটি সেফ কাস্টডি হোম নির্মাণ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ২৯ জন নারী বন্দিকে সেখানে স্থানান্তর করা হয়। ৩০ এপ্রিল, ২০০২ চট্টগ্রামে আর একটি কাস্টডি হোমের যাত্রা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতন দমন আদালত

২৪ ফেব্রুয়ারী,২০০৮ দেয়া হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সরকার অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এই তিন জেলায় আলাদা আলাদা জেলা আদালতের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করে, যা খুবই ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দেশের সব নাগরিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করলে কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপন করে। এ নির্দেশের বাস্তবায়ন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগকে বিস্তৃত করবে।

রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ-প্রার্থী মনোনয়ন

২০০৮ নির্বাচনের বছর হওয়ায় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখার একটি ভালো সুযোগ এনে দেয় বছরটি। কাঠামোগত বাধা, নারীর প্রতি সহিংসতা, সাধারণ নিরাপত্তার অভাব এবং চলাফেরায় বিধিনিষেধ ইত্যাদি কারণে সাধারণভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া বাধ্যতামূলক করে জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে একটি ধারা যোগ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ব্যাপারে বিতর্ক দেখা যায়। বাম জোটের ১১টি দল ছাড়া দলে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নারীদের অভাব রয়েছে বলে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের বিরোধিতা করে। রাজনৈতিক দলের আলোচনার প্রেক্ষিতে ৬

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর, ২০০৮ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনের ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অনুসমর্থনকৃত গঠনতন্ত্র (নির্দিষ্ট সংখ্যক নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হবে- এমন একটি ধারা যোগ করা হয়) জমা দেবে এই শর্তে জনপ্রতিনিধিত্ব দলগুলো এবারের সংসদ নির্বাচনে অধিকসংখ্যক নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দিয়েছে। আওয়ামীলীগ মোট ২৫৯ প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন নারী প্রার্থী (৭.৩৩ শতাংশ), বিএনপি ২৫৬ জনের মধ্যে ১৫ জন (৫.৮৫ শতাংশ), জাতীয় পার্টি ৪৬ জনের মধ্যে তিনজন (৬.৫২ শতাংশ), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৫৭ জনের মধ্যে একজন (১.৭৫ শতাংশ), বিকল্পধারা ৬২ জনের মধ্যে চারজন (৬.৪২ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ছয় জনের মধ্যে একজন (১৬ শতাংশ), গণফোরাম ৪৫ জনের মধ্যে পাঁচজন (১১.১১ শতাংশ) এবং কমিউনিস্ট পার্টি ৩৭ জনের মধ্যে দু'জন (৫.৪০ শতাংশ) নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দিয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম

ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) প্রতিষ্ঠা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের সর্বত্র নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য "One Stop Crisis Centre" প্রতিষ্ঠা করেছে। নারী নির্যাতন দমন সেল-জাতীয় মহিলা সংস্থার অংশ হিসেবে কাজ করছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের "One Stop Crisis Centre" বিভাগ নির্যাতনের শিকার হয়ে গুরুতর আহত মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। নির্যাতিত

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের সকল প্রয়োজনীয় সেবা একস্থান থেকে প্রদান করার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ওসিসি। স্বাস্থ্যসেবা,পুলিশী সহায়তা, ডিএনএ পরীক্ষা, সামাজিক সেবা,আইনী সহায়তা, মানসিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয় সেবাসমূহ ওসিসির মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

গ্রাফ-৩

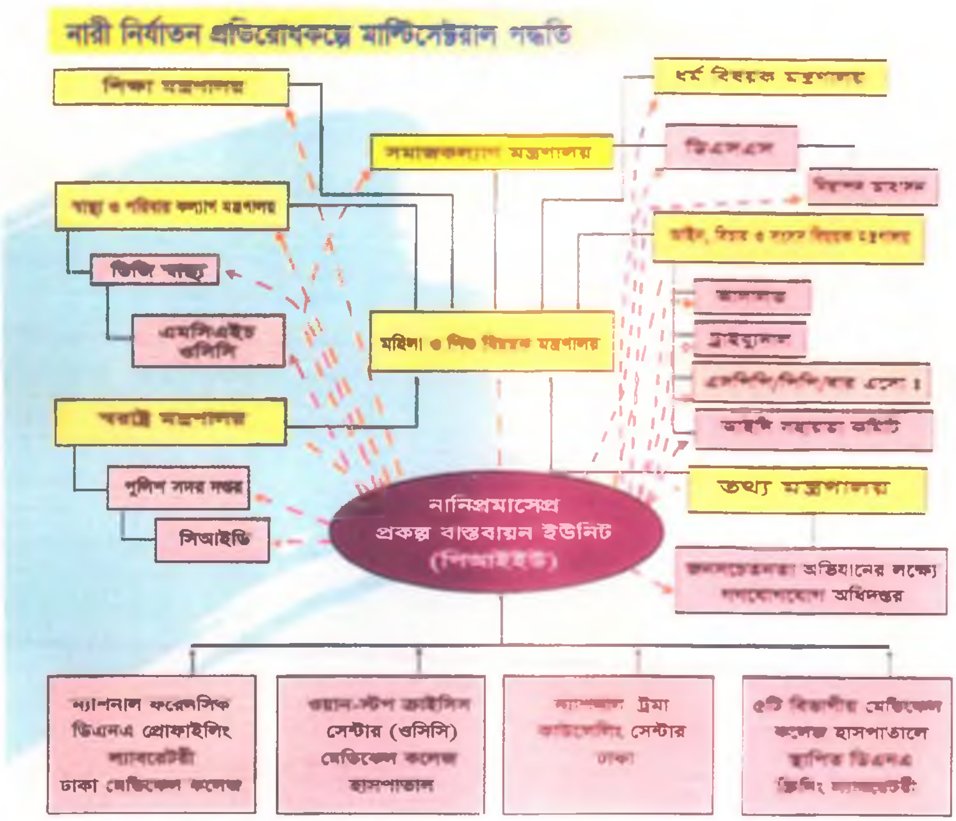

ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী (এনএফডিপিএল) প্রতিষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ

Dhaka University Institutional Repository

প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী (এনএফডিপিএল)। এই ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে ড্যানিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্ট বা ড্যানিডা। বিভিন্ন ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন-ধর্ষণ, হত্যা, ইত্যাদি দমনে এই ল্যাবরেটরী পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করবে। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ভিকটিমের কাছ থেকে প্রাপ্ত সীমেনের ডিএনএ প্রোফাইলকে অভিযুক্তের ডিএনএ প্রোফাইলের সাথে তুলনা করা হয়।যে কোন ধরনের শারীরিক নমুনা (Body evidence) যেমন-রক্ত, লালা, সীমেন, চুল, মাংসপেশী, হাড়, ইত্যাদি হতে পারে ডিএনএ- এর গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

গ্রাফ-৪

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার(এন.টি.সি.সি) প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের চতুর্থ তলায় নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার (এন.টি.সি.সি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার মেট্রোপলিটন পুলিশের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে

কর্মসূচী - ২০১১

বিট পুলিশিং প্রবর্তন করা প্রতিটি থানা এলাকাকে বিটে বিভক্ত করে নগরবাসীর খুব কাছে গিয়ে পুলিশী সেবা প্রদান করা।

সিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন এবং অবৈধ অস্ত্রের ও মাদকের অপব্যবহার রোধে একটি সিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অপরাধী শনাক্তকরণ, অপরাধের সাথে অপরাধীর সম্পর্ক নির্ণয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

Portable Explosive Vapor Detector, Long

Dhaka University Institutional Repository

Distance +Explosive Detector, Bomb Suit, Mobile X-ray, Night Vision Binocular, Binocular, Prodder, Archway (Gate), Automatic Vehicle Scanner, Disrupter Certidge/Bullet, IEDD Response Vehicle, Portable IEDD Container, APC, Mobile Command Post এ যন্ত্র ও যন্ত্রেসন্নিবেশিত যান ডিএমপি'র কর্মকান্ডে ব্যবহার করা।

অগ্রীম তথ্য পরিচালিত পুলিশী ব্যবস্থা (Intelligence Led Policing) তথ্যের মূল্য সীমাহীন। আমাদের দেশে অপরাধ তদন্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। এবং তথ্য পরিচালিত পুলিশী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা।

অপরাধ দমনে লাগসই কৌশল প্রণয়ন প্রতিদিন অপরাধের নতুন কৌশল আয়ত্ব করছে অপরাধীরা। তাদের কৌশলের তুলনায় পুলিশ যাতে এগিয়ে থাকে সে লক্ষ্যে এসকল ক্ষেত্রে পুলিশের বিশেষায়িত সামর্থ বৃদ্ধি করা এবং অপরাধ দমনে লাগসই কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।

নন-পুলিশিং সেবার পরিধি বিস্তার সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম আরো সম্প্রসারণ করা। ওয়ান স্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সেবা দ্রুত প্রদান করা।

১) নগরবাসীর নিরাপত্তা সেবা দ্রুত প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

২) নগরীর অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্যে সাপ্তাহিক ফ্রি ক্লিনিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩) মাদকাসক্তদের পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪) থানায় ভিজিটর বুক খোলার উদ্যোগ নেয়া। পুলিশী সেবা প্রত্যাশীরা থানায় এসে ইচ্ছে করলে এ বইতে তাদের মন্তব্য লিখতে পারবেন।

জনবল বৃদ্ধি

ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যানুপাতে পুলিশের সংখ্যা কম। ৮৫০ জন মানুষের জন্য ১জন পুলিশ। সুতরাং জনসংখ্যানুপাতে পর্যায়ক্রমে পুলিশের জনবল বৃদ্ধিও এ পরিকল্পনার অন্তর্গত।

মহিলা পুলিশ বিভাগ গঠন

ঢাকা মহানগর পুলিশে একটি মহিলা পুলিশ বিভাগ গঠন করার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্ত করানো হবে। নারী পাচার বা অন্য কোন সংঘবদ্ধ অপরাধের সাথে নারী সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাও এ বিভাগের কর্মকর্তা দ্বারা তা অনুসন্ধান করানো হবে। এতে পুলিশ বিভাগে নারীর সংখ্যা ও কর্তৃত্বের অংশীদারিত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিকভাবে ঢাকা মহানগরে একটা নারীবান্ধব পুলিশ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

যানবাহন বৃদ্ধি

ঢাকা মহানগর পুলিশের যানবাহন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক রিকুইজিশন বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করার কারণে মহানগর পুলিশের মবিলিটি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকারের প্যাকেজ আকারে ন্যূনতম সংখ্যক যানবাহন সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ট্রাফিক এন্ড কমান্ড সেন্টার চালু করা ঢাকা মহানগরীর ৫৫টি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে ১৫৯টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ জংশনগুলো মনিটর করা হবে এবং ক্যামেরায় নাইট ক্যাপাসিটি সংযুক্ত করা হবে।

অপরাধী ও তথ্যের ডাটাবেজ স্থাপন করা অপরাধী চিহ্নিত করে তার উপর পুলিশের নজরদারি অব্যাহত থাকলে ঐ অপরাধীর পক্ষে অপরাধ করার সম্ভাবনা কমে যায়। এ কারণে ডাটাবেজ স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যানবাহনের মধ্যে নিরাপত্তা যন্ত্র স্থাপন গাড়ীর ভিতরে যদি নিরাপত্তা পদ্ধতি (Safety device) স্থাপন করা যায় তাহলে গাড়ী চুরি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে গাড়ীর মালিক ও চালককে উদ্বুদ্ধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

Distance +Explosive Detector, Bomb Suit, Mobile X-ray, Night Vision Binocular, Binocular, Prodder, Archway (Gate), Automatic Vehicle Scanner, Disrupter Certidge/Bullet, IEDD Response Vehicle, Portable IEDD Container, APC, Mobile Command Post এ যন্ত্র ও যন্ত্রেসন্নিবেশিত যান ডিএমপি'র কর্মকান্ডে ব্যবহার করা।

অগ্রীম তথ্য পরিচালিত পুলিশী ব্যবস্থা (Intelligence Led Policing) তথ্যের মূল্য সীমাহীন। আমাদের দেশে অপরাধ তদন্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। তথ্য পরিচালিত পুলিশী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা।

অপরাধ দমনে লাগসই কৌশল প্রণয়ন প্রতিদিন অপরাধের নতুন কৌশল আয়ত্ব করছে অপরাধীরা। তাদের কৌশলের তুলনায় পুলিশ যাতে এগিয়ে থাকে সে লক্ষ্যে এসকল ক্ষেত্রে পুলিশের বিশেষায়িত সামর্থ বৃদ্ধি করা এবং অপরাধ দমনে লাগসই কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।

নন-পুলিশিং সেবার পরিধি বিস্তার সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম আরো সম্প্রসারণ করা। ওয়ান স্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সেবা দ্রুত প্রদান করা।

১) নগরবাসীর নিরাপত্তা সেবা দ্রুত প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

এমন পরিস্থিতিতে একটি পৃথক তদন্ত সংস্থা গঠনের প্রস্তাব নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত। তবে এর সুফল পেতে হলে প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে যেন এই সংস্থা সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে, সব ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। পুলিশের কর্মকর্তাদের মধ্যেই কেউ কেউ অভিযোগ করেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মামলার তদন্ত নির্ভর করে ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা বলেছেন, কুমিল্লায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের অস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনার ক্ষেত্রে ভিডিওচিত্র দেখে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান হত্যাকান্ডের ঘটনার ভিডিওচিত্র থাকলেও পুলিশ তা ব্যবহার করে আসামিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ, কুমিল্লার ঘটনায় আসামিরা বিরোধী দলের আর নাটোরের ঘটনায় আসামিরা ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী। নীতিগতভাবে এই অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটলে প্রস্তাবিত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। সিআইডি বা অপরাধ তদন্ত বিভাগ নামে একটি তদন্ত সংস্থা তো রয়েছেই, যেটি ১৬ ধরনের অপরাধের মামলার তদন্ত করে থাকে। এই সংস্থার তফসিলের পরিধি বাড়ানো হলেও পৃথক কোনো তদন্ত সংস্থার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অবৈধ হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সিআইডিও যথাযথভাবে তদন্ত চালাতে পারে না। এখানেও ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি কাজ করে। প্রস্তাবিত ব্যুরোকে এসব থেকে মুক্ত রাখা গেলেই কেবল তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, দেশের নিম্ন আদালতে ২০১০ সালে নিষ্পত্তি হওয়া ফৌজদারি মামলার ৭৬ শতাংশই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে টেকেনি। তাই অনেক আসামি খালাস পেয়ে আবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরণের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) নামে একটি পৃথক তদন্ত সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন বলে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হাসান মাহমুদ খন্দকার জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে নীতিমালা তৈরির জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তুতি চলছে।

বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) এ কে এম শহীদুল হক বলেন, পিবিআইয়ের পরিধি হবে দেশব্যাপী। একজন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এর প্রধান হবেন। গোটা দেশকে বৃহত্তর ১৯ জেলা ও আট মহানগর (মোট ২৭টি অঞ্চল) ভাগ করা হবে। তিনি বলেন, পিবিআইয়ের প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে পুলিশ সুপার এবং প্রতি জেলায় একজন করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা জেলা পুলিশ সুপারের অধীনে থাকবেন না, সংস্থা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করবে। এ সংস্থা থানায় দায়ের করা সব নিয়মিত মামলার তদন্ত, তল্লাশি, গ্রেপ্তার ও তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করবে। আর থানাগুলো এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মামলা দায়েরসহ অন্যান্য কাজ করবে। তিনি বলেন, এ তদন্ত ইউনিট গঠন করা গেলে মামলার সাজার হার অনেক বেড়ে যাবে। আর অপরাধ তদন্ত সংস্থা (সিআইডি) তাদের তফসিলভুক্ত অপরাধই তদন্ত করবে

এখন আদালতে মামলার অভিযোগ প্রমাণ করা যাচ্ছে না কেন, এ নিয়ে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট মহলে নানা আলোচনা চলছে। সরকারি কৌঁসুলিদের বক্তব্য, পুলিশ ইচ্ছা করে মামলা দুর্বল করে দেয়। আবার পুলিশ বলছে, রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিদের সদিচ্ছার অভাব এবং সাক্ষী না পাওয়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার বড় কারণ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মামলার

Dhaka University Institutional Repository

তদন্ত নির্ভর করে ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। যেমন- কুমিল্লার যুবদলের অস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনার ক্ষেত্রে ভিডিওচিত্র দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। কিন্তু নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান সানাউল্লাহ নূরের হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে ভিডিওচিত্র থাকলেও পুলিশের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। আসামিরা গ্রেপ্তার হয়নি। কারণ আসামিরা ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী। ঢাকায় আওয়ামী লীগের কর্মী ইব্রাহিম হত্যাকান্ডের তদন্ত নিয়েও নানা অভিযোগ আছে। এ ঘটনায় সরকারি দলের সাংসদের নাম আসায় তদন্তের গতি হারিয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ এস এম শাহজাহান বলেন, শুধু সরকার বা ক্ষমতাসীনেরা যেসব মামলার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে, সেসব মামলার তদন্ত যত্নের সঙ্গে হচ্ছে। অন্য সব মামলার তদন্ত হয় গতানুগতিক ধারায়। এতে বেশির ভাগ লোক সুবিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি বলেন, পুলিশ ব্যস্ত থাকে নানা ধারনের কাজ নিয়ে। তারা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন যথাযথভাবে তৈরি করতে পারছে না। তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মামলার জট কমানোর পরামর্শ দেন। সিআইডির প্রধান মোখলেসুর রহমান বলেন, বর্তমানে বেশির ভাগ মামলা নির্ভর করে মৌখিক সাক্ষ্যের ওপর। শুধু আসামির স্বীকারোক্তি ও মানুষের মুখের বক্তব্যকে ভিত্তি করার কারণে মামলা দূর্বল হয়ে যায়। উন্নত দেশে বস্তুগত সাক্ষ্য, যেমন- ডিএনএ প্রতিবেদন, অডিও, ভিডিও, হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, জাল নোট, ব্যবহৃত অস্ত্রের গায়ের ছাপ পরীক্ষা, রক্তের ছাপ ও রাসায়নিক পরীক্ষা এসবের খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব প্রমাণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তিনি আরও বলেন, আসামির স্বীকারোক্তি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দুর্বলতার বাইরেও আসামির সাজা না হওয়ার পেছনে যথাযথ তদন্তের অভাব এবং রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলিদের দায়িত্বে অবহেলাও

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী। ০৫/০১/২০১১ বুধবার রাতে অপরাধ নিয়ে পুলিশের বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, ২০১০ সালে আদালাতে নিষ্পত্তি হওয়া ফৌজদারি মামলার মধ্যে মাত্র ২৪ শতাংশ ক্ষেত্রে আসামির সাজা হয়েছে। ২০০৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩ শতাংশ। এ প্রতিবেদন নিয়ে পুলিশের সংশ্লিষ্ট মহলে উদ্বেগ রয়েছে।

নোয়াখালী পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান (কমান্ড্যান্ট) শহীদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মামলা দায়ের, তদন্ত ও বিচার-প্রক্রিয়ার ভেতরে নানা ধরনের সমস্যা আছে। যেমন- মামলার বিবরণ তৈরি করা হয় মৌখিক সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে । তদন্তও হয় সেভাবেই। খুব কম ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। তা ছাড়া সময় একটা বড় ব্যাপার। বিচার দীর্ঘায়িত হলে সাক্ষীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। দেখা যায়, মামলা করার সময় সাক্ষী যা বলেছিলেন, বিচারের সময় সাক্ষী বলছেন তার উল্টো। আবার যারা সাক্ষী হন, তাদের বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। উচ্চবিত্ত শিক্ষিত লোকজন খুব কমই সাক্ষ্য দিতে যান।

ঢাকা মহানগর দায়রা আদালতের সরকারি কৌসুলি আবদুল্লাহ আবু বলেন, আসামি খালাস পাওয়ার প্রধান কারণ সাক্ষী না পাওয়া। দেখা গেছে, ঘটনা সঠিক কিন্তু সাক্ষী না পাওয়ায় খালাস পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, অনেক সময় সাক্ষীদের আসামিপক্ষ কিনে ফেলছে। আবার কখনো সাক্ষী আসতেই চায় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশের তদন্তেও দুর্বলতা থাকে।

আইনজ্ঞ শাহ্‌দীন মালিক বলেন, আগে প্রসিকিউশন ক্যাডার তৈরি করতে হবে, মামলা দায়েরের আগেই যাতে পুলিশ এ নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে। অনেক দেশে প্রসিকিউশন ক্যাডার আছে। তিনি বলেন, মামলা গ্রহণ করা হবে কি না, তা বিবেচনার জন্য ফৌজদারি কর্যবিধির ২০৬ থেকে ২২০ পর্যন্ত ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে এসব ধারা বাতিল করা হয়। এখন বিচারকদের মূল্যায়নের কোনো সুযোগ নেই।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে পুলিশী হেফাজতে নারী নির্যাতন নিয়ে জনমত

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশের ব্যর্থতা নির্যাতনকারীদেরকে উৎসাহিত করছে (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট-২০০১)। এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতারই অংশ। বর্তমান বাস্তবতায় সব ধরনের সহিংসতাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষেরাও ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের মত বিভিন্ন হিংস্রতাকে স্বাভাবিক বলে মনে করতে শুরু করেছে।

নির্যাতনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং রাজনীতির নোংরা রূপ এখন সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অপরাধী এমনকি পুলিশও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এসব কারণে তারা হত্যার মত মামলাকেও পরোয়া করে না। এটা আরও অপরাধের জন্ম দেয়। একজন আইনজীবীর মত "এভাবে অপরাধীদের ক্ষমা করে দেয়ার কারণে তারা আরও অপরাধে জড়িত হয় কারণ তাদের কোন শাস্তির ভয় নাই।" আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক দলের প্রভাব মুক্ত হতে হবে এবং সবাই মিলে অপরাধীকে ঘৃণা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

UNICEF বিশ্বের ৯০টি সমাজের উপর একটি জরিপ পরিচালিত করে যাতে দেখা যায় প্রধানত চারটি কারণে একটি সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্য ভিত্তিক সহিংসতা ঘটে। এগুলো হলো: (১) নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য (২) সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষ আধিপত্য (৩) পারিবারিক সীমা অতিক্রমে নারীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা (৪) সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রথা যা নারীকে দুর্বল করে রাখে। অধিকাংশ মানুষই স্বীকার করবে যে, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নারীর উপর এই সহিংসতার চক্রকে ভাঙতে পারে। UNICEF সমীক্ষা নারী নির্যাতনের জন্য ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে। বিস্ময়কর ভাবে এই সমীক্ষা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেছে। যে বাংলাদেশে বাস করে সেই জানে এখানে হাজত সহিংসতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

'আইন ও সালিস কেন্দ্র' এর বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯- এ, বিনা ডি কস্টা উপসংহারে বলেছেন, ১৯৯৬-১৯৯৯ সালের মধ্যে ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন ও এসিড নিক্ষেপের শিকার নারীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের গ্রন্থাগারে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ এর আওতায় যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলো থেকেই লেখিকা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডি কস্টা উল্লেখ করেছেন, সাধারনত ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের মেয়েরা ধর্ষণের এবং ১৯ বছরের বেশি বয়সের মেয়ের পারিবারিক ও যৌতুক জনিত নির্যাতনের শিকার হয়। পরবর্তী বছরে ১০টা জাতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ২০০০ সালে সংঘটিত নারী নির্যাতনের ৪৭% ধর্ষণ, ২০% পারিবারিক নির্যাতন, ১৭% যৌতুকজনিত নির্যাতন, ৯% আত্মহত্যা, ৬% এসিড

Dhaka University Institutional Repository

নিক্ষেপ, ১% ফতোয়া জনিত কারণে ঘটে থাকে। উল্লেখ্য সত্যিকার অর্থে সংঘটিত নারী নির্যাতনের অর্ধেকের বেশিতে মামলা হয় না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রতি ঘন্টায় একজন নারী হিংস্রতার সম্মুখীন হন। এছাড়া প্রতিদিন নারীর প্রতি যে ২৪টি ভয়াবহ অপরাধ ঘটে তার ১০টি ধর্ষণ। প্রতিবেদনের লেখিকা বলেছেন ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে সংঘটিত নারী নির্যাতনের সংঘটিত নারী নির্যাতনের সংখ্যা পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে।

নারী সংগঠন যেমন নারীপক্ষ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, উইমেন ফর উইমেন, মহিলা পরিষদ এবং NCBP কয়েক বছর ধরে এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, যৌতুক জনিত মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

NCBP- এর সমীক্ষায় হাজতের নির্যাতন ও পুলিশী সহিংসতার কথা বলা হয়নি। কিন্তু হাজতে নির্যাতন বিশেষ করে নিরাপত্তা দেয়ার নামে এই নির্যাতন দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে বিশেষ করে দরিদ্র নারী ও শিশুর মধ্যে। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর নারীদের জন্য হাজত গৃহের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যেসব নারী ও শিশু সুবিচারের জন্য পুলিশের কাছে যাচ্ছে তারা তাদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীরা পুলিশের হাতে ধর্ষণের শিকারও হয়েছে। এমনকি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা দেয়ার নামে আসামীদের সাথে থাকতে বাধ্য করা হয়।

এছাড়াও পুলিশের শুধুমাত্র সন্দেহ হলেই একজন নারীকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণঃ যৌনকর্মী, গার্মেন্টস শ্রমিক ও নিস্বঃ নারীরা এই অবস্থার শিকার হয়। এ রকম একটি ঘটনাতেই

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামের গার্মেন্টস শ্রমিক সীমা চৌধুরী কোন অপরাধ ছাড়াই ৪ মাস হাজতে থাকার পরে মারা যায়। ১৯৯৭ সালের সীমা চৌধুরীর মৃত্যু এবং ১৯৯৫ সালে ১১ বছর বয়সী ইয়াসমীন ধর্ষণ ও হত্যা জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ জন্মায়।

এই ঘটনার জন্য দায়ী বাংলাদেশের পেনাল কোডের ধরন যা ১৮৬০ সালে তৈরি করা ব্রিটিশ পেনাল কোড থেকে নেয়া হয়েছে। স্থানীয় ও বৈষয়িক অবস্থার সাথে তাল মেলাতে পেনাল কোডের লিঙ্গ-বৈষম্য ভিত্তিক ভাষার পরিবর্তন প্রয়োজন। নারীদেরকে যৌন হয়রানী থেকে বাঁচানোর এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার উন্মেষের জন্য স্বতন্ত্র আইন থাকা প্রয়োজন। নারীত্বের পূর্বের সংজ্ঞাটিকে সবসময় ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা নারীদের উত্যক্ত বা নির্যাতন করে তাদের শাস্তি হওয়া উচিৎ এজন্য যে, তারা তাদের মানবাধিকার লংঘন করেছে এবং মানুষ হিসাবে তাদের মর্যাদা খর্ব করেছে। যতদিন পর্যন্ত নারীদেরকে আইনগত ভাবে পুরুষের সমান বিবেচনা করা হবে না ততদিন পর্যন্ত হাজতের নির্যাতনও বন্ধ হবে না।

ইতোমধ্যে এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশাবলী সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন, উক্ত রায় অনুসারে যে সমস্ত বিষয় যৌন হয়রানি বলে গণ্য হবে ঃ

- শারীরিক স্পর্শের মত অপ্রত্যাশিত যৌনাকাঙ্খার ব্যবহার।
- প্রশাসনিক, কর্তৃত্বমূলক অথবা পেশাগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ বা চেষ্টা।
- যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ।
- যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ।

Dhaka University Institutional Repository

- পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন।
- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা রসিকতা।
- অশালীন উক্তিসহ আপত্তিকর কোনো ধরনের কিছু করা।
- চিঠি, ই-মেইল, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস, পোস্টার, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, দেয়াল লিখনের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা।
- ব্ল্যাকমেইলিং এবং চরিত্র হনন-এর উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ।
- লিঙ্গীয় ধারণা থেকে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতায় বাধা প্রদান।
- প্রেমের প্রস্তাব দেয়া এবং প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান।
- মিথ্যা আশ্বাস, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।

হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশাবলীর বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীর উপর যৌন হয়রানি ও নিপীড়নকে আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।
- যৌন হয়রানির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- যৌন হয়রানিকে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।
- হাসপাতাল ও সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি কর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাস্তায় চলাচলকারীরাও এই নির্দেশাবলীর আওতাভুক্ত।
- সকল কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দায় কর্তৃপক্ষের। ঘটনা ঘটলে শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়ায় দায়ও কর্তৃপক্ষের।
- যৌন নিপীড়ন ও শাস্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন এবং কার্যকর শাস্তির বিধান করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশাবলী বা রায় পালন করা সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। এগুলো প্রয়োগের লক্ষ্যে পদক্ষেপ না নিলে তা আদালত অবমাননার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

পুলিশ হেফাজতে নারীর নির্যাতন বন্ধসহ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ হেফাজতে নারীর নির্যাতন বন্ধসহ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ সমূহ

ধর্ষণের সংজ্ঞাটিকে আরো ব্যাপক করতে হবে

ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের দেশে ধর্ষণজনিত অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সংশ্লিষ্টরা এর জন্য ধর্ষণ প্রমাণের ক্ষেত্রে জটিলতা এবং প্রচলিত আইনের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায়, দন্ডবিধির ৩৭৫ নং ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞার কথা। এই সংজ্ঞাটিতে 'নারীর সম্মতি না জানানো' বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আইন অনুযায়ী কেবল মৌখিক 'না' অসম্মতি বোঝায় না বরং নারী যৌন মিলনে যথেষ্ট বাধা না দিলে বা প্রতিরোধ না করলে আদালতে তার অসম্মতি প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়, ১৮৬০ সালের এই সংজ্ঞাটিতে ধর্ষণের জন্য 'পেনিট্রেশন' আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একজন নারীর জন্য অবাঞ্ছিত যে-কোনো যৌন সংস্পর্শই ধর্ষণ বলে বিবেচনা করা উচিত, কেননা প্রকৃতপক্ষে অবাঞ্ছিত যে-কোনো ধরণের যৌন সংস্পর্শ নারীর মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করে।

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে উল্লেখ্য, ৩৭৫ নং ধারায় বর্ণিত ধর্ষণের সংজ্ঞাটি আমাদের আইনগুলোতে ধর্ষণকারীর শাস্তি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। প্রায় দেড়শ বছর পুরনো এই সংজ্ঞাটির পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ষণের সংজ্ঞাটিকে আরো ব্যাপক করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে ধর্ষণ মামলার বিচার পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই আইনটির অনেকগুলো বিধান ন্যায়বিচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ১৬১ ধারায় জবানবন্দি নেয়ার যে বিধান রয়েছে বাস্তবে তা ধর্ষিতাকে মানসিক চাপের মুখোমুখি করে দেয়। বিচারকাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে এই ধরণের পদ্ধতি পরিহার করা উচিত।

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা অন্য সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো উচিত

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত পুলিশের বদলে অন্য কোনো সংস্থাকে দিয়ে করানো উচিত বলে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছেন। বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন ও বিচারপতি মোহাম্মদ মারযি-উল-হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ চাঞ্চল্যকর ইয়াসমীন মামলার সাক্ষ্য গায়েব সংক্রান্ত মামলার আপিলের শুনানীকালে (১৮ জুন ২০০১) এ মন্তব্য করেন।

শুনানিতে আদালত বলেন, তিনজন সাক্ষী ইয়াসমীন হত্যা মামলায় যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, সাক্ষ্য গায়েবের মামলায় তারা উল্টো কথা বলেছেন, এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না তা আদালত রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি ডেপুটি অ্যার্টনি জেনারেল ব্যারিষ্টার শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের কাছে জানতে চান। ব্যারিষ্টার মানিক বলেন, এসপি মামলায় ভিন্ন কথা বলেছেন, সাংবাদিক হেলালকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। এমনকি এ মামলা থেকে এসপিকে বাঁচানোর চেষ্টা করায় এএসপি আফজালকে তদন্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আদালত ওই মন্তব্য করে বলেন, 'অন্যথায় এভাবেই ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হবে'।

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুরের তৎকালীন সিভিল সার্জন এবং দিনাজপুরের কোতোয়ালি থানার ওই রাতে দায়িত্বরত কর্মকর্তা এস আই বাকীকে এ মামলায় আসামি না করার বিষয়েও আদালত প্রশ্ন তোলেন।

মামলা পরিচালনাকারী পুলিশ কর্মকর্তার ব্যাপক আইনী জ্ঞান থাকতে হবে

একজন পুলিশ কর্মকর্তা ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করে থাকেন । ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে মামলাটির সফলতা নির্ভর করছে কতটা দক্ষতা ও তৎপরতার (দ্রুত) সাথে পুলিশ কর্তৃক বিষয়টির ইনভেষ্টিগেশন বা তদন্ত করা হয়েছে । এজন্যএকজন পুলিশ কর্মকর্তাকে ব্যাপক জ্ঞান ও ধারনা থাকা প্রয়োজন Substantial and procedural Law সম্পর্কে ।

নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদি (National Machineries for Women) শক্তিশালীকরণ

উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনায় জেন্ডার চাহিদা ও জেন্ডার চেতনা সংশ্লিষ্ট করার প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এজেন্সি সমূহকেই নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা 'ন্যাশনাল মেশিনারিস ফর উইমেন' বলা হয়ে থাকে। বস্তুত গত শতকের সত্তরের দশকে উদার নারীবাদী চিন্তাকাঠামোর বিকাশের সাথে এই বিষয়টি সম্পর্কিত। ঐ সময়েই প্রথম আলোচনায় আসে যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নারীকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত না করে শুধু পরোক্ষ সুবিধাভোগী হিসেবেই অন্তর্ভূক্ত করা হয় (উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট প্যারাডাইস)। ফলে ৮০ এবং ৯০ দশকে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেকগুলো ইতিবাচক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকান্ডে জেন্ডার ইস্যুর সন্নিবেশ ঘটানো।

প্রায় ক্ষেত্রেই যা পরিলক্ষিত এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিকভাবে দূর্বল, বিরাজমান সম্পদে ঘাটতি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের শিকার এবং এগুলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা অধিদপ্তরের সাথে জড়িত করে এক ধরণের প্রান্তিকীকরণ করা হয়ে থাকে। এটাও সত্য যে, অনেক দেশেই এসব জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদি চালু হয়েছিল এক আর্থিক সংকটকালে যার ফলে সরকার পটপরিবর্তনে আর্থিক টানাপোড়নের প্রভাব এগুলোতে বেশী পড়েছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে উত্তরণের সময়কালে নারীর জন্য যেসব জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল (যেমন ঃ ফিলিপাইন, চিলি, উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা) সেগুলো তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকর এবং প্রভাব নিয়ে কাজ করতে পেরেছে, নিদেনপক্ষে আংশিকভাবে হলেও তা হয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির কারণে। ইতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে এটা উঠে এসেছে যে, সফল জাতীয় নীতি নির্ধারণে বিশেষত জাতীয় জেন্ডার নীতি প্রণয়নে বৃহত্তর পর্যায়ে জনগণের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় পর্যায়ে নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের সফলতা বিভিন্ন দেশেই দৃশ্যমান। যদিও এসব প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন। বিশেষত নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য মন্ত্রণালয়গুলোর কার্যক্রমে নারী উন্নয়নবিষয়ক কর্মকান্ডগুলো একীভূতকরণ এবং এ সংক্রান্ত কাজগুলো

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষতার সাথে সম্পাদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক ধরণের সমন্বয়কারী অফিস হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরণের বাধা রয়েছে। যেমন মন্ত্রণালয় বা অফিসের প্রশাসনিক ক্ষমতাহীনতা আর্থিক বরাদ্দ কম থাকা ও দাতা সংস্থাগুলোর ওপর অতি নির্ভরশীলতা, আমলাতান্ত্রিক বাধা এবং প্রায় ক্ষেত্রেই জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯০-এর দশক থেকে এসব প্রতিষ্ঠান নতুন কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজকর্ম শুরু করে। এই কৌশলের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল সরকারের সকল সেক্টর, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ইত্যাদিতে জেন্ডার চিন্তা-চেতনাকে মূলধারায় আনা বা প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এর ফলে দেখা যায় যে, সকল মন্ত্রণালয়ে 'জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট' খোলা হয়, প্রশাসনের সকল স্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনায় জেন্ডার বিশ্লেষণ শুরু হয়।

নারীর মানবাধিকার (Women's Human Rights) নিশ্চিত করতে হবে

মানবাধিকার জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার সম্বোধন করে। যেখানে মানুষ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি সর্বজনীন সমমূল্য ও সমমর্যাদা পাবে। এই সর্বজনীনতাই মানবাধিকার সনদের মূল মর্ম। আর যে জন্য মানবাধিকার এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নারী পুরুষ উভয়ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য ইত্যাদির ঘোষণায় সর্বজনীনতা নিহিত। কিন্তু বাস্তবে মানবাধিকারের এই ঘোষণা এবং বাস্তবতার মধ্যে ফারাক বিস্তর। দেখা গেছে পুরুষ লাভবান বেশি। সে কারণে নারীবাদীরা মানবাধিকারের বিষয়টিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার দাবিদার। কারণ ইতিহাস যে নারী নির্যাতনের সাক্ষী দেয় সেই

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার ধারাবাহিকতাই এ জন্য দায়ী। সমস্যার জায়গা হলো নারীর সব অধিকারকে মানবাধিকারের আওতায় আনা হয় না। প্রতিটি দেশের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার। এই আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করেই দেশের আইন কানুন-সামাজিক কাঠামো- সংবিধান গড়ে তোলা হয়, যার মধ্যে ওই সমাজের নারী পুরুষ সম্পর্কের প্রচলিত ও অনুমোদিত আচরণবিধির প্রতিফলন ঘটে।

নারীর মানবাধিকারকে এ পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরার জন্য নারী আন্দোলনের মধ্য থেকে কয়েকটি অধিকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

- সাধারণ মানবাধিকার দলিলে নিরুপিত অধিকার সেখানে সব মানবাধিকার নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।
- বিশেষ সনদে উল্লিখিত অধিকার সমূহগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত।
- স্বীকৃতিহীন নয়া অধিকার যেগুলো এখনো মানবাধিকার সনদে জায়গা পায়নি (প্রজনন অধিকার, যৌন অধিকার) সেগুলোর সুনির্দিষ্ট জায়গা করে দেয়া।

নীতিগতভাবে জাতিসংঘ সনদে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়টি জায়গা পেয়েছে। নারীর মানবাধিকারকে অস্বীকার করলে সে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে তো বটেই, মুখ থুবড়ে পড়বে। সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে (পাবলিক ও প্রাইভেট) নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে, নারীর মানবাধিকার রক্ষার হাতিয়ারগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সিডও সনদের কথা উল্লেখ করে। এখানে লিঙ্গভিত্তিক নারীর বিভাজন এড়ানো এবং আর্ন্তজাতিক আইনের মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। ১.৩ বিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে আর তার মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী। নারীর নিরক্ষতার হারও অনেক বেশী। সব মিলিয়ে নারী নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছে। কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা যে পদক্ষেপ নিতে চাইছে সেগুলো যদি যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় তবে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে অচিরেই। সমাজের প্রতিটা মানুষ সমতা আনয়নে এক একটি মাইলস্টোন হতে পারে এবং সেটাই দরকার।

নারীর জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তহবিল ইউনিফেমের (Nations Fund For Women) যথাযথ ব্যবহার

নারীর জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউনিফেম) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালিত একটি বিশেষ তহবিল। নারী উন্নয়নে জাতিসংঘ পরিচালিত সব কার্যক্রমকে সমন্বিত করে এ সংস্থা। উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এর কাজ। জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্য থেকে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ে সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সঙ্গে নারীর প্রয়োজন ও উদ্বেগকে সংযুক্ত করতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে এই সংস্থা। ১৯৭৬ সালে ইউএনডিপির অধীনে নারীর অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত এ তহবিল উন্নয়নশীল সামাজিক ক্ষমতায়নের সহায়ক প্রকল্পে সংস্থা সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নারীর কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন করে এমন তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান থেকে গণশিক্ষা প্রচারাভিযান এবং নারী সম্পর্কিত নতুন আইন প্রণয়ন। এই সংস্থা স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে কাজ করে। এই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটি এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীর নির্বাহী পরিষদের নিকট রিপোর্ট করে। ১২ জন আঞ্চলিক কর্মসূচী উপদেষ্টার মাধ্যমে এটি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করে। আমেরিকার নিউইয়র্কে সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত।

এটি একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক তহবিল। নারীর মানবাধিকারের উত্তরণ তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচীতে ইউনিফেম আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়। ইউনিফেম প্রাথমিকভাবে তিনটি ক্ষেত্রে কর্মরত ১. উদ্যোক্তা এবং উৎপাদক হিসেবে নারীর অর্থনৈতিক সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ, ২. প্রশাসন, নেতৃত্ব ও নীতি প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং ৩. উন্নয়নকে অধিকতর সুষম করার জন্য নারীর মানবাধিকারের বিকাশ। নিজের ও পরিবারের জীবনমান বৃদ্ধিতে শতাধিক দেশে নারীদের সাহায্য করেছে ইউনিফেম। এই তহবিল নারীর জন্য উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচীতে সমর্থন দিচ্ছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে সম্পর্কে নারী সমাজকে তথ্য সরবরাহ করছে। ইউনিফেম বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ অভিযান বেসরকারি খাত এনজিও ও সরকারের সহযোগীতায় নতুন ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের জন্য বীজ পুঁজির ব্যবস্থা রয়েছে।

নারীর সরকারি কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন (Government Service and Women's Empowerment) বৃদ্ধি করতে হবে

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে বেসরকারি দাতা এবং সেবামূলক সংস্থার প্রসার ঘটে যেখানে নারীর অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সে তুলনায় সরকারি চাকুরিতে নারীর অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পাচ্ছে না। নারীর সনাতনী ভূমিকার পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে বলে সরকারি কর্মসংস্থান ক্যাডার পদে নারী প্রতিনিধিত্ব পদ রাখা হয়েছে। ৫ম থেকে ২৬তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার গেজেট অনুযায়ী দেখা যায়, ক্যাডার পদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ক্রমশ বাড়ছে। অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে যা ছিল ১০.৬৭ শতাংশ ২০০৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩২.৯৫ শতাংশ। কিন্তু এই হার বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের তুলনায় খুবই নগন্য। কারণ এই সময়কালের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার ভিত্তিক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা গড়ে মাত্র ২০.৭৩ কোটাভিত্তিক পদ ও সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ ক্যাডার এবং সুনির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক ক্যাডার পদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বা নিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। কারণ শিক্ষক বা চিকিৎসক হিসেবে নারীর অবস্থান উৎসাহিত হলেও অন্যান্য জনমুখী কাজ, যেমন ঃ সড়ক ও জনপথ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী টেলিযোগাযোগ, রেলওয়ে প্রকৌশলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীকে দেখতে সমাজ এখনো প্রস্তুত নয়। তাই এসব পদে নারীর অংশগ্রহণ এখনো ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে করা হয়।

সরকারি চাকুরির উচ্চপদে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধিপত্য, জেন্ডার অসংবেদনশীল কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতা নারীর চলার গতিকে স্থবির করে দেয়। তদুপরি রয়েছে পারিবারিক অসহযোগীতা। পোষ্টিং বদলি ইত্যাদি পছন্দমতো না হলে পরিবারে সদস্যরা উৎসাহ দেয় না। বরং অনেক সময় চাকরি ছেড়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করে। সে ক্ষেত্রে সন্তানের মা হলে তো সমস্যার অন্ত নেই। এসব পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাকে নারীর দূর্বলতা হিসেবে দেখা হয় এবং বিসিএস এর বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

মৌখিক পরীক্ষায় এ নিয়ে নারী প্রার্থীদের কটাক্ষ করা হয় বলেও অনেকের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় নারী নীতিমালায় নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজকরণের উদ্দেশ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral Entry) ব্যবস্থা করা এবং একই সাথে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে গেজেটেড ও নন গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা ও তা নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সামাজিকভাবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হবে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোর সঠিক মূল্যায়ন হবে না। মা ও মাতৃদুগ্ধের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় মাতৃত্বজনিত ছুটি ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে মাতৃত্বজনিত ছুটি ৬ মাস। কিন্তু মায়ের দুধ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুর জন্য ৬ মাস পর্যাপ্ত নয়। একটি শিশুকে অন্তত ২ বছর মায়ের দুধ গ্রহণ করতে হয়। এটি তার অধিকার। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে 'ডে কেয়ার' বা 'চাইল্ড কেয়ার সেন্টার' স্থাপিত হয়েছে যা অবশ্যই নারীর পেশাগত উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কিন্তু সরকারি অফিসগুলোতে এখানো সে রকম কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগ দেখা যায় না। ভারতের মতো সন্তান প্রতিপালনের জন্য দু'বছরের ছুটি এ মূহূর্তে সম্ভব না হলেও 'ডে কেয়ার' বা 'চাইল্ড কেয়ার সেন্টার' বিষয়ে সরকার সহজেই ভাবতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) জোরদারকরণ

১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের ৩৯/৪৬ নং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব অনুসারে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশনটি স্বাক্ষরদান, অনুসমর্থন ও যোগদানের জন্য গৃহীত ও উন্মুক্ত হয়। এই কনভেনশন অনুসারে রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান এবং অবিচ্ছিন্ন অধিকারই স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার এবং বিশ্ব শান্তির মূল ভিত্তি, এগুলো মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ থেকে উদ্ভূত। জাতিসংঘ সনদ বিশেষ করে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সদস্য রাষ্ট্রবর্গের শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের কথা বিবেচনা করে। রাষ্ট্রসমূহ মানবগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল মানুষকে দৈহিক নির্যাতন, অমানবিক এবং মর্যাদাহানিকর আচরণ কিংবা শাস্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে আরও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সম্মতি প্রদান করেছে ঃ

১। নির্যাতিত ব্যক্তি বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধ করে থাকলে বা করেছে বলে সন্দেহবশত শাস্তি প্রদান করা হলে অথবা ভয় দেখানোর জন্য বা মানসিক আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্দেশে,

Dhaka University Institutional Repository

সম্মতিক্রমে বা অন্য কোনো পন্থায় এ ধরণের যন্ত্রনা ও দুর্ভোগের আওতায় পড়বে না।

২. প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ এর সার্বভৌমত্বের আওতাধীন প্রতিটি অঞ্চলে নির্যাতনমূলক আচরণ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর, আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার পদ্ধতিগত এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩. কোনো রাষ্ট্রপক্ষ কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো রাষ্ট্রে বহিস্কার, ফেরত প্রদান বা দেশান্তরিত করতে পারবে না যেখানে তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হতে পারে।

৪. প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, দেশের অপরাধ আইনের আওতায় নির্যাতনমূলক আরচণসমূহ অপরাধের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

৫. প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বর্ণিত অপরাধের সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে ঃ (ক) এ সকল অপরাধ যখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-খন্ডে অথবা সংশ্লিষ্টে রাষ্ট্রে নিবন্ধনকৃত জাহাজ বা বিমানে সংঘটিত হবে (খ) যখন অভিযুক্ত অপরাধী ব্যক্তি (নির্যাতনকারী সংশ্লিষ্ট) দেশের নাগরিক, (গ) যখন নির্যাতিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিক (যদি ঐ রাষ্ট্রটি সেরকম বিবেচনা করে)।

৬. যে কোন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে অপরাধের সংশ্লিষ্টতার কারণে অভিযোগ আনা হয়েছে বা বিচারকার্য চলছে, বিচার চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রতি সদাচরণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. যে কোন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে অপরাধের সংশ্লিষ্টতার কারণে অভিযোগ আনা হয়েছে বা বিচারকার্য চলছে, বিচারচলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রতি সদাচারণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮. যে সকল রাষ্ট্রপক্ষ তাদের মধ্যে সম্পাদিত অপরাধী প্রত্যাবর্তন চুক্তিতে অপরাধী ব্যক্তিকে ফেরত প্রদানের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করেনি, সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের বিধান সাপেক্ষে উক্ত অপরাধকে প্রত্যাবর্তনযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে।

৯. প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষকে গ্রেফতার, অন্তরীণাদেশ বা কারাদণ্ড কার্যকর করার কাজে নিযুক্ত ও নিরাপত্তা হেফাজত, স্বীকারোক্তি আদায় করা অন্যান্য শাস্তিমূলক আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সামরিক বা বেসামরিক ফৌজি সদস্য, চিকিৎসক কর্মী, স্বীকারোক্তি আদায়কারী বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণে নির্যাতন নিষিদ্ধমূলক শিক্ষা এবং তথ্যাদি সন্নিবেশিত করতে হবে।

১০. নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি কমিটি গঠন করা হবে। রাষ্ট্রপক্ষ এই কমিটির কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করবে। কমিটি এজন্য অপর একটি তদন্ত কমিটি গঠন ও তা পরিচালনা করবে। তদন্ত কমিটি মূল কমিটির কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। কমিটি পরবর্তীতে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে পরামর্শ দিবে।

নারী ও শিশু পাচার রোধ

পুলিশী হেফাজতে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হল নারী ও শিশু পাচার। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ১০-২০ হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ সংক্রান্ত সার্ক কনভেনশন অনুমোদন করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণমাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচারনা চালাচ্ছে। সরকার সীমান্তে অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং পাচারকারীদের ব্যবহৃত পয়েন্টগুলোতে আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় কিছু আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা পাচারের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সরকার আইনি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে না। কারণ এর সাথে উচ্চ পর্যায়ের লোকও জড়িত। তাই এ সমস্ত পাচারকারী ধরে উপযুক্ত শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নারী নির্যাতন রোধ করতে হবে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

১. যেসব আইন রয়েছে তা যথাযথ কার্যকর করতে হবে ;

২. শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ;

৩. পাচারের সাথে জড়িতদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।

৪. গণমাধ্যমসমূহ জনগণের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরবে।

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ব্যতীত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের যেসব কারণ রয়েছে তার ভিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নিহিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজই নারীকে ছোট করে দেখতে শেখায়। নারীর দূর্বলতা সবার সামনে নিয়ে আসে। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ব্যতীত কেবল আইন করে নারী নির্যাতন রোধ করা যাবে না। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠী নারী সমাজ,

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যম সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। নারী উন্নয়ন ও নারীকে যথাস্থানে বসানো কেবল নারীর জন্য নয় বরং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এই বোধ সবার মধ্যে সঞ্চালিত করতে হবে। নারী ও মানুষ আমাদেরই মা, কন্যা, স্ত্রী। তাদের কারণেই সকলের জীবন সুন্দর হয়েছে- এই চেতনা সবার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। তাদের প্রতি করুণা নয় বরং সমঅধিকার দিলেই তারা বিকশিত হবে।

সামাজিক সিদ্ধান্তে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে

সামাজিক সিদ্ধান্তে নারীর কোনো অংশীদারিত্ব দেখা যায় না বা নারীকে ডাকা হয় না। সামাজিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাম বা শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, রাজনৈতিক সমাজকর্মী, মোল্লা, ইমাম, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিকে ডাকা হয়। পরিবারের মূল একক হিসেবে সমাজে প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরিবার প্রধান পরিবারের মুখপাত্র হিসেবে সামাজিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করে। আর পরিবারের প্রধান সাধারণতই পুরুষ মানুষ। কিন্তু এমন সমস্যা দেখা যায় যা নারীকেন্দ্রীক তবুও সেখানেও পুরুষ সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে নারী নির্যাতন রয়েই যায় এবং নারী নির্যাতনের বিপরীতে সামাজিক সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করা হয় না।

নারীর ক্ষমতায়ন

Women's, empowerment is the transformation of structures of subordiation, including changes in the law, civil codes, property, inheritance rights, control over women's bodies and labour and the social legal institutions endorse male control. (Sen & Grown এর মতে)

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সূচক ব্যবহৃত হয়, যেমন- সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের ক্ষমতা, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন, পরিবারের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা, প্রজনন বা জন্ম শাসনে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গন্ডির প্রসারতা ইত্যাদি। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা যায়। ক্ষমতায়ন একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী তার নিজের আবেদন ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূর করতে সচেষ্ট হয়। নারীর ক্ষমতায়ন বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর নারী অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পায়, বা নারী নির্যাতনকেও হ্রাস করে। কাজেই বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত।

নারী পুলিশ / Woman Police এর সংখ্যা বাড়াতে হবে

নারী পুলিশের ধারণাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন হলেও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নারী পুলিশের যাত্রা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। তখন তাদের বলা হতো মেট্রন, বাইরের কাজে তাদের কোনো ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু প্রথম থেকেই তারা ছিল নানা রকম বৈষম্যের শিকার। সে বৈষম্য যেমন ছিল কর্মক্ষেত্রের বাইরে, তেমনি পুলিশ বিভাগের পুরুষ কর্মকর্তাদের কাছে তারা বিভিন্ন সময় লাঞ্ছিত হতেন। পুরুষ কর্মী কোনোক্রমেই নারী পুলিশকে একজন কর্মকর্তা হিসেবে মেনে নিতে চাইত

Dhaka University Institutional Repository

না। নানাভাবে তারা নারীর এগিয়ে যাবার পথে বাধার সৃষ্টি করতো। এখন পুলিশের পেশায় নারী-পথে-ঘাটে কাজ করে যাচ্ছে। এটা একেবারেই সাধারণ দৃশ্য।

বাংলাদেশেও এক সময় হতাশার চিত্র ছিল, এখন তাতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন শুরু হয়েছে সেই ব্রিটিশ ভারত থেকে। যদিও পাকিস্তানের দৃষ্টিতে নারীদের পুলিশ বিভাগে নিয়োগের চিন্তাকে শরিয়া আইনের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে ১৯৭৪ সালে ১২ জন নারীকে পুলিশ বিভাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়োগ দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৮তম বিসিএস থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছরই উর্ধ্বতন পদে নারী পুলিশের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নারীরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় সমানভাবে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে ৯০ ভাগ কোটা সংরক্ষিত করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করার প্রস্তাব এসেছে, সেখানে শুধু নারী কর্মকর্তারাই কাজ করবেন। এখন আর নারীদের পরিচয় তাদের অন্তর্ভূক্তি হিসেবেই নয়- সর্বক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভূক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী পুলিশ আজ ট্রাফিক পুলিশ, ডিটেকটিভ পুলিশ, বে-আইনি সমাবেশ ভঙ্গের জন্য দাঙ্গা পুলিশ ইত্যাদি নানা ভূমিকায় সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। তারা তাদের ভূমিকা রাখছে, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে পাসিং আউট প্যারেডের কমান্ডার হিসেবে, পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনে আনুষ্ঠানিক প্যারেডে ডেপুটি প্যারেড কমান্ডার হিসেবে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের নারী পুলিশ আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ মিশন থেকে পূর্বতিমুর, সুদান, কঙ্গো, আইভরি কোষ্ট, লাইবেরিয়া ও কসোভোতে শান্তিরক্ষায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ভূমিকা পালনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বনন্দিত। সেখানে তারা কেউ বা ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, কেউ বা মনিটর অথবা কেউ লিয়াজো অফিসার বা স্টাফ অফিসার কিন্তু সকলের ভূমিকাই প্রশংসনীয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সব বাধাকে পেরিয়ে আজ লিঙ্গ সমতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী ওসি

হোসনে আরা বেগম ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্যান্টনমেন্ট থানার অফিসার ইন-চার্জ। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী ওসি হিসেবে যোগদান করে আলোচিত হয়েছেন তিনি। যোগদানের পর থেকেই রাজধানী ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট থানার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বললেন, আমাদের দেশের সরকার ও বিরোধীদলীয় প্রধান দুজনই নারী। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও রয়েছেন নারীরা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের প্রেরণা যোগাতে হবে। নিজের উদাহরণ টেনে ওসি হোসনে আরা বললেন, নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলে কোনও সমস্যা নেই। যেভাবেই হোক সেখানে পৌঁছানো যায়। দেখতে হবে বাধাগুলো কী আর সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে বাধা দূর করা কোনও ব্যাপারই হবে না।

পুলিশ প্রশাসনকে সিন্ডিকেট মুক্ত রাখতে হবে

পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েক কর্মকর্তা জানান, পুলিশ বাহিনী সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ায় পুলিশের পেশাদারিত্ব হ্রাস পাচ্ছে। পুলিশের আট কর্মকর্তার

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ডিকেটে জিম্মি হয়ে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। তাদের ইশারায় চলছে পোষ্টিং ও পদোন্নতিসহ প্রশাসনিক সব কর্মকান্ড। এ সিন্ডিকেটে অতিরিক্ত আইজি থেকে শুরু করে উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, সিন্ডিকেটের সদস্যরা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ করেন। তাদের খবরদারিতে অতিষ্ঠ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার একই সঙ্গে নিয়মনীতি অনুসরন না করে জ্যেষ্ঠ তালিকা তৈরী এবং ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক অনেক কর্মকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে পোষ্টিং দেয়ায় প্রশাসনে বিরাজ করছে চাপা অসন্তোষ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মন্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সিন্ডিকেটের কাছে অসহায়। এ পরিস্থিতিতে গোটা পুলিশ প্রশাসনে চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের চেয়ে রাজনৈতিক লবিংয়ের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। সংশ্লিষ্টদের অভিমত, পুলিশ বাহিনীকে দ্রুত সিন্ডিকেট মুক্ত করা না গেলে প্রশাসনে বড় ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। কোন কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পুলিশ দিয়ে তা সামাল দেয়া সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

পুলিশ কনস্টেবলদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে

পুলিশ বাহিনীতে কনষ্টেবলরা মাঠ পর্যায়ে সরাসরি জনগণের জানমালের নিরাপত্তার সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করে থাকে।এছাড়া মন্ত্রী,আমলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে এই কনস্টেবলগণ।তাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য পরিবেশ নিম্নমানের। মেঝেতে গাদাগাদি করে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বাস। দায়িত্ব বেশি এবং বেতন পাচ্ছে সর্বনিম্ন। পুলিশ কনস্টেবল যে বেতন ভাতা পায় তা দিয়ে রাজধানী কিংবা জেলা শহরে বস্তিতে থাকা এবং তিন বেলা ঠিকমত থাকা কষ্টকর। মোট পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার। এর মধ্যে ২৪ হাজার কর্মকর্তা এবং প্রায় এক লাখ কনস্টেবল। এস আই (সাব ইন্সপেক্টর) থেকে উপরে কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দূনীর্তি ও অনিয়মসহ নানাভাবে মোটা অংকের টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন। তাদের অনেকের রাজধানীতে একাধিক বাড়ি গাড়ি, ফ্ল্যাট ও ব্যাংকে টাকা জমা থাকে বেনামে। সাধারণত কনষ্টেবলদের বেতনের বাইরে কিছুই নেই। অথচ তারা ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। পুলিশ কনষ্টেবলদের টাইম স্কেল আদেশ জারি (২৫/০১/২০১০) করার পর তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে উল্টো তাদের বেতন কমে গেছে। এ আদেশ বাস্তবায়ন করলে কনষ্টেবলদের বেতন থেকে প্রতিমাসে টাকা কেটে রাখতে হবে। এ নিয়ে পুলিশ কনষ্টেবলদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ বলেন, পুলিশ কনষ্টেবলদের টাইম স্কেল অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর মতো নায্য পাওনা। সঠিক সময়ে তা দেওয়া উচিত ছিল নিম্ন বেতনভুক্ত কনষ্টেবলদের জরুরী ভিত্তিতে টাইপ স্কেলের বিষয়টি নিরসন করা প্রয়োজন।

পুরুষ চিকিৎসক দিয়ে ধর্ষিতাদের মেডিকেল পরীক্ষা অনুচিত

সাধারণভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ৩ দফায় বিশেষ আইন প্রণয়ন ও সংশোধিতভাবে প্রণয়নের ফলাফল কতটুকু ইতিবাচক। সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরুর কাছে প্রথম আলোর নারী মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীর উত্তর "বৈরি আর্থ সামাজিক অবস্থা এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, পুরুষ চিকিৎসক দিয়ে ধর্ষিতাদের মেডিকেল পরীক্ষা অনুচিত। তাঁর ভাষায় এটি দ্বিতীয় বারের মতো ধর্ষণ। আইনমন্ত্রী এ বিষয়ে আরো বলেন, আমার বিবেচনায় কোনো পুরুষ ডাক্তার দিয়ে রেপ ভিকটিমদের পরীক্ষা করানো অনুচিত। কারণ সেটাও এক ধরণের রেপ। আমাদের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার মৌলিক বিধান হলো অপরাধ প্রমাণের দায় বাদীপক্ষের আসামির নয়। এ জন্য ধর্ষণের মতো গুরুতর এবং গোপন পরীক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। তবে যথাসম্ভব মহিলা ডাক্তার দিয়েই এ ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।

উৎস ঃ নারীমঞ্চ (প্রথম আলো) ১৩ জুন, ২০০১।

রেপ ভিকটিমদের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জরুরী সেল গঠন করা দরকার

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার পরিচালক (তদন্ত) অ্যাডভোকেট এলিনা খানের সুপারিশ, ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ অন্য মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে রেপ ভিকটিমদের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ইমার্জেন্সি সেল গঠন করা দরকার। পুলিশকেও দ্রুত ওইসব ভিকটিমকে ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরী ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রহণ করতে হবে তা হলো, ফরেনসিক বিভাগে মহিলা ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা। মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ না পাওয়া গেলে ঐ বিষয়ে গাইনি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যও ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে অন্য এলাকায়ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইউনিট স্থাপন করতে হবে। কারণ,

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অসংখ্য আলামত পরীক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা ভিকটিমদের বিচার পাওয়ার পথে বড় ধরনের বাধা।

পুলিশের একজন মহিলা কর্মকর্তার অভিজ্ঞতা

রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর রোকেয়া রহমান কয়েকটি ধর্ষণ মামলা তদন্তের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, পুরুষ ডাক্তারদের দিয়ে ভিকটিমদের পরীক্ষা করার বিষয়টি একজন মেয়ে হিসেবে আমি মোটেই সমর্থন করতে পারিনা। এ ধরনের পরীক্ষা অত্যন্ত বিব্রতকর। এছাড়া অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। ওই ধরনের অপরাধ যদি বৃহস্পতিবার বিকেলে বা রাতে সংঘটিত হয় তাহলে ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে আলামত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্য সরকারি ছুটির দিনগুলোতে ও একই অবস্থা। ওইসব দিনে ডাক্তাররা থাকেন না।

তিনি বলেন, ভিকটিমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র পরিবারের। এজন্য তাদের ছবি তোলা, ডাক্তারদের গ্লাভস ও অন্যান্য মেটেরিয়াল আমাদেরই কিনে দিতে হয়। এরপর খরচ রয়েছে, পয়সা না খরচ করলে ফরেনসিক বিভাগ থেকে দ্রুত রিপোর্ট মেলেনা। এক্স-রে রিপোর্টের জন্যে দেড় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করারও নজির রয়েছে।

রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে ও লেগে যায় দুতিন মাস। কিন্তু বিশেষ আইনের ওই মামলায় ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেওয়ার বিধান রয়েছে। তাছাড়া শুধু ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ নয়, মামলার বাসস্থান ভিন্ন থানা এলাকায় হলে তাদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে রিপোর্ট নিতে হয়। এতেও রয়েছে নানা প্রতিকূলতা।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ ডাক্তার বলে রেপ ভিকটিমদের অনেকেই পরীক্ষায় রাজি হয় না

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মিজানুর রহমান ওই বিভাগটির মুখপাত্র হিসেবে নির্দ্বিধায় বললেন, "হ্যা, এখানে আমরা সবাই পুরুষ ডাক্তার বলে রেপ ভিকটিমদের অনেকেই পরীক্ষায় রাজি হচ্ছেন না। রাজি না হওয়ার অধিকার অবশ্যই তাদের রয়েছে। কারণ তাদের বলা হয়, আপনার বা তোমার কাপড় চোপড় খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করে পরীক্ষা করা হবে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার জন্য স্বাভাবিকভাবে এটা বিব্রতকর। তাছাড়া ভিকটিমরা ওই সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় থাকে এবং বিশেষত ঘটনার জন্য তাদের মধ্যে পুরুষভীতি ও কাজ করে। কিন্তু তাদের ওই মানসিক অবস্থায় যেভাবে তাদের রিসিভ করা দরকার- সে পরিবেশ বা ব্যবস্থা আমাদের নেই। আমাদের এক্সাজামিনেশন রুমটিও তেমন ষ্ট্যান্ডার্ড নয়। ইনস্ট্রুমেন্ট ও পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, আমরা ভিকটিমের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে গ্লাভস বা অন্য প্রয়োজনীয় মেটারিয়াল চেয়ে নেই, অভিযোগটি সত্য। কারণ, কলেজের পক্ষ থেকে ওই সব মেটেরিয়ালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। তাছাড়া আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে টিচিং। এরপর পোষ্টমর্টেম ও রেপ ভিকটিমদের পরীক্ষার কাজ। বাড়তি এসব কাজের জন্য আমাদের আলাদাভাবে পে করা হয়না। এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার জানা মতে, এই মূহূর্তে সারা দেশে মাত্র তিনজন মহিলা (২০০১) ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। এদের মধ্যে একজন রয়েছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে রয়েছেন একজন এবং অন্য একজন রয়েছেন বগুড়ায়। তার ভাষ্য, এই বিভাগে অত্যাধিক পরিশ্রম করতে হয় বলেই হয়তো মেয়েরা আসতে চাচ্ছেনা। রেপ

Dhaka University Institutional Repository

ভিকটিমদের প্যাথলজি পরীক্ষা সম্পর্কে তার ভাষ্য, শতকরা ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় রেজাল্ট শূন্য আসছে। কতদিনের মধ্যে আপনারা রিপোর্ট দিতে পারেন। এ প্রশ্নে তার জবাব তিন সপ্তাহ থেকে দেড় মাসের মধ্যে। কারণ ভিকটিমের বয়স পরীক্ষার প্রয়োজনে এক্স-রে রিপোর্ট এবং প্যাথলজি ও রাসায়নিক পরীক্ষা রিপোর্টের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। তিনি বলেন, রেপ ভিকটিমদের আমরা সাধারণত ইচ্ছাকৃতভাবে ফিরিয়ে দিই না। তবে একসঙ্গে পাঁচ ছয়জন ভিকটিম উপস্থিত হলে তখন পরবর্তী দিনে আসতে বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

নারী আন্দোলন জোরদার করতে হবে

প্রচলিত ধারার নারী আন্দোলন থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এখন নতুন ধারার নারী আন্দোলনের সূচনা পর্ব চলছে। নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের সমতা ও মর্যাদা বেড়েছে। এটা নারী আন্দোলনেরই অর্জন। বিগত দশকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের চাপে কিছু আইনগত পদক্ষেপ অর্জিত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে সাধারণ সমাজের সঙ্গে, সরকারি-বেসরকারি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। নারী আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করে শক্তিশালী, দৃঢ়ভিত্তিক করার, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমমনা, নারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে।

বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫)- পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নারী ও এনজিও সংগঠনগুলো বেইজিং পরিকল্পনার সুপারিশগুলোর ভিত্তিতে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপই আগামী দিনের নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি

Dhaka University Institutional Repository

করছে। ১৯৯৫-২০০০ সালের কাজের পর্যালোচনা ভিত্তিতে নারী আন্দালন তৈরি করছে একুশ শতকের নারী আন্দোলনের কর্মসূচী।

নারী আন্দোলনের অর্জন ২০০০ সালের শেষে সংখ্যাগতভাবে না বাড়লেও গুনগতভাবে বেড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রভৃতি ইস্যুতে নারী আন্দোলন চলছে। পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী সমাজ সোচ্চার রয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে। উচ্চ শিক্ষায়, প্রশাসন, ব্যবসায়, গার্মেন্টসসহ শিল্প কলকারখানায় আত্মকর্মসংস্থানে নারী আজ দৃশ্যমান।

তারপরেও নারীমুক্তি, নারী প্রগতির বিষয়ে বাংলাদেশের সমাজ মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে চলছে। নারীর ভূমিকা গৃহে, সন্তান পালনে, সেবাকাজে বেশী বলে এখনো সমাজের ব্যাপক সংখ্যক নারী পুরুষ মনে করেন। গৃহের বাইরে কর্মরত নারীর সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাদি নেই বললেই চলে। নিশ্চয়তার অভাব, নির্যাতনের শঙ্কা, চলাফেরার স্বাধীনতার অভাব, শিশু রক্ষণকেন্দ্রের অভাব, নারীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টির অভাব, নারীর অর্থনৈতিক সমতায়নের পথে বাধা হিসেবে রয়েছে। বাংলাদেশের নারী সমাজ এসব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তৃণমূল পর্যন্ত নারী আন্দোলন প্রসারিত করে চলেছে।একুশ শতক হয়ে উঠবে সমতার যুগ সেটাই নারী আন্দোলনের প্রত্যাশা।

বিজ্ঞাপনী মাধ্যমে পণ্য হিসাবে নারীর মর্যাদাহানি রোধ করতে হবে

বিনোদন ও সংস্কৃতি শিল্প সাধারণভাবে নারী ও তার শরীরকে অত্যন্ত খোলামেলা ও নগ্নভাবে পণ্যে রূপান্তরিত করে। বিজ্ঞাপনী শিল্প যৌনতাকে নিয়ে গিয়েছে এক নূতন ও অভূতপূর্ব শিখরে। বাণিজ্যের নামে বিকৃত প্রদর্শনী হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

নারীদেহের। এটি সম্ভব হয়েছে প্রমোদ উৎসব ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। আগে একটি পণ্য বিক্রির জন্য যৌন আবেদন ব্যবহৃত হতো। আজকাল যৌন আবেদন কোনো একটি পণ্যের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে, যাতে স্বয়ং পণ্যটিই যৌনতার উস্কানি দিতে সক্ষম হয়। পণ্য স্বয়ং যৌনতাপূর্ণ হয়েছে। মানব যৌনতাকে ইতঃপূর্বে সম্ভবত আর কখনই এতটা নির্মম শোষণের বলি হতে হয়নি। অতএব অবাক হবার কিছু নেই যে, অবকাশ ও আপ্যায়ন শিল্প এর ভোক্তাদের সকল যৌনজ খোশখেয়াল ও বিলাসবাসনা সরবরাহ করে। বহুজাতিক সংস্থাসমূহ, যেমন- কোকাকোলা, পেপসি, ভার্জিন, লিভারব্রাদার্স, এসি-আই, বার্জার পেইন্টস, নোভার্টিস / সিনজেন্টা, জনপ্লেয়ার নারীকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের পথিকৃৎ প্রতিনিধি।

নারীর সনাতনী জীবনধারায় পরিবর্তন

বাংলাদেশের নারী সস্তা ও বাধ্য শ্রমিক হিসেবে আন্তর্জাতিক মনোযোগের পুরোভাগে এসেছে। তারা তাদের জীবনে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেবার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম কীভাবে তাদের আয়ের টাকা খরচ করবে, কীভাবে কাকে বিয়ে করতে হবে, কোথায় কাজ করতে হবে ইত্যাদি। তরুণ বাংলাদেশী হাজার হাজার নারীরা বাড়ি ছেড়ে শহুরে বস্তি জীবনে, কোম্পানির বোর্ডিংএ কিংবা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের ঘিঞ্জি করে বসবাস শুরু করেছে। শ্রমবাজারে নারীর অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ তার ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে এবং সেইসূত্রে গৃহস্থালি পর্যায়ে নারীর মত প্রকাশ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা (Bargaining Power)

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িয়েছে। দরিদ্র গৃহস্থালিতে বাড়তি আয়ের মাধ্যমে এটি দারিদ্র দূরীকরণেও অবদান রাখছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে নারীর মর্যাদার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। শহরাঞ্চলে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা আর গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসমূহ চালু হবার ফলে নারীর গতিশীলতা (mobility) ও জনসমক্ষে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ব্যাপকভাবে তারা অপ্রচলিত পেশায় প্রবেশ করেছে।

বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়ন রোধ করতে হবে

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়ন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর লক্ষণ বলছে এটি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সংগঠিত চক্রগুলো ক্রমবর্ধমান হারে দেশের সীমান্তে নারী কেনাবেচা চালিয়ে যাচ্ছে। দুবাই, পাকিস্তান, ভারত আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের নারী বিক্রি হয়।

জাতিসংঘ এবং বিবিধ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় গণমাধ্যম প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, নারী পাচার, নারী বিক্রি, পতিতাবৃত্তি এবং পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী যৌন বাণিজ্যের শিকার হচ্ছে। সন্দেহাতীতভাবেই বাংলাদেশী নারীদের নিয়ে যৌন বাণিজ্যের এই প্রসারের কারণ যৌন পর্যটনের আন্তর্জাতিকীকরণ। মানবাধিকার কর্মীদের হিসেব মতে, প্রতিমাসে অন্তত ২০০ থেকে ৪০০ নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। ১৯৯৫ সালের ইউনিসেফ (UNICEF) প্রতিবেদন "জাতিসমূহের অগ্রগতি"-তে পাওয়া যায়, প্রায় ৪০,০০০ বাংলাদেশী শিশু পাকিস্তানে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত আছে। আরও ১০,০০০-১২,০০০ আটকা আছে

Dhaka University Institutional Repository

মুম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের পতিতালয়ে। আর এই অংক ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বেড়েই চলেছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৯৫ সালে বাইরের দেশে পাচারকালে ১৩৫ জন শিশু এবং ৯৩ জন নারী উদ্ধার করা হয়।

জাতীয় ও আন্তজার্তিক দায়দায়িত্ব এবং নির্যাতন রোধে আইনগত বিধান সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে

নির্যাতন বিষয়ক যে কোন পর্যালোচনা এ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইনগত প্রেক্ষিত আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ ও দেশীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী সকল নাগরিককে যাবতীয় অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের সংবিধান কোন প্রকার নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, অবমাননাকর ও লাঞ্ছনামূলক আচরণ বা শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। দেশীয় আইনেও এই ধরণের আচরণকে দণ্ডনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফৌজদারী আইন, দণ্ডবিধি, সাক্ষ্য আইন, পুলিশ আইন, মেট্রোপলিটন অর্ডিন্যান্স এবং পুলিশ রেগুলেশন। অপেক্ষাকৃত উল্লেখ্যযোগ্য আইনটি হচ্ছে ২০০০ সালে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। এ সকল রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়াও বাংলাদেশের অনুমোদিত বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলে নির্যাতন ও অবমাননাকর আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য নির্যাতন ও সবধরণের নিষ্ঠুর, অবমাননাকর এবং লাঞ্ছনামূলক আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশন (CAT), নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংবলিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ICCPR ও ICCPR-এর অপশনাল প্রটোকল, নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশ আইন,

Dhaka University Institutional Repository

শাসন ও বিচার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা দেশের ভেতর সংঘটিত যে কোন নির্যাতন প্রতিরোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই আইনবলে কোনো রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা জরুরি অবস্থা বা যুদ্ধজনিত কারণ দেখিয়ে নিপীড়নের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে পারবেনা। CAT এবং ICCPR-এ দেয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে জাতি সংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক।

পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষেই কেবল পুলিশের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়া সম্ভব। পুলিশ বিভাগের জবাবদিহির ক্ষেত্রে এই অনুমতির বিধান একটি বড় প্রতিবন্ধক। পুলিশ তদন্তের দীর্ঘসূত্রতা ও ডাক্তারি পরীক্ষার বিদ্যমান পদ্ধতি এমনিতেই কাজে বাধা সৃষ্টি করে। তার ওপর এই প্রক্রিয়াকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকায় পরিস্থিতি আরও বিপত্তিকর হয়। ফৌজদারী বিচারে প্রচুর সময় লাগে, সে কারণে নির্দিষ্ট কোনো বছরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কি কি প্রতিকার হয়েছে, তার হিসাব রাখা কষ্টসাধ্য। খবরের কাগজের রিপোর্ট ও পুলিশের কাছ থেকে অনুসন্ধানমূলক তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ও আদালতের কার্যপ্রণালি অনুসন্ধান করে আসক ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনার অগ্রগতি বা ধীরগতি মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়। তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অপরাধীর হুমকির মুখে অত্যাচারিতদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই। আর আইন প্রয়োগের পদ্ধতি অত্যন্ত ধীর হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হবে

সাংবিধানিক নিরাপত্তা ও পুলিশ রেগুলেশনস পরিপন্থী পুলিশের অসহনীয় নিপীড়নের ঘটনা অসংখ্য ভুক্তভোগীর ভাষ্যে প্রমাণীত। এসব ঘটনার বিরামহীন পুনরাবৃত্তি ও তা রোধে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার পেছনে রাজনৈতিক মদদকে দায়ী করা হয়, যা পুলিশের পেশাদারিত্বকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আরও একটি বহু প্রচলিত অভিযোগ যে, পুলিশ প্রশাসনের সাথে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল ও অপরাধী চক্রের যোগ সাজশ থাকায় আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হয় না। প্রশাসনের বক্তব্য হচ্ছে, অপরাধীরা যেখানে সশস্ত্র এবং ভীষণভাবে প্রতিরোধে সক্ষম, সেখানে গ্রেফতারের সাধারণ পদ্ধতি নিতান্তই অকার্যকর। ফলে আত্মরক্ষার খাতিরেই পুলিশকে আক্রমনাত্মক হতে হয়। তাদের ভাষ্য হচ্ছে, গ্রেফতার পরবর্তী অবস্থায় তথ্য আদায়ের জন্য নিপীড়ন করা প্রয়োজন।

অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনকে একটি কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র অনেক পিছিয়ে আছে। কিছু ক্ষেত্রে অত্যাচার ও নিপীড়নের অভিযোগে অফিসারদের ক্লোজ বা সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান কমিটির প্রাপ্ত তথ্য সাধারণকে জানানো হয় না। এই ঘটনাগুলো কখনো সংসদে আলোচিত হয়না। ফলে সংসদ এ সকল ব্যাপারে ভূমিকা রাখে না। তবে সংবাদ মাধ্যম রিপোর্ট লিখে ও সম্পাদকীয় ছেপে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তবে জাতীয় সংসদকেও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

অভিযুক্ত ও নির্যাতনকারী পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ কঠোর হওয়া উচিত

আইন ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে পুলিশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রচলিত সাজা পদ্ধতি হলো দোষী পুলিশ অফিসারকে "ক্লোজ" করা। এর দ্বারা তার অধিকৃত পদ থেকে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, যা তার চাকরির ফাইলে রেকর্ড করা হয়।

অপরাধের পুনরাবৃত্তি এই ব্যবস্থার কার্যকারিতার বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে। এর পরিবর্তে যদি কঠোরতর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, যেমন- সুবিধাদি বা পদোন্নতিকে ব্যাহত করা না হয় তবে বর্তমান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুলিশী নির্যাতন কমানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অন্যায়ের ক্ষেত্রে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। অবশ্য বহু বছর যাবৎ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী না হওয়ায় জনগণের মধ্যে সরকারের যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের সততার প্রতি সন্দেহ জাগে। যেহেতু বেশির ভাগ রিপোর্টই জনগণের গোচরে আনা হয় না এবং জনগণকে প্রকৃত ঘটনা জানতে না দেয়ার কারণে জনমনে আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

গ্রেফতারকালে পুলিশ কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষ এবং এমন সব তথ্য সূত্রের ওপর নির্ভর করে, যা অনেক সময় নির্ভরযোগ্য হয় না। সম্ভবত গ্রেফতারকারী পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা বা অতর্কিত আক্রমনের আশঙ্কায় পুলিশের গ্রেফতার পদ্ধতি বেশ ক্ষিপ্ত ও কঠোর হয়। সমাজে জনপ্রিয়তার অভাব তাদের নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হতে পারে। কেননা প্রায়শই তাদেরকে রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষকের ভূমিকাতেই বেশি দেখা যায়। কারণ যাই হোক অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজনদের

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতারের বর্তমান পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, মানবাধিকারের প্রতি অনুভূতিশীল হওয়ার জন্য পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, যাতে তারা পেশাগত দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন না করে।

নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতি

পুলিশের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি থাকলেও এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই হয়ে ওঠে প্রধান। একদিকে ক্ষমতাসীন সরকার তাদের দলীয় স্বার্থে এসব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধেও বিরাট অংকের উৎকোচ দিয়ে পদোন্নতি নেওয়ার এবং পছন্দের থানায় বদলি হওয়ার সুযোগ নেয়ার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। খোদ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বিধি বিধান লঙ্ঘন করে নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতি দেওয়ার কারণেই পুলিশ বিভাগের স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়, ফলে এ বাহিনীর সেবার মানও হ্রাস পায়। দেশে পুলিশের নিয়োগ হয় তিনটি স্তরে। এর মধ্যে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে এএসপি, পুলিশের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়। গত এক যুগ ধরেই এই তিনটি পদেই নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সুতরাং পুলিশের নিয়োগ, বদলী পদোন্নতি এগুলো বিধি বিধান অনুযায়ী হতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা বা কোন ধরণের হস্তক্ষেপ পুরোপুরি বন্ধ হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি দলের লাঠিয়াল পরিচয় দূরীভূত করতে হবে

পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে আরেকটি বড় অভিযোগ হচ্ছে, এ উপমহাদেশের মানুষদের মুক্তির সংগ্রাম নস্যাৎ করতে ব্রিটিশ শাসকরা যেভাবে পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে, দেড় শতাধিক বছর পরেও স্বাধীন বাংলদেশের সামরিক স্বৈরাচার ও গণতান্ত্রিক নির্বিশেষে সবাই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পুলিশকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করেছে। এসব সরকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে তথাকথিত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধ মতের নেতা-কর্মীদের হয়রানি, হেনস্থা ও নির্যাতন করতে এই বাহিনীকে লাঠিয়াল হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ দলীয়করণের যাঁতাকালে পড়ে পুলিশ সরকারি দলের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে জিম্মি হয়ে যায়। সরকারের পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়।

কিন্তু সরকারি দল ক্ষমতা হারিয়ে যখন বিরোধী দলে পরিণত হয় তখন তারা নিজেরাই আবার নাকাল হয় পুলিশের হাতে। কারণ ক্ষমতা বদলের সাথে সাথেই বদলে যায় পুলিশের আক্রমনের লক্ষ্য। যেমন- ১৯৯১-৯৬ সালের বিএনপি সরকারের স্বারষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী ক্ষমতা ছাড়ার কিছুদিন পরই পুলিশের পিটুনির শিকার হয়েছিলেন। ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামীলীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমও ক্ষমতা ছাড়ার পর পুলিশের পিটুনির শিকার হয়েছিলেন।সুতরাং পুলিশ যাতে সরকারের সেবক না হয়ে জনগণের সেবক হয় সেদিকে সরকারকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

নারীদের নিরাপত্তা হেফাজতের নামে স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার ও আটকাদেশ থেকে রক্ষা করতে না পারা একটি রাষ্ট্রের জন্য ব্যর্থতাই বটে। জনগণের জন্যও এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পুলিশ কর্তৃক যথেচ্ছ গ্রেফতার এবং কারাবাস দেয়াটা

Dhaka University Institutional Repository

দেশের শাসক ও শাসন ব্যবস্থার একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, ব্যাপক মাত্রায় ঘটনাগুলোর জন্য মুখ্যত দায়ী বিভিন্ন নির্বতনমূলক আইন এবং সেসব আইনের অপব্যবহারের বিস্তর সুযোগ। এই আইনগুলো রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এ ধরণের পুলিশী বাড়াবাড়ি কমানো এবং ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো প্রতিহতও করা যেতো। তবে আশংকার কথাটি হচ্ছে, এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় গিয়ে এ সব আইনের সংশোধন বা বাতিলের ব্যাপারে কোনো আন্তরিক পদক্ষেপ নেয়নি বা ভবিষ্যতেও নিবে এমন কথা বলা যায় না।

সুতরাং পাচারকৃত, অপহৃত প্রতিবন্ধী বা যে কোন ধরণের উদ্ধারকৃত নারী বা মেয়ে শিশু, পুলিশ যাতে উদ্ধারের পরে তাদের পরিবারের কাছে দ্রুত হস্তান্তর করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিরাপত্তা হেফাজতে প্রেরণের থেকে সেটা বোধ হয় অনেক বেশী মানবিক।

পুলিশ ও নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত এর সমাধান জরুরী

একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখনো পুলিশ বাহিনীর জন্য যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করেনি। নিম্ন মানের অবকাঠামোগত সুবিধা, অপ্রতুল জনবল, সেকেলে অস্ত্র-শস্ত্র, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের যানবাহন, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, বেতন, আবাসন, রেশন ইত্যাদি, এর ওপর রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবহার ও চাকুরির অনিশ্চয়তা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবে ও অনেক সময় পুলিশ অত্যাধুনিক অস্ত্রধারীদের সঙ্গে পেরে উঠে না বা ধরতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

তাই উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই দরকার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। অবশ্য বর্তমান আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট পুলিশ বিভাগের সকল সদস্যদের জন্য পূর্ণ রেশন সুবিধা প্রবর্তন করেছে।

নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করতে হবে

মূলত তিনটি নিবর্তনমূলক আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমেই পুলিশ স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার করে থাকে। আইনগুলো হচ্ছে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন, ২০০০ সালে প্রণীত জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন যা ২০০২ সালে বাতিল করা হয় এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (সি আর পিসি) এর ৫৪ ধারা (পরবর্তী সময়ে ৫৪ ধারা হিসাবে উল্লেখকৃত)।

৫৪ ধারার ব্যাপক অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের গ্রেফতার এবং বিভিন্নরকম হয়রানিমূলক ঘটনার মধ্য দিয়ে। বিরোধীদল ঘোষিত হরতালের আগের দিন এবং হরতাল চলাকালে ব্যাপক ধরপাকড় চালানো হয় ৫৪ ধারার মাধ্যমেই। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে গ্রেফতারের দু-একদিন পর বা হরতাল শেষ হয়ে গেলে অনেককে ছেড়েও দেয়া হয়ে থাকে। আবার পুলিশ শুধু (লক আপে পুরে রাখার মাধ্যমে) টাকা আদায় করার জন্যও ৫৪ ধারায় নিরীহ নিরপরাধী দরিদ্র জনগণকে গ্রেফতার করে। পরে আর্থিক সঙ্গতি বুঝে গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন ৫০-৬০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করে ছেড়ে দেয়। অনেকেই একে ৫৪ ধারায় চাঁদাবাজি বলে অভিহিত করেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশে গুন্ডা-পান্ডা বদমায়েশদের পাশাপাশি আইনের

Dhaka University Institutional Repository

পোশাকধারী বেশ কিছু পুলিশ সদস্যের নামও চাঁদাবাজ হিসেবে পত্র-পত্রিকার পাতায় ছাপা হতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পুলিশের শাস্তি হয় না।

২০০১ সালের পহেলা জুলাই ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক রির্পোটে উম্মোচিত হয় যে, ঢাকা মহানগরীর মোট ২২টি থানার মধ্যে ১১টিতে বছরের (২০০১) মধ্যভাগ পর্যন্ত মোট ১৭,৩৩৮ জন ব্যক্তি কারাবন্দি ছিলেন। এদের সবাইকেই সি আর পিসির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রতিটি বন্দির ক্ষেত্রে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানালেও মাত্র ৬,৫০৩ টি রিমান্ডের আবেদন আদালত কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়। অতএব, নিবর্তনমূলক আইন সমূহ বাতিল করতে হবে এবং ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশে কর্মরত সকল মানবাধিকার সংগঠন এবং সচেতন মানুষের জন্য দেশের সাম্প্রতিক পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সংখ্যাগত দিক দিয়ে নির্যাতনের ঘটনার হার যেমন বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত, তেমনিই যেন এই নির্যাতনের ধরনও ক্রমশ ধারণ করছে এক জটিল রূপ। ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের মতো নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শিশু ধর্ষণ, নারীকে জোরপূর্বক এবং প্রতারণার মাধ্যমে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার মতো সুকৌশলী অপরাধ। কম সময়ে নারী নির্যাতনের সর্বকালীন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিবাদ, প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও যেন কার্যকরভাবে এ সমস্ত অপরাধ দমন করা যাচ্ছে না।

এ নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। সাধারণভাবে তরুণ সমাজের সামনে আদর্শ নেতৃত্বের অভাব, আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিরাপত্তাবোধ, রাজনৈতিকভাবে সন্ত্রাস লালন ও আইন প্রয়োগে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা এ সমস্ত কিছুকেই দায়ী করা যায় এর কারণ হিসেবে। এছাড়াও প্রশ্ন জাগে বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে। বিচার চেয়ে বিচার না পেয়ে বরঞ্চ অধিকতর নিগৃহীত হওয়ার অভিজ্ঞতা খুব বিরল নয়। তার ওপর রয়েছে আইন এবং কারো ব্যক্তিক বা মানসিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা। আরো একটি বড় কারণ হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে নির্যাতনের বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াতে না দেয়া। নির্যাতিত নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

বরং সালিশের মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চান অথবা ফেলতে বাধ্য হন। অপরাধ দমনে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে কোন কারণটি প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় ; তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আইন ও অধিকার সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট জোর দিয়ে থাকেন। এই আইনে এমন কতগুলো অপরাধ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা কেবল নারীর বিরুদ্ধেই সংঘটিত হতে পারে। তবে অপরাধী নারী অথবা পুরুষ যে কেউই হতে পারেন এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই আইনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আজ মেয়েরা ঘরের বাইরে আসছে, কাজের জন্যে, শিক্ষার জন্য, তার বিকাশের জন্যে। সমাজ বা রাষ্ট্র (পুলিশ বাহিনী) তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে কি না, সেটা আমাদের দেখতে হবে। ঘরের ভেতর থাকলেই কি কেউ নিরাপদ থাকে ? না, সেটা প্রমাণ হয়নি। ফলে ঘরের বাইরে আসা না আসার বিষয় নিয়ে খামাখা বির্তক করা ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্য কোন সমাধান নয়। মূল কথা হচ্ছে সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, যেন তাকে কেউ ভোগের বস্তু মনে না করে। আর ধর্ষণ যারা করে তাদের জন্যে যারা উস্কানীমূলক কাজ করে অর্থাৎ পর্ণো পত্রিকা, পর্ণো ছবি এমনকি আজকাল সাধারণ পণ্যের যেসব অশ্লীল বিজ্ঞাপন হয় তা বন্ধ করতে না পারলে এই জঘন্যতম অপরাধ বন্ধ হবে বলে মনে হয় না।

কাজেই ধর্ষণের প্রশ্নে শুধু ধর্ষণের শিকার নারীকে ঘরে ঢুকিয়ে নয়, ধর্ষণের পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী সকল সংগঠন ও ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে নিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তারা বুঝতে অক্ষম যে, জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বা আক্রমন করা তার কাজ নয় এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে আশংকা হচ্ছে, এ ধরণের কর্মকর্তারা নিজেদের শাসক শ্রেণীর দাবার ঘুঁটির বেশি কিছু ভাবতে পারেন না। হীণমন্যতায় আক্রান্ত এই কর্মকর্তারা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন না। এহেন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঘাটতির সৃষ্টি হয়, যা সভ্য সমাজের জন্য বিপজ্জনক। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য যদি এই রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাহায্যকারী ভূমিকা সম্পর্কে আমরা অবহিত না হই। এই সংস্থায় যোগ্য ও প্রকৃত উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়োগ জনসেবার বোধ ফিরিয়ে আনতে পারে। যারা ক্ষমতাধরদের সন্তুষ্ট করে পুলিশ কর্মকর্তা হচ্ছেন তারা নিঃসন্দেহে প্রথম থেকেই প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গী মনোভাবাপন্ন তিক্ত ব্যক্তি হিসেবেই কর্মজীবন শুরু করছেন। তিক্ত ব্যক্তিরা যখন স্বাধীনতা খর্ব বা সংকীর্ণ করার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন নিঃসন্দেহে তা সুস্থ আবহ সৃষ্টি করেনা।

এই কর্মকর্তারা প্রথম সুযোগেই তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ পুষিয়ে নেওয়ার হিসাব-নিকাশ করেন এবং এরপর লোভ-লালসার-নীতিহীনতা আর তাদের বিবেককে আঘাত করেনা। নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের বিষয়টি তখন তামাশা মনে হয়। এজন্যই আমাদের থানাগুলোয় জনগণের কথা শোনা এবং ন্যূনতম সাহায্য করার লোক পাওয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, লোকে পুলিশের কাছে বিপদগ্রস্তও মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হলেই আসে এবং তখন তারা সহানুভূতি ও সাহায্য আশা করে। অসৎ পন্থায় নিয়োগকৃত পুলিশ কর্মকর্তারা সহানুভূতিশীল হয়ে সাহায্য করবেন এরকম সম্ভাবনা খুবই কম। এই কর্মকর্তারা রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করতে সচেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। এদেরই এক অংশ রাজনৈতিক প্রতিবাদ মোকাবেলায় বেআইনি সহিংসতায় লিপ্ত হন যার বাস্তব আলামত আমরা এখন দেখি। রাজনৈতিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মোকাবেলায় পরিণত ও ভারসাম্যমূলক আচরণ নিশ্চিত করতে হলে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার নির্দেশ থাকতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সামাজিক রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার গতিময়তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

বহু মতের সমাজে অর্থাৎ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়লে, শাসনতান্ত্রিক লক্ষ ও অধিকার অর্জনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য এ বোধ পুলিশ বাহিনীতে নির্বাহী পর্যায়ে ব্যাপক। পুলিশকে সিস্টেমের সেবা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এই জটিলতা ও স্পর্শকাতর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার আবহ সৃষ্টি করতে হবে। যতক্ষণ না এটা সঠিকভাবে বোঝা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ একটা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিপক্ষীয় ভূমিকায় থেকে যাবে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ প্রতিরোধ মোকাবেলায় পুলিশকে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর মতো নির্বিচার ব্যবহার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধবংস করবে এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

সরকারকে সাহায্য ও সমর্থন করাই আমাদের পুলিশের প্রধানতম কাজ বললে ভুল হবে না। আর তাই অপরাধীর তুলনায় বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আমাদের পুলিশ কর্মকর্তারা এ পরিস্থিতিতে আইন বা জনমতের তুলনায় উপরস্থ কর্মকর্তার প্রতি বেশি আজ্ঞাবহ ও দায়বদ্ধ থাকেন। এ অবস্থায় সমাজ ও পুলিশের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় না। পুলিশকে

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণ একটা নতজানু প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরপেক্ষতা দেখা যায়নি।

কঠিন পদ্ধতিতে নির্বিচারভাবে যেসব পুলিশ কর্মকর্তা কাজ করেন, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের চাহিদা বেশি। বে-আইনিভাবে কাজ করলেও যেহেতু সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন হয় তাই তারা ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হন। আইনী বা নিয়ন্ত্রিত আচরণকে দূর্বলতা বা অদক্ষতার সমার্থক মনে করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের হাতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আইনি নিয়ন্ত্রণে থেকে সভ্য আচরণ কেউ পুলিশের কাছে চায় না।

সমসাময়িক বাংলাদেশে একজন পুলিশ কর্মকর্তার একটা বিরোধী ভূমিকা আছে যা প্রকৃতপক্ষেই সত্যবর্জিত নয়। কর্মক্ষেত্রে, মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে তাকে বেআইনি মৌখিক নির্দেশ মানতে হয় এবং বলা বাহুল্য, সেগুলো জনস্বার্থবিরোধী। জনগণের আশানুরূপ কাজ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব পালন এ দুই কাজের মধ্যে সমন্বয় বা ভারসাম্য রাখতে গিয়ে তাকে ভীষণ চাপের মধ্যে থাকতে হয়। এ ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যখন বিপরীতমুখী চাপের ফলে একটি কাজ করতে গেলে আরেকটি কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে স্রেফ অর্থ সম্পদ বা সম্পর্কের জোরে অপরিণত ব্যক্তিদের পক্ষে রাজনীতির মধ্যগগণে বিচরণ করা অস্বাভাবিকতা বলে বিবেচিত হয় না। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশে ঘটনাচক্রে বেশ কিছু ছোট মাপের মানুষ জাতীয় দায়িত্বের আসনে নিক্ষেপিত হয়েছেন যাদের পক্ষে দূরদর্শিতা প্রদর্শন বা সামাজিক গতিময়তা

Dhaka University Institutional Repository

বোঝা কষ্টকর। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে পুলিশকে নিয়ন্ত্রিত আচরণে অভ্যস্ত করা কঠিন হবে।

শতাব্দী প্রাচীন একটি পুলিশ সংগঠনের সংস্কার কোন সহজ কাজ নয়। সংস্কার কার্যক্রম এমন কিছু নয় যা রাতারাতি বাস্তবায়ন করা যায় এবং এ থেকে তাৎক্ষনিক ফলাফলও আশা করা উচিত নয়।

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর (PRP) প্রথম পর্যায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে যা ইতোমধ্যে সংস্কারের কার্যকর ভিত রচনা করেছে। এজন্য দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আগ্রহে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম পর্বের চলমান কর্মসূচীর সাথে বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০০-২০১০ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে ৬ (ছয়) টি অপারেশনাল আউটকামের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে পুলিশের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, আধুনিক আইনগত কাঠামো, জবাবদিহিতা ও ভবিষ্যত দিক নির্দেশনার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। পুলিশের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো শক্তিশালী হবে এবং অধিকতর যোগ্য ও পেশাদার পুলিশ তৈরিতে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু মামলা পরিচালনার মাধ্যমে সবার জন্য ন্যায় বিচারের পথ সুগম হবে। নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ সমাজের নারী ও শিশুদের সমতা ভিত্তিক ও সংবেদনশীল সেবা প্রদানে সক্ষম হবে এবং এদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করবে। ব্যয় সাশ্রয়ী, ফলপ্রসু ও স্থায়ী তথ্য যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ সমাজকে উন্নত সেবা দিতে সক্ষম হবে। আর এ লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০১৪ পর্যন্ত এই ৫

Dhaka University Institutional Repository

(পাঁচ) বছরে পুলিশ সংস্কার কর্মসুচীর মোট ২১৩.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন লাভ করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম ক্ষেত্র নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ তিন হাজার নতুন নারী পুলিশ নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পিআরপির উদ্যোগে Bangladesh Police Women Network (BPWN) International Association of Women Police (IAWP) এর সদস্যপদ লাভ করেছে। প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করা হয়েছে জেন্ডার গাইড লাইন এবং ঢাকায় তেজগাঁও থানা কমপ্লেক্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের একমাত্র ভিকটিম সার্পোট সেন্টার। আগামী পাঁচ বছরে অবশিষ্ট বিভাগীয় শহরগুলোতে ৫ (পাঁচ) টি নতুন ভিকটিম সার্পোট সেন্টার চালু করা হবে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে প্রবর্তিত রেফারেল সার্ভিস পুলিশ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র ভুক্তভোগী মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথকে প্রশস্ত করবে।

আধুনিক পুলিশিং মূলত তথ্য উপাত্ত কেন্দ্রীক ব্যবস্থাপনা। ইন্টিলিজেন্স নির্ভর পুলিশিং এর পরিচালনা এবং কৌশলগত সাফল্য মূলত নির্ভর করে তথ্যের সঠিক এবং সময়ানুগ প্রাপ্তির উপর। ক্রম পরিবর্তনশীল তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে অপরাধ দমন এবং প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিআরপি প্রথম পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। অপরাধ ও সন্ত্রাস দমন এবং সনাক্তকরণে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টিলিজেন্স এর ব্যবহার সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

পিআরপি এবং বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ পুলিশ শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও জনগণকে তার কাঙ্খিত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে পুলিশের সেবার মান কিছুটা হয়তো বেড়েছে। কিন্তু সেবার মান বাড়লেও সাধারণ মানুষের হয়রানি কমেনি। এখনো মানুষ থানায় গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কার করে পুলিশকে জনগণের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এতো চেষ্টার পরও সাধারণ মানুষের মনে পুলিশ স্বচ্ছ কোন জায়গা তৈরি করতে পারছে না। এ কথা পুলিশের নবীন আইজি নূর মোহাম্মদ প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। আইজি নূর মোহাম্মদ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বলেছেন, পুলিশের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সব চাহিদা হয়তো সব সময় পূরণ করা সম্ভব হয় না। তবে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে কোনো নিয়মনীতি মানতে হয় না। কিছু অসৎ পুলিশ সদস্যের কারণে গোটা পুলিশ বাহিনীর অনেক বদনাম হয়েছে। এখন সুযোগ এসেছে পুলিশকে জনগণের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গড়ে তোলার। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি আইজি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশ বাহিনীর অতীত বদনাম ঘোচাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে অসৎ পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। থানাগুলোতে মানুষের সেবার জন্য নেওয়া হচ্ছে নানান পদক্ষেপ। তবে এর ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হলেও হয়রানি বিন্দুমাত্র কমেনি। যে কোন থানায় মামলা করতে গেলেই বোঝা যায় পুলিশ হয়রানি কাকে বলে ? দফায় দফায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার পিছনে

Dhaka University Institutional Repository

ঘুরতে হয়। ঘুষ দিতে হয়। তারপরও কাজ হাসিল করা দূরহ। এই বিষয়গুলো আইজির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। পুলিশের নিত্য নৈমিত্তিক আচরণ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। পুলিশের অশোভন এবং অসৎ চিন্তা-চেতনার জন্য তিনি নিজেও দুঃখিত।

(টিআইবি রিপোর্ট ২০১০) অনুযায়ী বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খাতের মধ্যে পুলিশ বিভাগ সবচেয়ে বেশি দূর্নীতিগ্রস্ত। এর পরেই জনপ্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও বিচার বিভাগ। জরিপে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সরকারই দূর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এরপর তাদের আস্থা গণমাধ্যমের ওপর। প্রতিবেদনে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, দূর্নীতি বিরোধী অভিযানে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে সরকারি নেতৃত্ব। দ্বিতীয় নির্ভরতার ক্ষেত্র গণমাধ্যম। শতকরা ১৫ দশমিক ২ শতাংশ উত্তরদাতা এই নির্ভরতার কথা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে ও বিশ্বের ৮৬টি দেশের প্রায় এক লাখ মানুষের ওপর পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে ০৯/১২/২০১০ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলন এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম হাফিজউদ্দিন খান, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমদসহ টিআইবির কর্মকর্তারা। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ড. ইফতেখারুজ্জামান।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জরিপে সাধারণ মানুষদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। ডঃ ইফতেখারুজ্জামান জানান, গত এক বছরে(২০১০) দূর্নীতির মাত্রা বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন পুলিশ সবচেয়ে বেশি দূর্নীতিগ্রস্ত। গত ৯ মাসে (২০১০) দেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক দল, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সংসদ, গণমাধ্যম, বেসরকারি খাত, সামরিক বাহিনী, এনজিও এবং ধর্মীয় সংগঠন-এ ১১টি খাতের সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান জানান, গত এক বছরে (২০১০) দূর্নীতির মাত্রা বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৯ শতাংশ রাজনৈতিক দলকে সবচেয়ে বেশি দূর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন। তবে বাংলাদেশের ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা পুলিশকে সবচেয়ে বেশি দূর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলতঃ পুলিশ বাহিনীতে নৈতিকতার অবক্ষয় একদিনে সৃষ্টি হয়নি। আইজি কিংবা কমিশনার সাংবাদিকদের কলমের জোরের কথা বিবেচনা করে তাদের সাথে হাসি মুখে কাঁচা পাকা কথা বলে যতোই জনপ্রিয় হতে চেষ্টা করুক না কেন, বাস্তবতা সম্পর্কে সবাই বিজ্ঞ। যখনই যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকারই পুলিশকে দলীয়করণ করেছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করলেও তাদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। দক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হলে পুলিশের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। বিশেষত পুলিশের নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন ভাতা। পর্যাপ্ত বেতন সুবিধাদি থাকলে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে

Dhaka University Institutional Repository

অপব্যবহার করে ঘুষ খাওয়ার প্রবণতা কিছুটা হলেও কমবে আশা করা যায়। আরেকটি বিষয় হলো মনুষ্যত্ব বোধ। পুলিশের মধ্যকার হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করতে হবে। এর জন্য যা করা দরকার সরকারকে অবিলম্বে তাই করতে হবে। জানা যায়, পুলিশের সেবার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে ডিএমপির ৩৩ থানার ডেলিভারী সার্ভিস সেন্টার, ওপেন হাউজ ডে ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য ওয়ান স্পট সার্ভিসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। জনগণের অহেতুক ভোগান্তি হ্রাসের জন্য এ সকল নিত্য নতুন পদ্ধতির অবতারনা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে হয়রানি থেকে পুলিশ সদস্যদের নিবৃত্ত রাখতে ডিএমপির সব পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা। বিনা কারণে গ্রেফতারের মাধ্যমে নিরীহ জনগণকে অযথা হয়রানি করা তাৎক্ষনিক ভাবে জড়িত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ধরণের ঘটনায় শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্য, থানার ওসি, এবং সুপারভাইজিং অফিসারকে।

যা হোক আমাদের প্রত্যশা থাকবে পুলিশ সত্যিকার অর্থেই জনগণের বন্ধু হোক। পুলিশ হোক শান্তির প্রতীক এবং পুলিশের একমাত্র ব্রত হোক অসহায় মানুষের সেবা।

সর্বশেষে, এটা প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় যে, পুলিশ কর্মকর্তাগণেরও একজন সাধারণ ব্যক্তির মত অধিকার রয়েছে এবং তাঁরাও বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের আরও প্রয়োজন কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং কার্যকরভাবে মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ এবং সম্পদ। অবশ্য বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে লক্ষনীয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের অনেক ক্ষেত্রেই এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় উল্লেখিত হয় না। যদিও পুলিশ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে গণমানুষের বেশ কিছু প্রথাগত এবং ভুল ধারণা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাঁদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারেন না, বরং তাঁদের অবশ্যই নিজ নিজ আচরণের মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং এর সুরক্ষায় সহায়তা করা উচিত। পুলিশ সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর মানসিকতার পরিবর্তনের অংশ হিসেবে এমনকি উত্যক্তকরণের মত পরিস্থিতিতেও পুলিশকে সহনশীলতা, দৃঢ়তা এবং আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিতে হবে। প্রতিদানে সমাজ পুলিশকে সম্মান ও বিশ্বাস করবে যার ফলে পুলিশের মূল কাজগুলো (উদাহরণস্বরূপ, অপরাধ দমন এবং সমাজের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে তদন্তকাজ) সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন

পুলিশকে প্রায়ই কর্তব্য সম্পাদনকালে কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়। একদিকে জনগণ প্রত্যাশা করে পুলিশ অপরাধ ও অপরাধীর ক্ষেত্রে কঠোর হবে অন্যদিকে সন্দেহভাজন অপরাধীদের মানবাধিকার রক্ষা এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। এই পরিস্থিতি আরো বিতর্কিত হয় তখনই যখন একজন পুলিশ কর্মকর্তার মানবাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকে অথবা তার প্রয়োগ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না রাখে। এটা অবাক হওয়ার মত হবে না যখন কর্মকালীন সময়ে পুলিশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। এটা হয় তখনই যখন সচেতনভাবে মাত্রা কম হয়। এই লঙ্ঘন গুরুতর অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং গুরুত্বের সাথে এই বিষয়গুলো দেখা উচিত।

পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের সময় সমাজ থেকে অসহযোগিতা পাচ্ছে যদিও সেই সমাজে তারা বসবাস ও কাজ করে। মানবাধিকারের যথাযথ সমুন্নতকরণের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ পুলিশী আচরণের বাস্তব সম্মত ও রীতিবদ্ধ পরিনাম সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ধারণকরত তা পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জরুরী ঃ

- মানবাধিকার লঙ্ঘন বলতে কী বুঝায়
- মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা
- পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিনতি
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংজ্ঞা

মানবাধিকার লঙ্ঘন বলতে আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত সব স্বীকৃত অধিকার সমূহের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা কোন দেশের জাতীয় আইনে সন্নিবেশিত থাকুক বা না

Dhaka University Institutional Repository

থাকুক। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি ন্যায় বিচার এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষনার মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করলে ২টি সংজ্ঞা নির্ধারিত করতে হয়।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ফৌজদারী আইন অমান্যপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহার যা যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, অর্থনৈতিক অথবা মৌলিক অধিকারের বিচ্যুতি সংক্রান্ত যে কোন কার্যকলাপকে অন্তর্ভূক্তকরণ।

দ্বিতীয়তঃ এমন ধরণের কার্য সংগঠন অথবা কাজ থেকে দূরে থাকা যা দেশের প্রচলিত আইনে বা সংবিধানে কোন অপরাধ না হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকারসমূহের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু উদাহরণ

অনিচ্ছাকৃত কিংবা বাধ্যগত কারণে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিতি, আইন বহির্ভূত, স্বেচ্ছাচারী কিংবা অবিচারিক নির্যাতন, বেআইনী গ্রেফতার ও আটক, মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ, শারীরিক নির্যাতন, গ্রেফতারকৃত কিংবা আটককৃত ব্যক্তির সাথে অমানবিক আচরণ, শ্রেণীভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ, বেআইনি তল্লাশি ও জব্দায়ন পদ্ধতি, বেআইনি পদ্ধতি, বেআইনি দৈহিক নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের সাথে অমানবিক আচরণ, অপরাধীকে আড়াল করে ন্যায়বিচার পরাহত করা।

মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রত্যেক রাষ্ট্র আইনতঃ মানতে বাধ্য, এই বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভূক্তি করে রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে আন্তর্জাতিক আইন একীভূতকরণ এবং আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী নীতিমালার চর্চা থেকে বিরত থাকা। রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করে এমন সব সরকারী কর্মকর্তা এবং পুলিশসহ সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে।

একজন কর্মকর্তার সার্বিক কর্মকান্ডের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। ফলশ্রুতিতে, কর্মকর্তাদের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রয়োগের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা এবং

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার লঙ্ঘনকৃত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করা এবং এটি দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

মুদ্রার একপিঠে দৃষ্টিপাত করলে, দৈনন্দিন কর্মকান্ড সম্পাদনকালে মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা আংশিকভাবে পুলিশের উপর বর্তায়। রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও তা রক্ষা করা পুলিশের দায়িত্ব। মানবাধিকার লঙ্ঘন বলতে যেহেতু দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইন অথবা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সম্পর্কিত নীতিমালা লঙ্ঘনকে বুঝায়। তাই ঐ সমস্ত যাতে কোন ভাবে লংঘিত না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- দৈনন্দিন কর্তব্য-কালীন সময়ে মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে হতে হবে দক্ষ এবং সচেতন।
- পুলিশের কার্যাবলী তদারকী ও পর্যালোচনার জন্য যথাযথ সাংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োগ করা, যাতে মানবাধিকার রক্ষা ও তার চর্চা হয়।
- অভিযোগের ব্যাপারে কৌশলগ্রহণ করার কাঠামো বাস্তবায়ন (যেমন- আভ্যন্তরীণ অভিযোগ বা বিভাগীয় ইউনিট এবং জাতীয় পর্যায়ের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, কর ন্যায়পাল অথবা অনুরূপ সংগঠন কর্তৃক বাস্তবায়ন)।
- অভিযোগের তদন্ত পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নতি সাধন।

পুলিশ সদস্যদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় কঠিন বিষয়গুলো আরো জটিল হয়। আইন প্রয়োগকারী যখন আইন ভঙ্গকারী হয়ে উঠে, তখন এটা শুধুমাত্র মানব মর্যাদা এবং আইনের উপর আঘাত হয় না, কার্যকরী পুলিশিং এর ধারাবাহিকতায় এটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের নেতিবাচক পরিণতি

- পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পেতে থাকে ;
- পুলিশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ;
- তারা গণবিদ্রোহের উস্কানি দিতে পারে ;
- প্রায়শই জনগণ বিচারিক কার্যক্রম প্রতিরোধ করে ;
- অন্যায়ের প্রতি প্রতিকারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে প্রতিরোধমূলক হতে বাধ্য করে ;
- আর্ন্তজাতিকভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ক্ষতি হতে পারে। ফলে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মানবাধিকার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ;
- মানবাধিকারের প্রতি পুলিশের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। মানবাধিকারের প্রতি আইনগত ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা পুলিশের প্রয়োগিক জ্ঞানও তৈরি করে।

পুলিশ যখন মানবাধিকারের প্রতি সম্মান করবে, তখন-

ক) জনগণের মনে পুলিশের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং পুলিশ জনগণ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

খ) অপরাধীদের শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

গ) অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

ঘ) পুলিশ সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সামাজিক কর্মকান্ডে মূল্যবান অবদান রাখবে।

ঙ) ন্যায় রিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

চ) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বিষয়টি অনুকরনীয় হবে।

ছ) পুলিশ জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিরোধমূলক পুলিশিং এর মাধ্যমে অন্যায় প্রতিরোধ অধিক কার্যকর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জ) প্রচার মাধ্যমগুলো পুলিশকে সমর্থন দিবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে পুলিশ সমর্থন পাবে।

ঝ) নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক খ্যাতি, চাকুরী, সন্তুষ্টি প্রভৃতি সংগতিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকায় পুলিশ সার্ভিসে পেশাগত আত্মমর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে অভিযোগ প্রদান এবং প্রতিকারের পদ্ধতি

বিশ্বের দেশে দেশে যেহেতু পুলিশের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা রয়েছে, ঠিক সে কারণেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে এ জাতীয় বিষয়ে অভিযোগ প্রদান সংক্রান্ত জাতিসংঘ নির্দেশিত বা বর্হিভূত অন্যান্য প্রচলিত নিয়ম কানুনও রয়েছে।

প্রশিক্ষকদের উচিত পুলিশ অফিসারদের আন্তর্জাতিক আদলে প্রশিক্ষণ দেয়া- যা জনগণকে রক্ষা করবে। আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি কর্তৃক যদি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তা হলে পুরো সংস্থার জন্য মানহানিকর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে এই ঘটনাগুলোর প্রতিকার সম্ভব। যদি এই ধরণের লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের উচিত নিরপেক্ষ ও গভীরভাবে এবং তৎক্ষনাৎ অভিযোগের তদন্ত করা। আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি অবশ্যই কর্মকান্ডের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। এজন্য আভ্যন্তরীন মনিটরিং এবং পুনঃ নিরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন। মানবাধিকার লঙ্ঘনকৃত অপরাধের জন্য পর্যাপ্ত বিভাগীয় পদক্ষেপ বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আন্তর্জাতিক মান অনুসারে

- উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার পর ও ঘটনার বিচার না হলে, উক্ত কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন বর্হিভূত আদেশ অমান্য করার কারণে বিভাগীয় বিচার পদ্ধতি থেকে মওকুফ করা।

Dhaka University Institutional Repository

- পুলিশ কর্তৃক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের বাধ্যবাধকতার কারণে লঙ্ঘনকৃত অপরাধ থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকৃত ব্যক্তি / সংস্থা

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সরকার এবং বেসরকারী সংস্থা পুলিশের মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে। মানবাধিকার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রয়োগ হচ্ছে কি-না, তা বিভিন্ন পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ করেঃ

১. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এবং সেবা প্রতিষ্ঠান-পুলিশকে অন্তর্ভূক্ত করে

২. জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান (মানবাধিকার কমিশন বা কর ন্যায়পাল)

৩. মানবাধিকার সংস্থা ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা

৪. আদালত

৫. জাতীয় সংসদ

৬. প্রচার মাধ্যম

৭. পেশাজীবি সংগঠন (ল'ইয়ার্স, ডাক্তার)

৮. শ্রমিক সংগঠন

৯. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

১০. বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রসমূহ

তদারকী করার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা কলাকৌশল ও নীতিমালার উন্নয়ন সাধন করেছে। আফ্রিকান কমিশন অন হিউম্যান এন্ড পিপলস রাইটস, দি ইন্টার আমেরিকান কমিশন অন হিউম্যান রাইটস, দি ইন্টার-আমেরিকান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস, দি ইন্টার-ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস এবং দি কমিটি অব মিনিস্টারস অব দা কাউন্সিল অব ইউরোপ ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা রয়েছে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, মানবাধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের অভিযোগ তদারকির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়াও অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কমনওয়েলথ এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উপযুক্ত বিষয়ে প্রচার মাধ্যমগুলোর আগ্রহও জড়িত রয়েছে।

জাতিসংঘের নির্ধারিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আচরণ পর্যালোচনায় চারটি মূলনীতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়

প্রথমত ঃ চুক্তি ভিত্তিক তদারকি ঃ যেমন- নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি, মানবাধিকার কমিটি, শিশু ও নারী বৈষম্য দূরীকরণ ও অধিকার সংক্রান্ত কমিটি।

দ্বিতীয়ত ঃ সনদ ভিত্তিক তদারকি ; যেমন- জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, বিশেষ কলা-কৌশল পদ্ধতি, এবং জাতিসংঘের আভ্যন্তরীন অন্যান্য অভিজ্ঞ সংস্থা।

তৃতীয়ত ঃ শান্তিরক্ষা ও মানবাধিকার বিষয়ে সরাসরি বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে তদারকী।

চতুর্থত ঃ মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ হাই কমিশনের অফিসের নিবিড় ও গভীর পর্যবেক্ষণ।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বৃহত্তর ক্ষেত্র পর্যালোচনা করলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সমূহ- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রচলিত অনুমোদন নিয়ে কাজ করতে পারে। কমনওয়েলথ মন্ত্রী পর্যায়ের কার্যকরী গ্রুপ, যা ১৯৯৫ সালে 'মিলব্রুক' ঘোষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তারাও বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত বিষয়গুলো কেন বিভিন্ন দেশসমূহ কর্তৃক দূরীকরণে ব্যর্থ হয়েছে- তাও খতিয়ে দেখছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার

এটা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ যে, পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার অনেক সময় জটিল রূপ ধারণ করে। কারণ, মানবাধিকার রক্ষা এবং প্রয়োগ এবং অপব্যবহারের তদন্তের জন্য পুলিশকেই দায়িত্ব দেয়া হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মর্যাদাকে সম্মান ও সহানুভূতির সাথে দেখা উচিত। যখন পুলিশ এই ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের অভিযোগ নিয়ে কাজ করে- তখন এটা তাদের ভাব ও

Dhaka University Institutional Repository

পেশাদারিত্ব ও সুনামের উপর প্রভাব ফেলে। ক্ষতিগ্রস্তদের বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে সহায়তা ও পরামর্শ দেয়ার জন্য পুলিশের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

কিছু নীতিমালা অনুসৃত হয় যা পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে আচরণের নির্দেশনা পেতে পারে।

- আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা ও বহিঃনিরাপত্তার জন্য কার্যাবলী কলাকৌশলের সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারী অফিসিয়াল সুষ্ঠু ও কার্যকরী পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ।
- অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বা অপরাধ হওয়ায় সম্ভাবনা আছে এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নির্দিষ্ট জায়গায় জানাবে।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে সে অভিযোগ করার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাবার বিধান থাকতে হবে এবং এই বিধান জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহের তদন্ত হতে হবে তাৎক্ষনিক, মানসম্মত, সম্পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ।
- তদন্তে চেষ্টা করতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার, আস্থা পুনরুদ্ধার করার, সাক্ষী খুজে বের করা এবং প্রকৃত অপরাধী, ঘটনা, ঘটনাস্থল, ঘটনার সময় আবিষ্কারপূর্বক অপরাধীকে গ্রেফতার করা।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলা

পিনান্ট বনাম জ্যামাইকা

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে দু'সপ্তাহ ধরে ডেথ সেলে আটকে রাখা এবং তার প্রতি বিভিন্ন ধরনের অমানবিক নির্যাতন করার কারণে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি আসামি ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং তা দ্রুত দেয়ার জন্য জ্যামাইকা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

পিনান্ট বনাম জ্যামাইকা (১৯৯৮) নামের এই মামলার ঘটনাক্রম লক্ষ্য করলে, দেখা যায় যে, জ্যামাইকার এক নাগরিক পিনান্ট একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর খবর পৌঁছে দিতে পুলিশ স্টেশনে যায়। এর তিন দিন পর তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর প্রায় এক মাস সময় পার হয়ে গেলেও তাকে কোনো বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আসামি দাবি করে যে, মৃত ব্যক্তি একজন পুলিশ অফিসার হওয়ায় অন্য পুলিশ অফিসাররা তার প্রতি অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে, একটি স্যাঁতসেঁতে সেলের ভেতর থাকতে দেয় এবং মেঝেতে ঘুমানোর জন্য বাধ্য করে।

আসামি আরো বলে যে, এর কয়েক সপ্তাহ পর পুলিশ অফিসাররা অন্য কারাবন্দিদেরকে দিয়ে তাকে পেটায় এবং এতে তার বাম চোখ আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এর জন্য কোনো চিকিৎসা দেয়া হয়নি। শুরে এর ক'দিন পর প্রাথমিক শুনানির জন্য যখন তাকে আদালতে নেয়া হয়, তখন বিচারক তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশকে আদেশ দেয়। এই ঘটনার পরও তার ওপর অনেক ধরনের অত্যাচার করা হয়। মৃত পুলিশ অফিসারের ছেলে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সেলের মধ্যে ঢুকে পিনান্টকে মারধর করে এবং এ কারণে তাকে দু'দুবার হাসপাতালে যেতে হয়। অথচ ভয়ের কারণে এসব কথা সে আদালতে প্রকাশ করতে পারেনি।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে পিনান্টকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে তার আপিল খারিজ করে দেয়া হয় এবং ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে প্রিভি কাউন্সিল তার আপিলের জন্য বিশেষ আবেদনও বাতিল করে দেয়। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে আসামিকে জানানো হয় যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তাকে একটি ডেথ সেলে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাখা হয়। এখানে তাকে পুরো দু'সপ্তাহ রাখা হয়। এরপর তাকে ডেথ সেল থেকে বের করে নিয়ে আনলেও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় দু'বছর ধরে রেখে দেয়া হয়। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তার শাস্তি মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে পিনান্ট জেলখানার করুন অবস্থার কথা বর্ণনা করে। সে আরো অভিযোগ করে যে, বিশেষ করে তার ক্ষেত্রে বেশি খারাপ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যেহেতু তার বিরুদ্ধে একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার করার অভিযোগ ছিল। তাকে সেলের মধ্যে স্থায়ীভাবে আটক রাখা হয়েছিল, দিনের মধ্যে শুধু পনের মিনিটের জন্য তাকে বাইরে আনা হতো এবং তার ঘরটিতে বিভিন্ন ধরণের পোকা-মাকড়ের আস্তানা ছিল। সে আরো জানায় যে, জেলখানায় খাবারের মান এবং পয়ঃনিষ্কাশনের অবস্থাও ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর।

এরপর পিনান্ট জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির কাছে নিচের বিষয়গুলো সম্বন্ধে অভিযোগ জানায়-

১. তার প্রতি অমানবিক আচরণ

২. অপর্যাপ্ত চিকিৎসা

৩. দেরি করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সামনে আনা

৪. আটকাবস্থায় করুণ অবস্থা

৫. পাঁচ বছর ধরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় রাখা এবং

৬. কোনো ধরণের আইনগত সাহায্য বা সাংবিধানিক পদক্ষেপের অনুপস্থিতি।

পিনান্টের এই অভিযোগগুলোর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি তার রায়ে বলে যে, পিনান্টকে গ্রেফতারের পর বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করা 'আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত দলিল' আইসিসিপিআর-এর ৯ (৩) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং আটক থাকাকালে পিনান্ট পুলিশের কাছ থেকে যে আচরণ পেয়েছে তা আইসিসিপিআর-এর ১০(১) অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি আরো বলে যে, পিনান্টকে দু'সপ্তাহ ধরে ডেথ সেলে আটক রাখার ক্ষেত্রে জ্যামাইকা সরকারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না থাকায় এতে তার মানবিক আচরণ লাভের অধিকার খর্ব হয়েছে, যা আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ৭-এরও লঙ্ঘন।

সর্বশেষে এই কমিটি পিনান্টকে ক্ষতিপূরণসহ উপযুক্ত প্রতিকার দেয়ার জন্য এবং তাকে দ্রুত মুক্তি দেয়ার জন্য জ্যামাইকা সরকারকে নির্দেশ দেয়। উল্লেখ, ১৯৯৬ সালেই পিনান্টের প্যারোল মঞ্জুর হয়েছিল, অথচ তারপরও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

আন্তর্জাতিক সনদ

পুলিশ হেফাজতে নারী নির্যাতনের ঘটনা শুধু আমাদের দেশেই ঘটে এমন নয়। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই রয়েছে নারী-পুরুষের বৈষম্য, যার ভয়াবহতা নির্যাতনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। তাই রাষ্ট্রের পাশাপাশি সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ (United Nation) নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ তথা নারী নির্যাতন রোধকল্পে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে এই নীতিমালা পৃথিবীর সমগ্র নারী-সমাজের জন্য প্রযোজ্য। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই সব নীতিমালা বা সনদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনুমোদন লাভের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। স্বাক্ষরের মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র সনদ অনুমোদন করলে, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন অথবা আইন সংশোধনে ঐ রাষ্ট্র বাধ্য হবে। নারী-পুরুষের বৈষম্য রোধে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত এমনি কিছু আন্তর্জাতিক সনদ হলো ঃ-

ক. মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনাপত্র।

খ. আই এল ও সনদ

গ. সিডো

ঘ. ভিয়েনা ঘোষণা

ঙ. বেইজিং ঘোষণা

ক. মানবাধিকারে সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করে। মোট ৩০টি ধারায় এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার বর্ণিত হয়েছে। নারী-নির্যাতন বিরোধী সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো নিচে উলিখিত হলো-

ক. সনদের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সনদের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না।

গ. সনদের ৭ নং ধারামতে, আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতীত সকলেই আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলের আছে।

ঘ. সনদের ১২ নং ধারামতে, কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমন করা চলবে না।

ঙ. সনদের ১৬ (ক) নং ধারায় বলা হয়েছে, পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোনো সীমাবদ্ধতা ব্যতীত বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। এই ধারায় আরো বলা হয়েছে, বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সমঅধিকার রয়েছে।

চ. সনদের ১৬ (খ) নং ধারামতে, কেবল বিবাহ ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

ছ. সনদের ২১ নং ধারায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার বর্ণিত হয়েছে।

জ. সনদের ২৩ (ক) নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরি নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ঝ. সনদের ২৩ (খ) নং ধারা মতে, প্রত্যেকেরই কোনো বৈষম্য ব্যতীত সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ধারার (গ) উপধারায় আরো বলা হয়েছে, প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে।

ঞ. সনদের ২৫ (খ) নং ধারা অনুযায়ী মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেক বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী।

খ. আইএলও সনদ

জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization) সংক্ষেপে একে বলা হয় আইএলও। বিশ্ব জুড়ে শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই এই সংস্থার দায়িত্ব। নারী-পুরুষের শ্রম বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আই এল ও সংগ্রাম করছে দীর্ঘদিন। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত পরিবেশে মাতৃত্ব ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে রক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, আচরণে সমতা নিশ্চিত করা। আইএলও প্রণীত এমনি কিছু শ্রম সনদ ও সুপারিশ, যাতে বিশেষভাবে নারী শ্রমিকের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তা অনুমোদন করেছেন। তবে কিছু কিছু সুপারিশ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত সনদগুলো ঃ

১. ১৯৫১ সালে জারিকৃত ১০০ নং সনদে বলা হয়েছে, একই মানের কাজের জন্য পুরুষদের মত মহিলারাও সমান মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

২. ১৯৫৮ সালে জারিকৃত ১১১ নং সনদে বলা হয়েছে, কর্মনিয়োগ ও পেশার ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ ও আচরণ লাভের অধিকার রয়েছে।

৩. ১৯৪৮ সালে জারিকৃত ৮৭ নং সনদ অনুযায়ী, শ্রমজীবী মহিলাদের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য অবাধে সংগঠিত হওয়ার অধিকার আছে।

৪. ১৯৪৯ সালের ৯৮ নং সনদ অনুযায়ী, চাকুরিচ্যুতির ভয় না করে চাকুরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত যে-কোনো প্রসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে নিয়োগকারীদের সাথে দর কষাকষির অধিকার মহিলাদের আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ১৯৫৭ সালে জারিকৃত ২৯ নং সনদে বলা হয়েছে, কোনো বালিকা বা মহিলাকে জোরপূর্বক কেউ কাজে খাটাতে পারবে না।

৬. ১৯২১ সালের ১৪ নং অনুযায়ী মহিলাদের প্রতি সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টা অবসর ভোগের অধিকার রয়েছে।

গ. সিডও

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ সনদ বা চুক্তি হচ্ছে সিডও। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই সনদ বা কনভেনশন প্রণয়ন ও গৃহীত হয়। ইংরেজীতে একে বলা হয়েছে, 'Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against women' । বাংলায় একে বলা, 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW)' সিডওতে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। এর মধ্যে ১-১৬ নং ধারাগুলোর বর্নিত হয়েছে নারী-পুরুষের সমতা সংক্রান্ত নীতিমালা। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বিশেষ কিছু ধারা সংরক্ষিত রেখে সিডও সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকার অননুমোদিত সিডও নীতিমালা ঃ সিডও সনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারা বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেননি। এগুলো হলো- ধারা-(২) ও[ধারা-(১৬)১]।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, ২ ও ১৬ নং ধারা অনুমোদন না করলে সিডও নীতিমালার অনুমোদন সম্পূর্ণ অর্থবহ হয় না। কেননা ১৬ নং ধারায় নারীকে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তান জন্মদানে বিরতি, সন্তানসংখ্যা, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পারিবারিক বিষয়ে সিভিল কোনো আইন না থাকায় ধর্মীয় আইন (মুসলিম আইন, খৃষ্টান আইন, হিন্দু আইন) দ্বারাই উপরোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়। এবং প্রতিটি ধর্মীয় পারিবারিক আইনেই নারীর প্রতি চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ নারীর প্রতি 'বৈষম্যমূলক আচরণ' পরিহার করার অঙ্গীকার সিডও নীতিমালায় বর্ণিত হলেও

Dhaka University Institutional Repository

১৬ নং ধারা অনুমোদন না করায় গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ক্ষেত্রটিতেই নারী রয়ে গেছে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন রয়েছে বহু দূরে। এরপর আসে ২নং ধারার প্রসঙ্গ।

সিডও নীতিমালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা হয় এই ২নং ধারাকে। এতেই বলা হয়েছে প্রচলিত আইন বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক হলে তা পরিবর্তন করার কথা। এই দুটি ধারা অনুমোদন না করার পক্ষে সরকারের যুক্তি হলো, এতে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসতে পারে। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ সম্পূর্ণ সিডও অনুমোদন করেছে। তবে এটাই শেষ কথা নয়। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিহত করতে হলে আইনের সংস্কার প্রয়োজন। পারিবারিক ও নাগরিক জীবনের সুষম আইন ব্যবস্থাই নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রোধে প্রথম পদক্ষেপ বিবেচিত হতে পারে।

ঘ. ভিয়েনা ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মানবাধিকারের দাবিদার নারীরাও। নারীর অধিকারও মানব অধিকার। তাই মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা কিংবা সম্মেলনে গুরুত্বের সঙ্গে নারী অধিকার আলোচিত হয়। এমনি একটি সম্মেলন 'World Conference on Human Rights'। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন পরিচিত ভিয়েনা ঘোষণা বলে। বিশ্বের ১৭১টি দেশের প্রায় ৭০০০ প্রতিনিধি নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৪ থেকে ২৫ জুন অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় ছিলেন সরকারি নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে প্রায় ৮০০ এনজিও প্রতিনিধি। সম্মেলনের শেষদিনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় 'ভিয়েনা ডিক্লারেশন' এবং 'প্রোগ্রাম ফর একশন'। 'ভিয়েনা ডিক্লারেশন'- এর ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে 'নারী অধিকার'- এর কথা। এই ধারামতে-

ধারা- (১৮)

Dhaka University Institutional Repository

১। নারী ও মেয়ে শিশুর অধিকার মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ। আর্ন্তজাতিক সমাজের অন্যতম দায়িত্ব তাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপে সহায়তা করা।

২। লিঙ্গ-কেন্দ্রিক সহিংসতা এবং যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার ব্যবহার বা শোষণ একজন মানুষের জন্য অপমানজনক এবং অবশ্যই বিলোপযোগ্য। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, নিরাপদ মাতৃত্ব, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতীয় উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও আইনগত সাহায্য।

৩। নারী অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার উন্নয়নে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

পরিশেষে মানবাধিকার বিষয়ক এই বিশ্ব সম্মেলনে আহবান জানানো হয় সকল সকার, সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নারী ও মেয়ে শিশুর অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে তাদের কর্মসূচী আরো জোরদার করতে।

ঙ. বেইজিং ঘোষণা

এর মূল তিনটি বিষয় নিম্নরূপ ;

প্রথমত, নারীর প্রতি অধিকারগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নারীর প্রতি সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং যুদ্ধকালে নারী ধর্ষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে।

তৃতীয়ত, জাতীয় বহুমুখী সংস্থা ও ব্যক্তিখাতগুলোতে মহিলাদের প্রকল্পে বিশেষ করে গরীব মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ যোগাতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

সিটিজেন চার্টার (নাগরিক সনদ)

নাগরিক সনদ (Citizen's Charter) হচ্ছে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত এমন একটি দলিল (document) বা ঘোষণাপত্র (declaration) যাতে উক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কাদের কী ধরনের সেবা প্রদান করবে, কী পরিমাণ প্রদান করবে, কত সময়ের মধ্যে প্রদান করবে, কোন ধরনের সেবা পেতে কী পরিমাণ খরচ হবে এবং যথাযথভাবে সেবা না পেলে তার প্রতিকারের জন্য জনগণ কোথায় ও কী প্রক্রিয়ায় অভিযোগ দাখিল করবে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য কথায়, নাগরিক সনদ হচ্ছে সরাসরি সেবার মান সম্পর্কে জনগণ ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা স্মারক (understanding) যাতে জনগণের প্রত্যাশা ও সেবা প্রদানকারীদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটে থাকে।

নাগরিক সনদের উৎপত্তি (Origin of Citizen's Charter)

নাগরিক সনদের উৎপত্তি হয় যুক্তরাজ্যে ১৯৯১ সালে জন মেজরের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সরকারের শাসন আমলে। সে সময় দেশটিতে একটি প্রশ্ন খুব ব্যাপক ভাবে আলোচিত হচ্ছিল তা হল, বেসরকারি সংস্থাগুলো যদি মানসম্পন্ন সেবা দিতে পারে তবে সরকারি সংস্থাগুলো কেন পারবে না ? (If private companies can deliver quality services, then why can't public agencies do the same?)

নাগরিকরা আরও প্রশ্ন করতে শুরু করে যে, সরকারি সেবার মান যদি ভাল না হয় তাহলে জনগণ সেই সেবার জন্য করের মাধ্যমে যে টাকা দিয়েছে তা কেন ফেরত পাবে না- যেমনটি তারা কোন বেসরকারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান বা সেবা-সংস্থার কাছ থেকে ফেরত পেত ? (If the public Service which people have paid for through taxation is no good,

Dhaka University Institutional Repository

why should they not get their money back, as they would have the right to with any shop or service provider in the private sector?) মূলত এই প্রশ্নগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই যুক্তরাজ্য নাগরিক সনদ কর্মসূচির সুত্রপাত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের নাগরিকদের জন্য সরকারি সেবার গুনগত মানের অব্যাহত উৎকর্ষ সাধন যাতে তা ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম হয়। (to continuously improve the quality of public srvices for the people of the country so that these services respond to the needs and wishes of the users)। এই কর্মসূচীর ছয়টি মূলণীতি নির্ধারণ করা হয়-

১. গুণগতমান (Quality) : সেবার গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন করা ;

২. পছন্দ (Choice): সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের পছন্দের স্বাধীনতা দেয়া ;

৩. মান (Standard): কী প্রত্যাশা করা সমীচিন এবং প্রত্যাশিত মানের সেবা না পেলে কী করা উচিত তা সুনির্দিষ্ট করা ;

৪. মূল্য (Value) : করদাতাদের অর্থের মূল্য দেয়া ;

৫. জবাবদিহিতা (Accountability): নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

৬. স্বচ্ছতা (Transparency): নিয়ম কানুন মেনে চলা এবং অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

১৯৯৮ সালে টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টির শাসন আমলে এই কর্মসূচীটি "সবার আগে সেবা" (Services First) নামে পুনরায় শুরু করা হয়। এ সময় নাগরিক সনদের নয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো হল-

১) সেবার মান নির্ধারণ (Set standards of service);

Dhaka University Institutional Repository

২) তথ্যের ব্যাপারে উন্মুক্ত থাকা ও পরিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ (Be open and provide full information);

৩) পরামর্শ ও অন্তর্ভূক্ত করা (Consult and involve);

৪) সেবাগ্রহণ এবং পছন্দের উন্নয়নে উৎসাহিত করা (Encourage access and the promotion of choice);

৫) সকলের সাথে ন্যায্য আচরণ করা (Treat all fairly);

৬) কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তা সংশোধন করা (Put things right when they go wrong);

৭) সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা (Use resources effectively);

৮) নতুনত্ব আনয়ন ও উন্নয়ন সাধন করা (innovate and improve);

৯) অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা (Work with other providers)

নাগরিক সনদ কেন (Why Citizen's Charter)

যুক্তরাজ্য নাগরিক সনদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশটির কেবিনেট অফিস থেকে বলা হয়, নাগরিক সনদ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সেবার মানোন্নয়ন। এ জন্য নাগরিক সনদ সেবা সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় সেবা গ্রহণকারী ও নাগরিকদের অন্তর্ভূক্তিকে উৎসাহিত করে এবং জনগণকে বলে দেয় সেবার জন্য কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে, কি মানের সেবা প্রত্যাশ্যা করা উচিত হবে এবং যথাযথভাবে সেবা না পেলে কোথায় তার প্রতিকার চাইতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নাগরিক সনদ উদ্যোগ (Citizen's Charter Initiative in Bangladesh)

২০০০ সালে Public Administration Reform Commission (PARC) বাংলাদেশের তিনটি মন্ত্রণালয় এবং পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদ প্রণয়নের সুপারিশ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এটি বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেবার পর সে বছর জুন মাসে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে সকল মন্ত্রণালয়ে 'প্রশাসনিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন' বিষয়ে মন্ত্রণালয়গুলোতে কতিপয় নির্দেশের সাথে নাগরিক সনদ প্রণয়নের নির্দেশও দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশে অফিস / প্রতিষ্ঠানে সেবার মান নির্ধারণ, Citizen Charter প্রণয়ন .... ইত্যাদি সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রশাসনে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জিত হবে।

উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং বেশকিছু অধীনস্ত বিভাগে নাগরিক সনদ প্রণয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে নাগরিক সনদ প্রণয়ন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সনদ প্রণয়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের ফলে দেশের জেলা প্রশাসকদের কার্যালয়গুলোতেও নাগরিক সনদ প্রণয়ন করা হয়। ফলে পুলিশের জন্য নাগরিক সনদ পুলিশ হেড কোয়াটার্স থেকে এপ্রিল ২০০৮ সালে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিটিজেন চার্টার

বাংলাদেশ পুলিশ

- বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি থানায় সকল নাগরিকের সমান আইনগত অধিকার লাভের সুযোগ রয়েছে।
- থানায় আগত সাহায্য প্রার্থীদের আগে আসা ব্যক্তিকে আগে সেবা প্রদান করা হবে।
- থানায় আসা সাহায্য প্রার্থী সকল ব্যক্তিকে থানা পুলিশ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সম্মানসূচক সম্বোধন করবে।
- থানায় জিডি করতে আসা ব্যক্তির আবেদনকৃত বিষয়ে ডিউটি অফিসার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং আবেদনের দ্বিতীয় কপিতে জিডি নম্বর, তারিখ, সংশ্লিষ্ট অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ তা আবেদনকারীকে প্রদান করা হবে। বর্ণিত জিডি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা পুনরায় আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে।
- থানায় মামলা করতে আসা ব্যক্তির মৌখিক অথবা লিখিত বক্তব্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এজাহারভুক্ত করবে এবং আগত ব্যক্তিকে মামলার নম্বর, তারিখ ও ধারা এবং তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবী অবহিত করবে। তদন্তকারী অফিসার এজাহারকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তদন্ত সমাপ্ত হলে তাঁকে ফলাফল লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।
- থানায় মামলা করতে আসা কোন ব্যক্তির মামলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা থানার ডিউটি অফিসার এন্ট্রি করতে অপরাগতা প্রকাশ করলে উক্ত বিষয়টির ওপর প্রতিকার চেয়ে নিম্নোক্ত নিয়মে আবেদন করবেন।

ক) মেট্রোপলিটন এলাকায় সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন) অথবা জেলায় সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) এর নিকট আবেদন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ) তিনি উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অথবা জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন করা যাবে।

গ) অতঃপর তিনিও যদি উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার অথবা ডিআইজি'র নিকট আবেদন করবেন।

ঘ) তাঁরা কেউ উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মহা পুলিশ পরিদর্শকের নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করা যাবে।

- আহত ভিকটিমকে থানা হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে থানা সকল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবে।
- শিশু অথবা কিশোর অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু আইন, ১৯৭৪ এর বিধান অনুসরণ করা হবে এবং তাঁরা যাতে কোনভাবেই বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে কিশোর হাজতখানার ব্যবস্থা করা হবে।
- মহিলা আসামি অথবা ভিকটিমকে যথাসম্ভব মহিলা পুলিশের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- দেশের কিছু সংখ্যক থানায় ওয়ানস্টপ ডেলিভারি সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত সেন্টার দেশের সকল থানায় চালু করা হবে।
- আহত অথবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভিকটিমকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে ভিকটিম সাপোর্ট ইউনিট চালু করা হবে।
- পার্সপোর্ট অথবা ভেরিফিকেশন অথবা আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে সকল অনুসন্ধান প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে থানা হতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।
- থানা হতে বর্ণিত আইনগত সহযোগিতা না পাওয়া গেলে বা কোন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবর অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

সেইক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ-

Dhaka University Institutional Repository

ক) লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা অভিযোগকারীকে অবহিত করবেন।

খ) ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া ব্যক্তির বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনবেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা অভিযোগকারীকে জানাবেন।

গ) টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- সকল থানায় মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জয়েন্ট কমিশনার, ডিসি, এডিসি ও জোনাল এসি এবং জেলার জন্য পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এএসপি (হেডকোয়ার্টার্স), সংশ্লিষ্ট সার্কেল এএসপি এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেলিফোন নাম্বার থানায় প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হবে।
- মেট্রোপলিটন ও জেলায় কর্তব্যরত সকল পর্যায়ের অফিসারগণ প্রতি কার্যদিবসে নির্ধারিত সময়ে সকল সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য প্রদান করবে।
- থানার পুলিশ সদস্যগণ কম্যুনিটির সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং কম্যুনিটি ওরিয়েন্টেড পুলিশ সার্ভিস চালু করবেন।
- উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কম্যুনিটির সাথে অপরাধমূলক অথবা জনসংযোগমূলক সভা করবেন এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের আইনগত সমাধানের প্রয়াস চালাবেন।
- বিদেশে চাকুরী অথবা উচ্চ শিক্ষার জন্য গমনেচ্ছু প্রার্থীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
- ব্যাংক হতে কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণ টাকা উত্তোলন করলে উক্ত টাকা নিরাপদে নেয়ার জন্য চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ এস্কর্টের ব্যবস্থা করা হবে।
- মেট্রোপলিটন শহর অথবা জেলা শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক বিভাগ, ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট কী কী সেবা প্রদান করছে তা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হবে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টাস

সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ এপ্রিল, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

International Covenant on Civil and Political Rights

Adopted by UN General Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976.

Article 6

1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgment rendered by a competent court.

Article 7

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 9

1. Every one has the right to liberty and security of person, no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No

Dhaka University Institutional Repository

one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and should occasion arise, for execution of the judgment.

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay-on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Dhaka University Institutional Repository

Article 10

1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.

2. (a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvinced persons;

   (b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication.

3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.

Article 14

1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (order public) or

Dhaka University Institutional Repository

national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.

3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

   (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;

   (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing:

   (c) To be tried without undue delay;

   (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing;

Dhaka University Institutional Repository

to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it:

e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court:

(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.

5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has

Dhaka University Institutional Repository

suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

Article 15

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed...

Article 16

Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 21

The right of peaceful assembly 'shall be recognized, no restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety,,

Dhaka University Institutional Repository

public order (order public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

3. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

Adopted by the 8th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990. Adopted and proclaimed by General Assembly Resolution 45/111 of 14 December 1990.

Preamble

Whereas the work of law enforcement officials is a social service of great importance and there is, therefore, a need to maintain and, wherever necessary, to improve the working conditions and status of these officials, Whereas a threat to the life and safety of law enforcement officials must be seen as a threat to the stability of society as a whole.

General provisions

1. Governments and law enforcement agencies shall adopt and implement rules and regulations on the use of force and firearms against persons by law enforcement officials. In developing such rules and regulations, Governments and law enforcement agencies shall keep the ethical issues

Dhaka University Institutional Repository

associated with the use of force and firearms constantly under review.

2. Governments and law enforcement agencies should develop a range of means as broad as possible and equip law enforcement officials with various types of weapons and ammunition that would allow for a differentiated use of force and firearms. These should include the development of non-lethal incapacitating weapons for use in appropriate situations, with a view to increasingly restraining the application of means capable of causing death or injury to persons. For the same purpose, it should also be possible for law enforcement officials to be equipped with self-defensive equipment such as shields, helmets, bullet-proof vests and bulletproof means of transportation, in order to decrease the need to use weapons of any kind.

3. The development and deployment of non-lethal incapacitating weapons should be carefully evaluated in order to minimize the risk of endangering uninvolved persons, and the use of such weapons should be carefully controlled.

4. Law enforcement officials, in carrying out their duty, shall, as far as possible, apply nonviolent means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and

Dhaka University Institutional Repository

firearms only if other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result.

5. Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall:

   (a) Exercise restraint in such use and act in proportion to the seriousness of the offence and the legitimate objective to be achieved;

   (b) Minimize damage and injury, and respect and preserve human life;

   (c) Ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or affected persons at the earliest possible moment;

   (d) Ensure that relatives or close friends of the injured or affected person are notified at the earliest possible moment.

6. Where injury or death is caused by the use of force and firearms by law enforcement officials, they shall report the incident promptly to their superiors, in accordance with principle 22.

7. Governments shall ensure that arbitrary or abusive use of force and firearms by law enforcement officials is punished as a criminal offence under their law.

Dhaka University Institutional Repository

8. Exceptional circumstances such as internal political instability or any other public emergency may not be invoked to justify any departure from these basic principles.

Special provisions

9. Law enforcement officials shall not use firearms against persons except in self-defence or defence of others against the imminent threat of death or serious injury, to prevent the perpetration of a particularly serious crime involving grave threat to life, to arrest a person presenting such a danger and resisting their authority, or to prevent his or her escape and only when less extreme means are insufficient to achieve these objectives. In any event, intentional lethal use of firearms may only be made when strictly unavoidable in order to protect life.

10. In the circumstances provided for under principle 9, law enforcement officials shall identify themselves as such and give a clear warming of their intent to use firearms, with sufficient time for the warning to be observed, unless to do so would unduly place the law enforcement officials at risk or would create a risk of death or serious harm to other persons, or would be clearly inappropriate or pointless in the circumstance of the incident.

Dhaka University Institutional Repository

11. Rules and regulations on the use of firearms by law enforcement officials should include guidelines that:

(a) Specify the circumstances under which law enforcement officials are authorized to carry firearms and prescribe the types of firearms and ammunition permitted;

(b) Ensure that firearms are used only in appropriate circumstances and in a manner likely to decrease the risk of unnecessary harm;

(c) Prohibit the use of those firearms and ammunition that cause unwarranted injury or present an unwarranted risk;

(d) Regulate the control, storage and issuing of firearms, including procedures for ensuring that law enforcement officials are accountable for the firearms and ammunition issued to them;

(e) Provide for warnings to be given, if appropriate, when firearms are to be discharged;

(f) Provide for a system of reporting whenever law enforcement officials use firearms in the performance of their duty.

Policing unlawful assemblies

12. As everyone is allowed to participate in lawful and peaceful assemblies, in accordance with the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the

Dhaka University Institutional Repository

International Covenant on Civil and Political Rights, Governments and law enforcement agencies and officials shall recognize that force and firearms may be used only in accordance with principles 13 and 14.

13. In the dispersal of assemblies that are unlawful but non-violent, law enforcement officials shall avoid the use of force or, where that is not practicable, shall restrict such force to the minimum extent necessary.

14. In the dispersal of violent assemblies, law enforcement officials may use firearms only when less dangerous means are not practicable and only to the minimum extent necessary. Law enforcement officials shall not use firearms in such cases, except under the conditions stipulated in principle 9.

Policing persons in custody or detention

15. Law enforcement officials, in their relations with persons in custody or detention, shall not use force, except when strictly necessary for the maintenance of security and order within the institution, or when personal safety is threatened.

16. Law enforcement officials, in their relations with persons in custody or detention, shall not use firearms, except in self-defence or in the defence of others against the immediate threat of death or serious injury, or when strictly necessary

Dhaka University Institutional Repository

to prevent the escape of a person in custody or detention presenting the danger referred to in principle 9.

17. The preceding principles are without prejudice to the rights, duties and responsibilities of prison officials, as set out in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, particularly rules 33, 34 and 54.

Qualifications, training and counseling

18. Governments and law enforcement agencies shall ensure that all law enforcement officials are selected by proper screening procedures, have appropriate moral psychological and physical qualities for the effective exercise of their functions and receive continuous and thorough professional training. Their continued fitness to perform these functions should be subject to periodic review.

19. Governments and law enforcement agencies shall ensure that all law enforcement officials are provided with training and are tested in accordance with appropriate proficiency standards in the use of force. Those law enforcement officials who are required to cam firearms should be authorized to do so only upon completion of special training in their use.

20. In the training of law enforcement officials, Governments and law enforcement agencies shall give special attention

Dhaka University Institutional Repository

to issues of police ethics and human rights, especially in the investigative process, to alternatives to the use of force and firearms, including the peaceful settlement of conflicts, the understanding of crowd behaviour, and the methods of persuasion, negotiation and mediation, as well as to technical means, with a view to limiting the use of force and firearms. Law enforcement agencies should review their training programmes and operational procedures in the light of particular incidents.

21. Governments and law enforcement agencies shall make stress counseling available to law enforcement officials who are involved in situations where force and firearms are used.

Reporting and Review Procedures

22. Governments and law enforcement agencies shall establish effective reporting and review procedures for all incidents referred to in principles 6 and 11 (f).

24. Governments and law enforcement agencies shall ensure that superior officers are held responsible if they know, or should have known, that law enforcement officials under their command are resorting or have resorted, to the unlawful use of force and firearms, and they did not take all measures in their power to prevent, suppress or report such use.

Dhaka University Institutional Repository

26. Obedience to superior orders shall be no defence if law enforcement officials knew that an order to use force and firearms resulting in the death or serious injury of a person was manifestly unlawful and had a reasonable opportunity to refuse to follow it. In any case, responsibility also rests on the superiors who gave the unlawful orders.

4. Basic Principles for the Treatment of Prisoners

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990.

1. All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings.
2. There shall be no discrimination on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or their opinion, national or social origin, property, birth or other status.
3. It is, however, desirable to respect the religious beliefs and cultural precepts of the group to which prisoners belong, whenever local conditions so require.
4. The responsibility of prisons for the custody of prisoners and for the protection of society against crime shall be discharged in keeping with a state's other social objectives and its fundamental responsibilities for promoting the well-being and development of all members of society.

Dhaka University Institutional Repository

5. Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and where the state concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants.

6. All prisoners shall have the right to take part in cultural activities and education aimed at the full development of the human personality.

7. Efforts addressed to the abolition of solitary confinement as a punishment, or to the restriction of its use, should be undertaken and encouraged.

8. Conditions shall be created enabling prisoners to undertake meaningful remunerated employment which will facilitate their reintegration into the country's labour market and permit them to contribute to their own financial support and to that of their families.

9. Prisoners shall have access to the health services available in the country without discrimination on the grounds of their legal situation.

Dhaka University Institutional Repository

10. With the participation and help of the community and social institutions, and with due regard to the interests of victims, favourable conditions shall be created for the reintegration of the ex-prisoner into society under the best possible conditions.

11. The above Principles shall be applied impartially.

5. Body of Principles for the Protection of All Persons under any form of Detention or Imprisonment

Adopted by General Assembly Resolution 43/173 of 9 December 1988.

Scope of the Body of Principles

These principles apply for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment. Use of Terms

(b) "Detained person" means any person deprived of personal liberty except as a result of conviction for an offence;

(c) "Imprisoned person" means any person deprived of personal liberty as a result of conviction for an offence.

Dhaka University Institutional Repository

Principle 1

All persons under any form of detention or imprisonment shall be treated in a humane manner and with respect for the inherent dignity of the human person.

Principle 2

Arrest, detention or imprisonment shall only be carried out strictly in accordance with the provisions of the law and by competent officials or persons authorized for that purpose.

Principle 4

Any form of detention or imprisonment and all measures affecting the human rights of a person under any form of detention or imprisonment shall be ordered by, or be subject to the effective control of a judicial or other authority.

Principle 5

1. These principles shall be applied to all persons within the territory of any given state, without distinction of any given state, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion or religious belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, birth or other status.

Dhaka University Institutional Repository

2. Measures applied under the law and designed solely to protect the rights and special status of women, especially pregnant women and nursing mothers, children and juveniles, aged, sick or handicapped persons shall not be deemed to be discriminatory.

Principle 6

No person under any form of detention or imprisonment shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. No circumstance whatever may be invoked as a justification for torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Principle 7

1. States should prohibit by law any act contrary to the rights and duties contained in these principles, make any such act subject to appropriate sanctions and conduct impartial investigations upon complaints.
2. Officials who have reason to believe that a violation of this Body of Principles has occurred or is about to occur shall report the matter to their superior authorities and where necessary, to other appropriate authorities or organs vested with reviewing or remedial powers .

Dhaka University Institutional Repository

Principle 8

Persons in detention shall be subject to treatment appropriate to their unconvinced status. Accordingly, they shall, whenever possible, be kept separate from imprisoned persons.

Principle 9

The authorities which arrest a person, keep him under detention or investigate the case shall exercise only the powers granted to them under the law and the exercise of these powers shall be subject to recourse to a judicial or other authority.

Principle 10

Anyone who is arrested shall be informed at the time of his arrest of the reason for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

Principle 11

1. A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority. A detained person shall have the right to defend himself or to be assisted by counsel as prescribed by law.

Dhaka University Institutional Repository

2. A detained person and his counsel, if any, shall receive prompt and full communication of any order of detention, together with the reasons therefore.

3. A judicial or other authority shall be empowered to review as appropriate the continuance of detention.

Principle 12

1. There shall be duly recorded:

(a) The reasons for the arrest;

(b) The time of the arrest and the taking of the arrested person to a place of custody as well as that of his first appearance before a judicial or other authority;

(c) The identity of the law enforcement officials concerned;

(d) Precise information concerning the place of custody.

2. Such records shall be communicated to the detained person, or his counsel, if any, in the form prescribed by law.

Principle 13

Any person shall, at the moment of arrest and at the commencement of detention or imprisonment, or promptly thereafter, be provided by the authority responsible for his arrest, detention or imprisonment, respectively with information on and an explanation of his rights and how to avail himself of such rights.

Dhaka University Institutional Repository

Principle 15

Communication of the detained or imprisoned person with the outside world, and in particular his family or counsel, shall not be denied for more than a matter of days.

Principle 15:

1. Promptly after arrest and after each transfer from one place of detention or imprisonment to another, a detained or imprisoned person shall be entitled to notify or to require the competent authority to notify members of his family or other appropriate persons of his choice of his arrest, detention or imprisonment or of the transfer and of the place where he is kept in custody.
2. If a detained or imprisoned person is a foreigner, he shall also be promptly informed of his right to communicate by appropriate means with a consular post or the diplomatic mission of the state of which he is a national or which is otherwise entitled to receive such communication in accordance with international law or with the representative of the competent international organization, if he is a refugee or is otherwise under the protection of an intergovernmental organization.

Dhaka University Institutional Repository

3. If a detained or imprisoned person is a juvenile or is incapable of understanding his entitlement the competent authority shall on its own initiative undertake the notification referred to in the present principle. Special attention shall be given to notifying parents or guardians.

Principle 17:

1. A detained person shall be entitled to have the assistance of a legal counsel. He shall be informed of his right by the competent authority promptly after arrest and shall be provided with reasonable facilities for exercising it.
2. If a detained person does not have a legal counsel of his own choice, he shall be entitled to have a legal counsel assigned to him by a judicial or other authority in all cases where the interests of justice so require and without payment by him if he does not have sufficient means to pay.

Principle 18:

1. A detained or imprisoned person shall be entitled to communicate and consult with his legal counsel.

Principle 19:

A detained or imprisoned person shall have the right to be visited by and to correspond with, in particular, members of his family and

Dhaka University Institutional Repository

shall be given adequate opportunity to communicate with the outside world, subject to reasonable conditions and restrictions as specified by law or lawful regulations.

Principle 20:

It a detained or imprisoned person so requests, he shall if possible be kept in a place of detention or imprisonment reasonably near his usual place of residence.

Principle 21

1. It shall be prohibited to take undue advantage of the situation of a detained or imprisoned person for the purpose of compelling him to confess, to incriminate himself otherwise or to testify against any other person.
2. No detained person while being interrogated shall be subject to violence, threats or methods of interrogation which impair his capacity of decision or his judgment.

Principle 22

No detained or imprisoned shall, even with his consent, be subjected to any medical or scientific experimentation which may be detrimental to his health.

Dhaka University Institutional Repository

Principle 23

1. The duration of any interrogation of a detained or imprisoned person and of the intervals between interrogations as well as the identity of the officials who conducted the interrogations and other persons present shall be recorded and certified in such form as may be prescribed by law...

Principle 24

A proper medical examination shall be offered to a detained or imprisoned person as promptly as possible after his admission to the place of detention or imprisonment, and thereafter medical care and treatment shall be provided whenever necessary. This care and treatment shall be provided free of charge.

Principle 28

A detained or imprisoned person shall have the right to obtain within the limits of available resources, if from public sources, reasonable quantities of educational, cultural and information material, subject to reasonable conditions to ensure security and good order in the place of detention or imprisonment.

Dhaka University Institutional Repository

Principle 29

1. In order to supervise the strict observance of relevant laws and regulations, places of detention shall be visited regularly by qualified and experienced persons appointed by, and responsible to a competent authority distinct from the authority directly in charge of the administration of the place of detention or imprisonment.

Principle 30

1. The types of conduct of the detained or imprisoned person that constitute disciplinary offences during detention or imprisonment, the description and duration of disciplinary punishment that may be inflicted and the authorities competent to impose such punishment shall be specified by law or lawful regulations and duly published.

2. A detained or imprisoned person shall have the right to be heard before disciplinary action is taken. He shall have the right to bring such action into higher authorities for review.

Principle 31

The appropriate authorities shall endeavour to ensure, according to domestic law, assistance when needed to dependent and in particular, minor members of the families of detained or imprisoned

Dhaka University Institutional Repository

persons and shall devote a particular measure of care to the appropriate custody of children left with out supervision.

Principle 32

1. A detained person or his counsel shall be entitled at any time to take proceedings according to domestic law before a judicial or other authority to challenge the lawfulness of his detention in order to obtain his release without delay, if it is unlawful.

2. The proceedings referred to in paragraph 1 of the present principle shall be simple and expeditious and at no cost for detained persons without adequate means. The detaining authority shall produce without unreasonable delay the detained person before the reviewing authority.

Principle 33

1. A detained or imprisoned person or his counsel shall have the right to make a request or complaint regarding his treatment, in particular in case of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment, to the authorities responsible for the administration or the place of detention and to higher authorities and when necessary, to appropriate authorities vested with reviewing or remedial powers.

Dhaka University Institutional Repository

Principle 34

Whenever the death or disappearance of a detained or imprisoned person occurs during his detention or imprisonment, an inquiry into the cause of death or disappearance shall be held by a judicial or other authority, either on its own motion or at the instance or a member of the family of such a person or any person who has knowledge of the case.

Principle 36

1. A detained person suspected or charged with a criminal offence shall be presumed innocent and shall be treated as such until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

Principle 37

A person detained on a criminal charge shall be brought before a judicial or other authority provided by law promptly after his arrest, such authority shall decide without delay upon the lawfulness and necessity of detention. No person may be kept under detention pending investigation or trial except upon the written order of such an authority. A detained person shall when brought before such an authority, have the right to make a statement on the treatment perceived by him while in custody.

Dhaka University Institutional Repository

Principle 38

A person detained on a criminal charge shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial.

Principle 39

Except in special cases provided for by law, a person detained on a criminal charge shall be entitled, unless a judicial or other authority decided otherwise in the interest of the administration of justice, to release pending trial subject to the conditions that may be imposed in accordance with the law. Such authority shall keep the necessity of detention under review.

General clause

Nothing in this Body of Principles shall be construed as restricting or derogating from any right defined in the International covenant on Civil and Political Rights.

6. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime

Adopted by General Assembly Resolution 40/43 of 29 November 1985

1. "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury,

Dhaka University Institutional Repository

emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

2. A person may be considered a victim, under this declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familiar relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

3. The provisions contained herein shall be applicable to all without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability.

Access to justice and fair treatment

4. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress as provided for by national legislation for the harm that they have suffered.

Dhaka University Institutional Repository

6. The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of victims should be facilitated by:

   (a) Informing victims of their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved and where they have requested such information;

   (b) Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice system;

   (c) Providing proper assistance to victims throughout the legal process;

   (d) Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;

   (e) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees granting awards to victims.

7. Informal mechanisms for the resolution of disputes, including mediation, arbitration and customary justice or

Dhaka University Institutional Repository

indigenous practices, should be utilized where appropriate to facilitate conciliation and redress for victims.

Restitution

11. Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted.

Assistance

14. Victims should receive the necessary material, medical, psychological and social assistance through governmental. means.

15. Victims should be informed of the availability of health and social services and other relevant assistance and he readily afforded access to them.

16. Police, justice, health, social service and other personnel concerned should receive training to sensitize them to the needs of victims, and guidelines to ensure proper and prompt aid.

Dhaka University Institutional Repository

7. Child Right and UN Instrument

(i) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)

The Beijing Rules are set out in a detailed instrument of 30 rules contained in six parts. "General principles", "Investigation and prosecution", "Adjudication and disposition", "Non-institutional treatment", "Institutional treatment" and "Research, planning, policy formulation and evaluation".

(ii) United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)

The Riyadh Guidelines are set out in a detailed instrument of 66 paragraphs contained in seven parts: "Fundamental principles", "Scope of the Guidelines", "General prevention", "Socialization processes", "Social policy", "Legislation and juvenile justice administration" and "Research, policy development and coordination".

(iii) United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty

These Rules are set out in a detailed instrument of 87 rules contained in five sections: "Fundamental perspectives", "Scope and application of the Rules", "Juveniles under arrest or awaiting trial", "The management of juvenile facilities" and "Personnel".

Dhaka University Institutional Repository

The instrument applies to all types and forms of detention facilities in which juveniles are deprived of their liberty. However, the bulk of its provisions are more relevant to institutions where juveniles are detained on a longer-term basis for treatment and rehabilitation than to detention in police custody. Detention of juveniles by police is usually of short duration and for reasons connected with the immediate protection of the juvenile or the investigation of crime.

(v) United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures

The Tokyo Rules are set out in a detailed instrument of 23 rules contained in eight sections: "General principles", "Pre-trial stage", "Trial and sentencing stage", "Post-sentencing state", "Implementation of non-custodial measures", "Staff, "Volunteers and other community resources" and "Research, planning, policy formulation and evaluation".

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী /(BIBLIOGRAPHY)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী/(Bibliography)

গ্রন্থ (Books)

Ahmed, Ali, ***Theory & Practice of Bangladesh constitution,*** Dhaka, H. A. Publisher, 1998.

Akhtar, Shajeda, ***Problems and Potentials of Women Empowerment in the Local Government System in Bangladesh: A Study of Some Selected Union Parishads,*** Social Science Journal, Rajshahi University, January 2005.

Bhattacharya, Rinki, ***Behind Closed Doors Domestic Violence in India,*** New Delhi: Sage Pubications India Pvt. Ltd., 2004.

Ballington, Julie and Azza Karam, ***Women in Parliament: Beyond Numbers***, A Revised Edition, Sweden: Trydells Tryekeri AB,Sweden, 2005.

Bayley, David, ***Police: History, In Sanford H. Kadish (Ed.), Encyclopedia of Crime and Justic***, New York: The Free Press, 1983.

Bangladesh Penal Code, Dhaka, Deputy Controller of Government Printing Press, 1991.

Chowdhury,Rafiqul Huda and Ahmed, Nilufer Rahman, ***Female Status in Bangladesh,*** Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka,1980.

Chowdhury, Abdur Rahman, ***Democracy : Rule of Law and Human Rights,*** University of Dhaka, 1993.

Della Porta, Donatella,& Herbert Reiter, ***Policing Protest. The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies.*** Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1998.

Ericson, Richard,V& Kevin D. Haggerty,***Policing the Risk Society,***Toronto, Buffalo: Toronto University Press, 1997.

Grant, Rebecca and Katleen Newland(ed.), ***Gender and International Relations,*** Open University Press, Buckingham, 1991.

Human Rights Report 2009-2010 on Indigenous People's in Bangladesh, published by-Kapaeeng Foundation,Dhaka-2010.

Human Right Unit, ***Commonwealth Manual on Human Rights Training for Police,***,Commonwealth secretariat, London, UK, June 2006.

Human Rights in Bangladesh-1997, 1998,1999,2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, published by Ain O Salish Kendro (ASK).

Human Rights Watch, ***Shielded from Justice.Police Brutality and Accountability in the United States.*** New York, Washington, London, Brussels: Human Rights Watch, 1998.

Hamid, Shamim, ***Why Women Count: Essays on Women in Development in Bangladesh,***University Press Limited, 1996.

Huq, Zahirul, ***Law and Practice of Criminal Procedure.*** Nineth Edition, 2005.

Jahan, Roushan ও Islam, Mahmuda,***Violence Against Women in Bangladesh, Analysis and Action,*** publishd by Women For Women: A Research and Study Group Dhaka, Bangladesh, 1997.

Jhala, R.M., Raju.V.B:***Medical Jurisprudence,*** Eastern Book Company,Lucknow, Sixth ed.1997.

Klockars, Carl, ***The Idea of Police,*** Beverly Hills: Sage Pub,1985.

Khanna, S.K. ***Women and the Human Rights,*** Commonwealth Publishers, New Delhi,2003.

Lee, John Alam, ***Some Structural Aspects of Police Deviance in Relation with Minority Groups. In Clifford D.Shearing(Ed.),Organizational Police Deviance.*** Toronto: Butterworths, (1981).

Munim, F. K. M. A. ***Rights of the Citizen Under The Constitution and Law,*** Dhaka, The Bangladesh Institute of Law and International Affairs, 1975.

Manning, Peter K., ***Police Work: The Social Organization of Policing,***Cambridge: MIT Press, 1977.

Martin Khor, ***"Some Critical Aspects of Globalization"***, Third World Network Driefing Paper 1997.

Omvedt, Gail,***Violence Against Women New Movements and New Theories in India,*** Published by Kali for Women. B/18 Hauzkhas, New Delhi,1990.

Paul-Majumder,Pratima,***Organizing Women Garment Workers; A means to Address the challenges of Integration of the Bangladesh Garment Industry in the Global Market, Social Impact of Globalisation and Role of policy (ILO / UNDSPPD Project),*** Dhaka-2002.

Dhaka University Institutional Repository

Palma, Sheuly Roselyne, ***Women Situation of Bangladesh,*** (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৪ এবং জানুয়ারী-জুন, ২০০৫), published by Community Development Library, Dhaka-2005.

Repeal the Bangladesh Women's Rehabilitation and Women Foundation (Repeal) Ordinance. 1984.

Relner, Robert, ***The Politics of the Polic,*** Toronto: University of Toronto Press, 1992.

Report of BNWLA,(Bangladesh National Women Lawyers' Association),Dhaka-2002.

Rehabilitation,The Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation Act, 1974.

Rohana A.;ed: ***Shame, Secrecy, and Silence; Study of Rape in Penang,*** Women's Crisis Centre, Penang, 1997.

Sharmin, Ishrat, ***Trafficking and Sale of Women and Children, Bangladesh Perspective,*** (1995).

Sen,Gita and Grown,***"Empowerment of Women in Bangladesh: An Analysis of Theoritical Perspective,"*** Social Science Journal, Rajshahi University, 2005.

Southard, Barbara, ***The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal: The Quest for Political Rights, Education and Social Reform Legislation 1921-1936,*** The University Press Limited, Dhaka, 1996.

Shahiduzzaman and Mahfuzur Rahman(ed.), ***Gender Equality in Bangladesh: Still a long way to go,*** News Network, Dhaka 2003.

Seth, Mira, ***Women and Development: The Indian Experience,*** Sage Publications, London, 1980.

State of Women Prisoners in Bangladesh, একটি সংবাদ নেটওয়ার্ক পর্যালোচনা, এপ্রিল ২০০০, ঢাকা।

The Universal Declaration of Human Rights, 1948.

United Nations Development Programme (UNDP),***Human Security in Bangladesh: In Search Of Justice and Dignity,*** Dhaka, UNDP, 2002.

Valkeneer, Christian de, ***Le droit de la police.*** Bruxelles: De Boeck-wesmael, (1991).

Waddington, Peter A.J, ***Policing Citizens: Authority and Rights,*** London, Philadelphia: University College London, Taylor & Francis Group, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

Waddington, Peter A.J,The Case Against Paramilitarism Policing Considered. ***British Journal of Criminology,*** 1993.

Women and Violence, www. UN. org/rights Wetzel,C.T-Personal Communicaion, Brasilia October, 1998.

অল্টতলার, সারাহ, ***"নারী অধিকার ও বাধাসমূহ;*** মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০০২,আইন ও সালিশ কেন্দ্র,ঢাকা- ২০০৩ ।

আখতার, তাহমিনা, **মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট,** বাংলা একাডেমী-ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,জুন-১৯৯৫ ।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ***আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ,*** প্রকাশক- আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৯৮ ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান** [১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত], ২৬ জানুয়ারী-১৯৯৯ ।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ***ধর্ষণ-পরবর্তী আইনি লড়াই,*** প্রকাশক- আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক),প্রথম প্রকাশ নভেম্বর,১৯৯৯ ।

আমিন, সোনিয়া নিশাত, ***বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন-***বাংলা একাডেমী, ঢাকা,নভেম্বর-২০০২ ।

আজাদ, হুমায়ুন, ***নারী,*** প্রকাশনায় -ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা,ফেব্রুয়ারী-১৯৯২ ।

আহ্‌মদ এ্যাডভোকেট শেখ মতলুব, ***বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশনস,*** পি.আর.বি- 1] অরিজিনাল পার্ট-২, প্রকাশনায় , কামরুল বুক হাউস,ঢাকা-২০০২ ।

আরা, জেসমিন, ***বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব,*** প্রকাশক-নারীকেন্দ্র, বাংলাবাজার, ঢাকা,ফেব্রুয়ারী -২০০৪ ।

আহমেদ, নাসির, ***জোট সরকারের ৫ বছর,*** *কিছু খন্ড চিত্র-১*, প্রথম প্রকাশ -একুশে বইমেলা ২০০৯ ।

আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দিন, **নারী নির্যাতনের রকমফের,**প্রকাশনায়-বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:,ঢাকা,৮ মার্চ-২০০১ ।

ইসলাম,মাহমুদা, **নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা,**মাওলা ব্রাদার্স,প্রথম প্রকাশ,জানুয়ারী-১৯৯০ ।

ইসলাম, মোঃ শহীদুল, ***মানবাধিকার তত্ত্ব ও তথ্য,*** পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়াপল্টন, ঢাকা- ১০০০ ।

ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড- প্রস্তাবনা, প্রকাশক- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৩১- বি সেগুন বাগিচা,ফেব্রুয়ারী ২০০৬,ঢাকা ।

উইমেন ফর উইমেন, ***নারী ও সমাজ,*** প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬,ঢাকা ।

উইমেন ফর উইমেন,***নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,*** প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬,ঢাকা ।

উইথড্র রিজার্ভেশন টু সিডও: মহিলা পরিষদ আর্জেস গভ.; দি ডেইলি স্টার,২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ।

উইমেন ফর উইমেন, *বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন নীতি এনজিও-র ভূমিকা,* প্রকাশক:বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশন বাংলাদেশ(এনসিবিপি),সচিবালয়, ঢাকা-১৯৯৭ ।

উইমেন আর ইক্যুয়াল পার্টনার্স ইন পলিটিক্স; ২৭ অক্টোবর,২০০৮ সিরডাপ মিলনায়তনে স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত একটি সেমিনারের প্রতিবেদন ।

এরশাদ,বিদিশা, *শত্রুর সঙ্গে বসবাস,* ধারাবাহিক প্রকাশ,সাপ্তাহিক-২০০০,ঢাকা-২০১০ ।

করিম,ডঃ ইকবাল ও আলম,আশরাফুল, *ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বিধিমালা,* প্রকাশনায়- কামরুল বুক হাউস,আগস্ট-২০০৮ ।

কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* প্রকাশক কমলা দাশগুপ্ত, ১৮ সাদার্ন অভেন্যু, কলিকাতা-২৯ , ১৫ই আগষ্ট ১৯৬০ ।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, *পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,* প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৭৭ ।

কবির, আবু আহমেদ মোঃ ফয়জুল,'পুলিশ রিমান্ডে মৃত্যু' ,আসক বুলেটিন,জুন ২০০৮ ।

করিম, ফাহমিনা, *জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ ১ম খণ্ড,*সম্পাদনা সেলিনা হোসেন,সময় প্রকাশন,ঢাকা-১৯৯০ ।

কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬০ ।

খান, নমিতা, *নারী ও সমাজঃ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে,* সালমানী প্রিন্টিং প্রেস, নয়ারাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ ।

খান, আরিফ এইচ, *'নাগরিক সনদ কি, কেন ও কিভাবে'* ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে ব্রাক সেন্টার ইন-এ আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ থেকে সংকলিত ।

খান, আনসার আলী ও দাশ, শংকর চন্দ্র, *বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ড বুক (প্রথম খন্ড),* বুক ফেয়ার, ঢাকা, জুন, ২০০৩ ।

খানম, আয়শা, *বাংলাদেশের নারী আন্দোলন প্রাসঙ্গিক ভাবনা,* প্রকাশক-ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা,ফেব্রুয়ারী -২০০৯ ।

খান,সালমা, *বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা,* প্রকাশক-সূচীপত্র প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা,আগস্ট -২০০৬ ।

গুপ্ত, রাণী দাশ, *তেভাগা সংগ্রাম,* রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ মণীষা, কোলকাতা, ১৯৭৩ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১,* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১১ ।

গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারঃ *নারী অধিকার ও উন্নয়ন,* জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪,ঢাকা-২০০৪ ।

চক্রবর্তী,রেণু, *ভারতীয় নারী আন্দোলনের কমিউনিস্ট মেয়েরা* (১৯৪০-১৯৫০), মনীষা গ্রন্থালয়,৫৪/ এ হরিঘোষ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৬,১৯৮০ ।

জিয়তি রহমান, *লেসন ফ্রম দি উইমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি ডিবাকল,* ফোরাম, ভলিউম-৩,ইস্যু ৬,২০০৮ ।www.thedailystar.net/2008/june/women-development.htm

জেবা, লাভলী ইয়াসমিন ,*জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ ১ম খন্ড,*সম্পাদনা সেলিনা হোসেন জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার বিভিন্ন গবেষণা কর্ম,সময় প্রকাশন,ঢাকা-১৯৯০ ।

জেলে আমাদের শিশুরা, The State of Juvenile Justice and Violence against Children in Bangladesh, বর্ষপঞ্জি Save the Children UK/ অধিকার, ঢাকা-২০০১ ।

ডঃ মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর, কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *নারী নির্যাতনের আদিম রুপ,* ২/১/০৫ যুগান্তর ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের কারাগার : ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোট সে তরী', ইনকিলাব, ২৬ জুন ২০০৮ ।

দাস,বি.এল, *অপরাধ মনস্তত্ত্ব ও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ,* প্রকাশনায়- কামরুল বুক হাউস, ঢাকা তৃতীয় সংস্করণ মে-২০১০ ।

দাশ পুরকায়স্থ, ডঃ নিবেদিতা, *মুক্তি মঞ্চে নারী,* প্রকাশনায়-প্রিপ ট্রাষ্ট, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা,জুন-১৯৯৯ ।

দাস,বি.এল, *অপরাধ বিজ্ঞান(প্রথম খন্ড) ও (দ্বিতীয় খন্ড),*পঞ্চম সংস্করণ মে-২০১০ ।

'দলে ৩৩ ভাগ নারী প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে ইসির সুপারিশের ওপর আপত্তি প্রত্যাহারের আবেদন', জনকন্ঠ,১০ জানুয়ারি ২০০৮ ।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এনডিসি অতিরিক্ত আইজিপি, বাংলাদেশ, পুলিশ ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক *পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী,প্রবন্ধ,* দৈনিক সমকাল, ৫ জানুয়ারী ২০১০ ।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, *শত বছরে বাংলাদেশের নারী,* প্রকাশক-নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা,চতুর্থ সংস্করণ ২রা নভেম্বর-২০১০,ঢাকা ।

নাসরিন শামীমা, *'জেন্ডার বায়াস ইন ন্যাশনাল আইডেনটিটি (আইডি) কার্ড',* দি ডেইলি স্টার, ৮ জানুয়ারি ২০০৮ ।

নাগ, নিবেদিতা, *পুর্ববাংলার মহিলা সমিতি ও নারী আন্দোলন একসাথে,* পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা ১৯৮৭ ।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, *নারী নির্যাতন ধর্ষণ সংবাদ,* প্রকাশক- নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রথম সংস্করণ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন-২০০০ । [২০০০ সনের ৮নং আইন] ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০০/২রা ফাল্গুন ১৪০৬] ।

পুলিশ লক্ষ এন্টি- ট্রাফিকিং ইউনিট' নিউ এজ, ১৮ জুন ২০০৮ ।

প্রফেসর হোসেন,মনিরা, *নারীর শিক্ষা ও জীবন সেকাল ও একাল (কেইস স্টাডি),* প্রকাশক- নারীকেন্দ্র, বাংলাবাজার, ঢাকা,ডিসেম্বর-২০০৫ ।

প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং-১২৪, *অব দ্য বাংলাদেশ এ্যাবানডন্ড স্পেশাল প্রভিশন অর্ডার, ১৯৭২ ।*

পাল মজুমদার ২০০১: প্রতিমা পাল মজুমদার, *Occupational Hazard:Mental Health Status of Female Garment Workers in Bangladesh',* ২০০২ সালের ১১-১৩ ডিসেম্বর স্টিলা মারী কলেজ, চিন্নাই, ভারত আয়োজিত 'Women in Asia' কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রতিবেদন।

পুরকায়স্থ, রাখী দাশ, *মনোরমা বসু মাসিমা: মানব দরদী আদর্শ সংগ্রামী নারী,* প্রকাশক- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১৯৯৫ ।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, *বিশ্বায়ন ও নারী-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা- ২০০২।

ব্যারিস্টার আমীর তানিয়া ও এ্যাডভোকেট ইসলাম শেখ রফিকুল, প্রাবন্ধিক, (গ্রামীণ ট্রাস্ট-এর দারিদ্র বিমোচন গবেষণা কর্মসূচীর আওতায় *ডিমিষ্টিফিকেশন অব জুডিশিয়াল সেফ কাস্টোডি*-এর ওপর গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন,২০১০)।

বাংলাদেশে সুশাসনঃ আইনগত ও বিচারিক প্রেক্ষাপট (বাংলাদেশ আইন সমিতির উদ্যগে ৩০ অক্টোবর ২০০২ ইং তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,* প্রকাশক- বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,১৯৯৮-ঢাকা।

বাংলাদেশ গেজেট, *ফৌজদারি কার্যবিধি, পর্যবেক্ষন ও মুল্যায়ন বিভাগ,* মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রোববার ২০ জুলাই ২০০৮।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, *বিশ্বায়ন ও নারী প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারী ২০০২, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ***বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ২০০৫,*** প্রকাশকাল-১২ জুলাই, ২০০৬।

বেগম, মালেকা, ***নারী মুক্তি আন্দোলন,*** বাংলা একাডেমী- ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,ডিসেম্বর-১৯৮৫।

বেগম,হান্নানা, ***মানব সম্পদ বাংলাদেশের নারী*** ,প্রকাশক- বাংলা একাডেমী,প্রথম প্রকাশ-মার্চ-২০০২।

বেগম, মালেকা, **ইলা মিত্র,** আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০১।

বেগম, মালেকা,***বাংলার নারী আন্দোলন,*** দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ,ঢাকা-২০০০।

ভট্টাচার্য, অজয়, ***নানকার বিদ্রোহ ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড,*** মুক্তধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।

মৈত্র, ড. জ্ঞানেশ, ***নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য,*** ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করন ১৩৫২ বাং।

মিয়া ছিদ্দিকুর রহমান, জেলা ও দায়রা জজ, **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন,**কামরুল বুক হাউস,প্রথম সংস্করণ জুন-২০০০।

মিয়া ছিদ্দিকুর রহমান, জেলা ও দায়রা জজ, ***পুলিশ রেগুলেশনস্ ও গাইড,*** নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, নভেম্বর- ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা, আলতাফ হোসেন, **পুলিশ গাইড,** কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, জুন-২০০১।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, **জেন্ডার সাম্য ও সমতা, বাংলাদেশে নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় (ম্যানুয়াল),**ঢাকা-২০০৮।

রহমান, গাজী শামছুর, ***বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য*** -পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০১।

রহমান, গাজী শামছুর, ***দন্ডবিধির ভাষ্য,*** নওরোজ খোশরোজ কিতাব মিয়া, ঢাকা,জুলাই-২০০১।

রহমান, গাজী শামছুর, ***ফৌজদারী কার্যবিধির ভাষ্য;*** খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা,ফেব্রুয়ারী-২০১০।

রহমান, গাজী শামছুর, ***বাংলাদেশের পুলিশ প্রবিধানের ভাষ্য,*** পি আর বি দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশনায়- কামরুল বুক হাউস,ঢাকা,পঞ্চদশ সংস্করণ,জানুয়ারী-২০১০।

রহমান, গাজী শামছুর, ***বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ডবুক অরিজিন্যাল,*** প্রকাশনায়-কামরুল বুক হাউস, ঢাকা,দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯১।

লিটন সাখাওয়াত, ***'উইমেন রিজার্ভ সিট ইন লোকাল গভ. গর্ভনমেন্ট রিট্রিট ফ্রম পিজ'.*** দি ডেইলি স্টার, ১২ মে ২০০৮।

হুদা, সিগমা এবং আলী, সালমা, ***Behind Prison walls Police Prisons and Human Rights,*** Commonwealth Human Rights Initiative আয়োজিত ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন, ভারত, ১৯৯৫ নয়াদিল্লী।

উল্লাহ, সা'দ, **নারী অধিকার ও উন্নয়ন,** সময় প্রকাশন, বইমেলা-২০০২, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

'সরভিনড ইন্টু প্রিজনস' , দি ডেইলি স্টার,২৬ জুলাই ২০০৮ ।

সিদ্দিকী,আশরাফ, *জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ ১ম খন্ড,* সম্পাদনা সেলিনা হোসেন,সময় প্রকাশন,ঢাকা-২০০৯ ।

হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,*দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০২ ।

হোসেন সেলিনা, *"বাংলাদেশের মেয়ে শিশু",* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ডিসেম্বর- ১৯৯০ ।

হোসেন সেলিনা, *জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ ১ম খন্ড,* সময় প্রকাশন, ঢাকা- ২০০৯ ।

হান্নান, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস,* আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা,ফেব্রুয়ারী-১৯৯৪ ।

হুদা, মুহাম্মদ নূরুল, সাবেক আইজিপি ও সচিব, এ *পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর* উপর লিখিত প্রবন্ধ, দৈনিক সমকাল, ৫ জানুয়ারি, ২০১০ ।

হোর, সোমনাথ, *তেভাগার ডায়েরী,* এক্ষণ শারদীয় ১৩৮৮,৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কোলকাতা-৯ ক্রোড়পত্র ।

হোসেন হামিদা, *'নারী নীতি: সমস্যাটি কোথায়?'* প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০০৮ ।

হ্যাসেলস: *'বিএনডাবিউএলএ আজ সার্ক লিডারস'* দি ডেইলি স্টার, ২ আগস্ট ২০০৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাবাজার, ০৩.১১. ২০১০

যুগান্তর, ৩১.০১. ২০১০

নারী মঞ্চ (প্রথম আলো) ১৩.০৬. ২০০১

ভোরের কাগজ ১৫.০২.২০০৫

সংবাদ ০৯.১২.২০০৫

ইত্তেফাক ৩০.০৭.২০০৫

সংবাদ ২৮.০৩.২০০৫

সংবাদ ০৬.০৯.২০০৫

ভোরের কাগজ, ২২.০৮.২০০৫ ।

যায় যায় দিন, সংখ্যা-১২, বর্ষ-২০, ২০০৩, পৃ : ৪৬

জনকণ্ঠ, ০৮ .০৬. ২০০৫

জনকণ্ঠ, ০৮.০২. ২০০৫

ইনকিলাব ,১৩.০৩. ২০০৪

দৈনিক সমকাল,০৫.০১. ২০১০

আমার দেশ, ১৩.০৪.২০০৯

প্রথম আলো,২১.১১. ২০১১